আমার বাংলাদেশ

অধ্যাপক গোলাম আযম

আমার বাংলাদেশ

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন ২৫ ১৭ ৩১

আ ঃ প্র ঃ ২১১

প্রথম সংস্করণ

সফর	১৪১৬
শ্রাবণ	১৪০২
জুলাই	১৯৯৫

বিনিময় ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশ দাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

AMAR BANGLADESH by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 80.00 Only

www.icsbook.info

ভূমিকা

বাংলাদেশ কোটি কোটি লোকের। তবু আমি বলছি 'আমার বাংলাদেশ'। ছোট শিশু আধো আধো উচ্চারণে বলে 'আমাল আব্বু' 'আমাল আম্মু'। তার বড় ভাই বোনেরা ওকে এ বলে ক্ষেপায় 'না আমার আব্বু'। সে রাগ করে কেঁদে আরও জোরে বলে 'আমা-আল আব্বু'। কে এ শিশুকে শেখাল 'আমাল আব্বু' বলতে ? ভালবাসা এক আজব অনুভূতি যা মুখের ভাষায় ফুটে উঠে।

নামাযের রুকু ও সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম ও সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলা স্বয়ং আল্লাহর রাসূলই শিক্ষা দিয়েছেন। রাব্বিয়া মানে আমার রব। আল্লাহ কি শুধু আমার একার রব ? তবু কেন বলি আমার রব ? এটাও ঐ ভালাবাসারই কারবার।

তাই কোটি কোটি মানুষের বাংলাদেশকে আমি "আমার বাংলাদেশ" বলতে বাধ্য হলাম। এ আমার জন্মভূমি। এর আলো বাতাস ও রোদ-বৃষ্টি, চন্দ্র -সূর্য ও তারার মেলা, নীল আসমান ও সবুজ যমীন, গাছ-পালা ও নদী-নালা, ফল-মূল ও শস্য-ফসল, মাঠ-ঘাট ও বাজার-হাট, ধূলা-বালি ও ঘাস-বিচালি, পশু-পাখী ও কীট-পতংগ, গ্রীষ্ম-বর্ষা ও শীত-বসন্ত, ইত্যাদির সাথে আমার আজন্ম ঘনিষ্ট পরিচয়। ৭ বছর একটানা বাধ্যতামূলক প্রবাস জীবনে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার যত দেশে গেলাম কোথাও প্রকৃতিকে এমন আপন মনে হয়নি। সব দেশেই ঘনিষ্ট মানুষ পেয়েছি। কিন্তু পরিচিত আবহাওয়া পেলাম না। পানির মাছ শুকনায় যেমন অবস্থায় পড়ে আমার দশাও তেমনি মনে হতো।

আমার মতো আরো যাদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল তাদের বেশ কয়েকজন লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ সত্ত্বেও আমি তা করতে মনকে রাযী করাতে পারলাম না। আমার জন্মভূমিতে আর ফিরে যেতে পারব না এমন নৈরাশ্য সৃষ্টি হলে হয়তো তাই করতাম। আমার লন্ডন থাকাকালে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ভুট্টো আমার পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে অশালীন আচরণ করার কথা জানতে পেরে সৌদী আরবের সবচাইতে প্রভাবশালী আলেম শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয বিন বাজ অত্যন্ত স্নেহের সাথে প্রস্তাব দিলেন, "তোমাকে সৌদী নাগরিক বানিয়ে

www.icsbook.info

দেই"। বাংলাদেশের মায়া ত্যাগ করতে পারলাম না বলে এ প্রস্তাবও কবুল করা গেল না।

আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকা কালে শুধু আমার দেশ সম্পর্কেই চিন্তা-ভাবনা করেছি। '৭১ সালের ২২ শে নভেম্বর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে যোগদান করার জন্য লাহোর গেলাম। ৩রা ডিসেম্বর করাচি থেকে বিমানে ঢাকা রওনা দিলাম। সেদিনই ভারতের সাথে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় আমার বিমান বাংলাদেশের কাছে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হলো। এভাবে আমি বিদেশে রয়ে গেলাম। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আটকা পড়ে রইলাম। ১৬ই ডিসেম্বরের পর দেশের সাথে যোগাযোগই ছিন্ন হয়ে গেল। লন্ডন হয়ে চিঠি-পত্র আদান প্রদান ছাড়া যোগাযোগের আর কোন পথই পেলাম না। লন্ডন যেতে চাইছিলাম। মিঃ ভুট্টো যেতে দিলেন না। ৭২-এর নভেম্বরে হজ্জ্ব উপলক্ষে কোন রকমে বের হলাম এবং হজ্জ্বের পর ৭৩-এর এপ্রিলে লন্ডন পৌঁছলাম।

হজ্জ্বের সময় বাংলাদেশ থেকে আগত হাজীদের কাছে দেশের হাল অবস্থা জেনে খুবই পেরেশানী বোধ করলাম। তাদের মধ্যে যারা পরিচিত তাদের সাথে কিছু মতবিনিময়ও হলো। আমি না চিনলেও আমাকে প্রায় সবাই নামে চেনার কারণে অনেকেই অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন, "হুযুর দেশের উপায় কী হবে ? আর মুসলমানদের ঈমান আকীদা কিভাবে রক্ষা করা যাবে ? ভারতের খপ্পর থেকে কেমন করে বাঁচা যাবে ?"

বাংগালী মুসলমানদেরকে এ সময় কী পরামর্শ দেয়া যায় সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হলাম। দোয়া কবুল হবার খাস জায়গাগুলোতে মহান মনিবের দুয়ারে ধরণা দিতে থাকলাম। মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে রাসূল (সাঃ)-এর মাযার শরীফ ও মসজিদের মিম্বারের মাঝখানের জায়গাটি দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান, যার নাম "রাওযাতুল জান্নাত"। এ জায়গাটিকে বেহেশতের বাগানগুলোর একটি বাগান বলে রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছেন। সেখানে তিন দিন একটানা ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করে দোয়া করতে থাকলাম যেন আল্লাহ পাক বাংগালী মুসলমানদের জন্য সময়োপযোগী বক্তব্য পেশ করার তাওফীক দান করেন।

হজ্জ্বের পর লন্ডন ফিরে গিয়ে "বাংগালী মুসলমান কোন পথে"? শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা করলাম। সেখানে বাংলা ছাপাখানা না থাকায় বাংলা টাইপ করে এর ফটো কপি দ্বারা পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হলো। ১৯৭৩ এর আগষ্ট মাসে পুস্তিকাটি ছাপা হওয়ার পর লন্ডনে প্রবাসী বাংগালী

www.icsbook.info

মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হলো। পরবর্তী হজ্জের সময় সৌদী আরবে আগত বাংগালী হাজীদের মধ্যে বইটি বিলি করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে তা পৌঁছে।

৭৩-এর এপ্রিলে লন্ডন পৌঁছার পর বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা সহজ হয়ে গেল। কিন্তু তাদের সাথে সাক্ষাত আলোচনা করার উপায় হিসেবে হজ্জের উপলক্ষটিকেই বাছাই করতে হল। ৭৭ সাল পযর্ন্ত প্রতি বছর হজ্জের সময় আমি বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে লন্ডন থেকে সৌদী আরবে হাযির হতাম। তাদের কাছ থেকে দেশের বিস্তারিত অবস্থা, ইসলামী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও অগ্রগতির পথে সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে যথাসাধ্য পরামর্শ দিতাম। এর ফলে সশরীরে বিদেশে থাকলেও মন-মগজ ও চিন্তা-চেতানায় আমার জন্মভূমিই স্থায়ী আসন দখল করে রইল।

৭৫-এর আগষ্টে দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশে ফিরে আসবার সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠল। ৭৬-এর জানুয়ারীতে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করলেন যে যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তারা তা বহাল করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি দু'বার লেখা সত্ত্বেও সরকার তা নামঞ্জুর করলেন। অবশেষে ৭৮-এর জুলাই মাসে ভিসা নিয়েই আসতে বাধ্য হলাম। কয়েক মাস পর সরকার আমাকে দেশ থেকে বের হয়ে যাবার আদেশ দেন। আমি সে আদেশ অমান্য করেই দেশে রয়ে গেলাম। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দেশ থেকে বের করার কোন আইনগত পথ না থাকায় সরকার চুপ করে থাকতে বাধ্য হলেন।

৭৮-এ দেশে আসার পর পরই সর্বপ্রথম "বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন" নামে বইটি লিখি। পরবর্তী সংস্করণে বইটি "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" নামে প্রকাশিত হবার পর এ নামেই বহু সংস্করণ বের হয়েছে। দেশের ইসলামী শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে একটি ব্যাপকভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য ছিল। এ বইটিতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের যথেষ্ট খেদমত হচ্ছে। কিন্তু শুধু খেদমতেদ্বীনের দ্বারাই ইসলামের বিজয় হতে পারে না। তাই ইকামাতে দ্বীনের জন্য এর উপযোগী কর্মসূচী ও পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং জামায়াতে ইসলামী সে মহান লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে দৈনিক সংগ্রামে উপ-সম্পাদকীয় কলামে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আমার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে

www.icsbook.info

১৫টি প্রবন্ধ নিয়ে "আমার দেশ বাংলাদেশ" নামে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে ১১টি প্রবন্ধের সংকলন হিসেবে "বাংলাদেশের রাজনীতি" নামে বেশ কয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রথম রুকন সম্মেলনে "বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী" শিরোনামে আমার বক্তৃতায় বাংলাদেশ সম্পর্কে জামায়াতের দৃষ্টিভংগী কী এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে জামায়াত কেমন সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী সে বিষয়ে জামায়াতের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৮ সালে "বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই" নামে বিশেষ করে শ্রমিক সমাজের চিন্তাধারাকে ইসলামী দৃষ্টিতে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি বই লেখা হয়। শ্রমিকরাজ কায়েমের দোহাই দিয়ে কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা মেহনতী মানুষকে তাদের খপ্পরে নেবার জন্য যে ধাপ্পাবাজী সূলভ প্রচারাভিযান পরিচালনা করে তার মুখোশ খুলে দিয়ে শ্রমিকদেরকে সুস্থ বা বাস্তব চিন্তা করার যোগ্য বানানোই এ বইটির উদ্দেশ্য।

১৯৮৮ সালের এপ্রিলে "পলাশী থেকে বাংলাদেশ" নামে প্রকাশিত আমার লেখা পুস্তিকাটিতে ১৯৭১ সালে জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকার বিশ্লেষণ পেশ করা হয়। আলোচ্য বিষয়ের প্রসংগক্রমে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি, পাকিস্তান আমলের কুশাসন, পূর্ব পাকিস্তানের আসল সমস্যা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

"জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা" নামক পুস্তকে ১৯৪১ সালে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র বহাল হওয়া পর্যন্ত জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ও পরবর্তী কালে বাংলাদেশে জামায়াতের রাজনৈতিক ভূমিকা এ দেশের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কিত সকল লেখা থেকে বিষয়ভিত্তিক বাছাই করে বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলিত আকারে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার প্রয়োজন অনেক দিন থেকেই বোধ করছিলাম। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আমার গোটা চিন্তা-ভাবনা একত্র সংকলিত অবস্থায় পেশ করার উদ্দেশ্যেই "আমার বাংলাদেশ" শিরোনামে এ গ্রন্থটি সাজানো হলো।

এ সংকলনে পরিবেশিত প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে যে বইতে ইতিপূর্বে এটা প্রকাশিত হয়েছে তা উল্লেখ করা হলো। কোন কোন প্রবন্ধ পাকিস্তান আমলে

www.icsbook.info

দৈনিক ইত্তেহাদে প্রকাশিত হয়। কোন কোনটি উপরোক্ত কোন বইতে ছাপা হয়নি। মোটকথা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কিত আমার প্রায় যাবতীয় রচনাই এ গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে পুনরাবৃত্তি থাকলেও আশা করি পাঠক পাঠিকাদের বিরক্তির কারণ ঘটবে না। কারণ বিষয় এক হলেও ভাষা ও পরিবেশনা সম্পূর্ণ এক নয়। তবুও পুনরাবৃত্তি না থাকলেই ভাল হতো বলে স্বীকার করি। কিন্তু এর প্রতিকার করা এখন অসাধ্য। এটা করতে গেলে নতুন করে লিখতে হয় যা আমার পক্ষে অসম্ভব। এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

মোট ৯১টি প্রবন্ধকে ১৯ টি শিরোনামে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে (চাপটারে) বিভক্ত করে প্রতি পরিচ্ছেদের অধীনে প্রবন্ধ গুলোকে সাজানো হয়েছে। বিষয় সূচীতে সেভাবেই এক একটি পরিচ্ছেদের নামে প্রবন্ধগুলোর তালিকা পেশ করা হয়েছে যাতে পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই তাদের ইচ্ছামতো বিষয় তালাশ করে নিতে পারেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবকাশ যাপনের সুযোগ না পেলে হয়তো এ সংকলন পরিবেশন করার সময় বের করা সম্ভব হতো না। আশা করি রাজনীতি সচেতন পাঠক-পাঠিকা এ বইটিতে ইসলামী দৃষ্টিভংগীর কিছুটা প্রতিফলন অনুভব করবেন। যে উদ্দেশ্যে এ সংকলনটি প্রণয়ন করা হলো তা আল্লাহ পাক সফল করুন। আমীন।

গোলাম আযম
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
জানুয়ারী, ১৯৯৩।

www.icsbook.info

সূচীপত্র

১. পাকিস্তান-পূর্ব বাংলাদেশ **১৩**
১। বাংগালী মুসলমানদের ইতিহাস ১৩
২। উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব ১৪
৩। ইংরেজ আমলে মুসলিম নিযার্তন ১৪
৪। বৃটিশ-ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ১৫
৫। পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলাম ১৭
৬। বাংলাদেশ ও পকিস্তান আন্দোলন ১৭

২. পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ
৭। বাংলাদেশের মুসলমানদের পার্থিব উন্নতির মূলে ২১
৮। পাকিস্তান আমলের কুশাসন ২২
৯। আইয়ুব খানের যুগ ২৩
১০। মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগের পরিণাম ২৪
১১। ইয়াহইয়া খানের সামরিক শাসন ২৫
১২। ১৯৭০-এর নিবার্চন ও বাংগালী মুসলমান ২৬

৩. ৭০-এর নিবার্চনোত্তর পরিস্থিতি **২৮**
১৩। নির্বাচনের পর ২৮
১৪। ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি ২৮
১৫। টিক্কা খানের অভিযান ২৯
১৬। আত্মঘাতী লড়াইয়ের পরিণাম ৩০

৪. স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন **৩২**
১৭। স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি ৩২
১৮। সরকারের ভ্রান্তনীতি (রাষ্ট্র ভাষা, গণতন্ত্র, অর্থনীতি) ৩৩
১৯। ভুট্টো-ইয়াহইয়া ষড়যন্ত্র ৩৪

৫. স্বাধীনতা আন্দোলনে কার কী ভূমিকা **৩৬**
২০। স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন ৩৬
২১। বামপন্থীদের ভূমিকা ৩৬
২২। ভারতের ভূমিকা ৩৭

www.icsbook.info

২৩। ভারত বিরোধীদের পেরেশানী ৩৭
২৪। ইসলামপন্থীদের সংকট ৩৮
২৫। ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীদের ভূমিকা ৩৯
২৬। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা ৩৯
২৭। ৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা ৪০

৬. রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও দেশপ্রেম ৪৩
২৮। জন্মভূমিরূপ আল্লাহর মহাদানের শুকরিয়াই হলো দেশপ্রেম ৪৩
২৯। যারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শরীক হয়নি তারা কি স্বাধীনতা বিরোধী ছিল ? ৪৭
৩০। রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বাধীনতা বিরোধী হওয়া এক কথা নয়। (শেরে বাংলা ও সোহ্‌রাওয়ার্দী) ৪৮

৭. স্বাধীন বাংলাদেশে ৭২ সালের সমস্যা ও সমাধান ৫২
৩১। বর্তমান সমস্যার কারণ ৫২
৩২। সমাধানের উপায় ৫৩
৩৩। বাংগালী মুসলমানদের করণীয় ৫৩
৩৪। মুক্তির একই পথ ৫৫
৩৫। জনগণের দাবী ৫৬

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্যা কী ছিল ? ৫৭
৩৬। জামায়াতের দৃষ্টিতে সমস্যা কী ছিল ? ৫৭
৩৭। বংগভংগ আন্দোলন ৫৮
৩৮। বংগভংগ বাতিল আন্দোলন ৫৮
৩৯। পূর্ব বাংলার উন্নয়ন ৫৯
৪০। কেন সার্বিক উন্নয়ন হলো না ৬০
৪১। নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের অভাব ৬১

৯. বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা ৬৩
৪২। আমার দেশ বাংলাদেশ ৬৩
৪৩। আমার ভাষা বাংলাভাষা ৬৯
৪৪। আমার হল ফজলুল হক মুসলিম হল ৭৩

১০ বাংলাদেশের জাতীয়তা ৭৭
৪৫। বাংলাদেশের জাতীয়তা ৭৭
৪৬। বাংগালী মুসলমান বনাম বাংগালী জাতি ৭৮
৪৭। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ৮১

www.icsbook.info

৪৮। এপার বাংলা ওপার বাংলা ৮৩
৪৯। বাংলাদেশের পটভূমি ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ ৮৪

১১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৮৬
৫০। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৮৬
৫১। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ৯০
৫২। বাংলাদেশের সম্ভাব্য আক্রমণকারী ৯২
৫৩। বাংলাদেশের আযাদী রক্ষা ৯৪
৫৪। এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা ? ৯৭
৫৫। ইসলামপন্থীদের ৭১ পরবর্তী ভূমিকা ৯৯

১২. বাংলাদেশের আসল সমস্যা ১০১
৫৬। বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যা ১০১
৫৭। বাংলাদেশ কি সত্যি দরিদ্র ? ১০৭
৫৮। বাংলাদেশের আসল অভাব ১০৮

১৩. বাংলাদেশ ও ইসলাম ১১২
৫৯। ইসলাম প্রিয় বাংলাদেশ ১১২
৬০। বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তি ১১৩

১৪. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী ১১৪
৬১। বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক ১১৪
৬২। বাংলাদেশের জনগণের সাথে আমাদের সম্পর্ক ১১৫
৬৩। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পর্ক ১১৭

১৫. বাংলাদেশের রাজনীতি ১২০
৬৪। রাজনীতির সংজ্ঞা ১২০
৬৫। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ১২২
৬৬। সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির নীতিমালা ১২৫
৬৭। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ১২৬

১৬. গণতন্ত্র বনাম বিপ্লব ১৩১
৬৮। বিপ্লব বনাম গণতন্ত্র ১৩১
৬৯। সামরিক বিপ্লব ১৩৬
৭০। সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনীতি ১৩৯
৭১। সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণ ১৪১
৭২। গণতন্ত্রের দুর্গতি কেন ? ১৪৬

www.icsbook.info

১৭. আদর্শিক রাজনীতি **১৫৫**
৭৩। ডুগডুগী বনাম আদর্শের রাজনীতি ১৫৫
৭৪। রাজনীতি ও নৈতিকতা ১৬০
৭৫। সুস্থ রাজনীতির ভিত্তি ১৬৩
৭৬। রাজনীতি ও সমাজ সেবা ১৬৭
৭৭। চরিত্রবান লোকদের শাসন ১৬৯

১৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম **১৭১**
৭৮। বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি ১৭১
৭৯। গণতন্ত্র ও ইসলাম ১৮০

১৯. বাংলাদেশের উপযোগী সরকার পদ্ধতি **১৮৩**
৮০। সরকার পদ্ধতি ১৮৩
৮১। গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি ১৮৪
৮২। দু'পদ্ধতির পার্থক্য ১৮৫
৮৩। গণতান্ত্রিক বিশ্বের সরকার পদ্ধতি ১৮৫
৮৪। সরকার পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ১৮৬
৮৫। গণতান্ত্রিক সরকার ১৮৭
৮৬। পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের রাষ্টপ্রধান ১৮৯
৮৭। প্রেসিডেন্ট নিবার্চন পদ্ধতি ১৯০
৮৮। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ১৯২
৮৯। জনগণের প্রেসিডেন্ট ১৯২
৯০। বাংলাদেশের পলিটিকেল সিষ্টেম ১৯৪
৯১। ৫ দফা প্রস্তাব ১৯৬

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাকিস্তান-পূর্ব বাংলাদেশ

বাংগালী মুসলমানদের ইতিহাস

ভারতের বহু স্থানেই মুসলিম শাসনের ফলে নতুন মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু বাংলা ও আসামের যে ভূ-খন্ডটি ২৫-২৬ বছর আগে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের অংশ হিসাবে যোগাদান করেছিল সেখানে এত বেশী মুসলমান কি করে হল সে ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই। দিল্লিতে শত শত বছর মুসলিম শাসকদের রাজধানী থাকা সত্ত্বেও চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা সব সময়ই কম ছিল। কিন্তু বাংলার মাটিতে মুসলিম শাসন শুরু হবার পূর্বেই বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনতা মুসলমান হয়। ইসলাম প্রচারক আরব বণিকদের প্রচেষ্টায় চাটগাঁ দিয়ে এই এলাকায় ইসলামের আলো পৌঁছে। স্থানীয় অধিবাসিরা ব্যবসায়ে লেনদেনের সাথে সাথে তাদের নিকট মানবিক অধিকার ও মর্যাদার সন্ধান পেয়ে মুসলিম হওয়া শুরু করেছিল। এমন উর্বর জমির খোঁজ পেয়ে ইসলামের আলো নিয়ে বহু নিঃস্বার্থ মুবাল্লিগ এদেশে আগমন করেন। এভাবে নদীমাতৃক বাংলায় ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই বখতিয়ার খিলজি মাত্র ১৭ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী সেনা নিয়ে গৌঢ় আক্রমণ করলে গৌঢের রাজা ভীতু লক্ষণ সেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করে এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। বাংলার সাথে সাথে আসামের দিকেও যখন মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে লাগল তখন বতর্মান সিলেট অঞ্চলের রাজা গৌরগোবিন্দের মুসলিম-বিরোধী চক্রান্তকে খতম করার জন্য হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র) ৩৬০ জন মুজাহিদ নিয়ে এদেশে আসেন।

সুতরাং ইতিহাস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে শাসকের ধর্ম হিসাবে এ এলাকায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েই মানুষের মত ইয্যত নিয়ে বাঁচার তাগিদেই তারা মুসলমান হয় এ কারণেই এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এত বেশী ইসলাম পরায়ণ। ধর্মের নামে শাসকদের অধর্মের ফলে বতর্মানে যুব শ্রেণীর একাংশে যে ধর্ম বিরোধী তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সাময়িক এবং তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

(বাংগালী মুসলমান কোন পথে)

www.icsbook.info

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব

১৭৫৭ সালে স্বাধীন বাংলার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর ইংরেজের সহযোগিতায় নিজে নওয়াব হওয়ার যে কুমতলব করেছিল তারই ফলে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয়। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতার জন্য আপন দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাকে সংগত কারণেই ইংরেজরাও বিশ্বাস করতে পারল না। এভাবেই মীর জাফরের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করা হলো।

১৮৫৭ সালে দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংরেজ রাজত্ব গোটা ভারত উপমহাদেশে মযবুত করা হলো। এভাবে উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে একশ' বছর লেগে গেল। এভাবেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে পরাধীনতার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, তা একশ' বছরে বিরাট মহীরুহে পরিণত হলো।

১৮৩১ সালে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের সীমানায় বালাকোটের যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (র) ও শাহ ইসমাঈল (র)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের প্রথম সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনের পরাজয়ের পর ইংরেজদের শক্তি আরও বেড়ে গেল। কিন্তু এ ইসলামী আন্দোলনের ফলেই ১৮৫৭ সালে ইংরেজ বাহিনীতে নিযুক্ত মুসলমান সিপাহিরা বিদ্রোহ করার প্রেরণা লাভ করেছিল।

এর পরের ইতিহাস মুসলিম জাতিকে চিরতরে গোলাম বানাবার জন্য ইংরেজদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। এ উপমহাদেশে প্রায় ৬০০ বছর মুসলিম শাসন চলেছে। তাদের হাত থেকে পূর্ণ ক্ষমতা কেড়ে নিতে ইংরেজদের ১০ বছর লেগেছে। তাই দিল্লী দখলের পর এদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ইংরেজরা মুসলমানদেরকে সকল ময়দান থেকে উৎখাত করে অমুসলিম জাতিগুলোকে শিক্ষা, সরকারী চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জমিদারিতে এগিয়ে দিল। ফলে ৫০ বছরের মধ্যে এদেশের মুসলিম শাসক জাতি, দাস জাতিতে পরিণত হয়ে গেল। ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হান্টারের "দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস" বইটি এ কথার বিশ্বস্ত সাক্ষী।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

ইংরেজ আমলে মুসলিম নির্যাতন

মীর জাফরের স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রের পরিণামে ইংরেজ বেনিয়ারা শাসক হয়েই সর্বক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকে সুযোগ সুবিধা দান ও মুসলমানদের সব

www.icsbook.info

ব্যাপারে চরমভাবে বঞ্চিত করার নীতি গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘকাল শাসকের মর্যাদায় আসীন থাকার পর মুসলমানেরা যে কিছুতেই গোলামী মেনে নেবে না একথা ইংরেজ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাই মুসলমানদেরকে দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ করা ছাড়া ইংরেজ রাজত্ব যে স্থায়ী হওয়া সম্ভব ছিল না এ বাস্তবতা অনুধাবন করেই তারা মুসলিম পীড়ন শুরু করে।

ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পঞ্চাশ বছর পরে লিখিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান'স গ্রন্থে উইলিয়াম হান্টার বাংগালী মুসলমানদের দুরবস্থার যে চিত্র অংকন করেন তা থেকেই তৎকালীন মুসলমানদের সামগ্রিক অবস্থা সহজে বুঝা যায়। তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'পঞ্চাশ বছর আগে অশিক্ষিত ও দরিদ্র কোন বাংগালী মুসলমান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল, আর এখন কোন শিক্ষিত ও ধনী মুসলমান তালাশ করে পাওয়া অসম্ভব'। ইংরেজ ও অমুসলিমদের যোগসাজশে ইংরেজদের সরকারী কর্মচারী হিসাবে হিন্দুরা জেঁকে বসল। রাষ্ট্রভাষা ইংরেজীকে মনিবের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে তারা সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করল। চরম বিদ্বেষ নিয়ে ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা ও জমিজমা থেকে বঞ্চিত করে হিন্দুদেরকে মহাজন ও জমিদারে পরিণত করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামক কালাকানুনের মারফতে বাংগালী মুসলমানকে হিন্দুর অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করা হল।

ইংরেজ শাসনের ফলে গোটা ভারতেই মুসলমানদের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মুসলমানদের মতো এত দীর্ঘকাল এমন ব্যাপক নির্যাতন ভারতের কোন এলাকার লোকই ভোগ করেনি। কারণ ইংরেজ শাসন বাংলার মাটি থেকেই শুরু হয় এবং দিল্লী পর্যন্ত দখল করে মজবুত হয়ে বসতে তাদের একশ' বছর লেগে যায়। তাই বাংগালী মুসলমানরা পৌনে দু'শ বছর ইংরেজ ও হিন্দুদের যৌথ গোলামী করতে বাধ্য হয়। এ গোলামীর প্রতিবাদ যে হয়নি এমন নয়, মুসলমানরা কোন দিনই ইংরেজ শাসন মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি। আর এ প্রতিবাদের ফলেই ইংরেজরা মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে পংগু করে রাখতে চেষ্টা করে।

(বাংগালী মুসলমান কোন পথে)

বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন

শিক্ষায়-দিক্ষায়, ধনে-দৌলতে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে মুসলিম জাতিগুলো অগ্রসর হবার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পরিচালনায় ও অমুসলিম নেতৃত্বে যখন দেশকে ইংরেজের গোলামী থেকে স্বাধীন করার আন্দোলন শুরু

www.icsbook.info

হলো তখন অর্ধমৃত অবস্থায়ও মুসলিম জাতি তাতে সাড়া দিল। ইংরেজ বিদ্বেষ তাদের মজ্জাগত ছিল। কারণ তাদের হাত থেকেই ইংরেজরা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মুসলিম নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন যে, এ স্বাধীনতা দ্বারা ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি পেলেও মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের অধীন হয়েই থাকতে হবে। গোটা ভারতে তখন ৪০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ১০ কোটি মুসলমান ছিল। তাই গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলেও সংখ্যালঘু মুসলমানরা চিরদিনই অমুসলিমদের অধীন হয়েই থাকতে বাধ্য হতো।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার যখন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভা কায়েম করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে স্বায়ত্ত শাসনের নামে আংশিক ক্ষমতা তুলে দেবার ব্যবস্থা করল, তখন মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করে কিছুটা আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করল। মুসলিম জনগণের প্রতিনিধি যাতে শুধু মুসলিমদের ভোটে নির্বাচিত হতে পারে, সে ব্যবস্থার নামই পৃথক নির্বাচন। যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় মুসলিম ও অমুসলিমদের মিলিত ভোটে নির্বাচন হলে কংগ্রেসের অমুসলিম নেতাদের মরযী অনুযায়ী কিছু সংখ্যক মুসলিম আইন সভায় নির্বাচিত হলেও জাতি হিসাবে মুসলিমদের কোন পৃথক সত্তা থাকবে না আংশকা করেই মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন দাবী করেছিল।

১৯৩৫ সালের ঐ আইন অনুযায়ী ১৯৩৬ সালে যে নির্বাচন হয়, তাতে ভারতের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন কায়েম হয়। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু ছিল বলে অবিভক্ত বাংলাসহ ৪টি প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বেশী থাকায় আনুপাতিক হারে এ চারটি আইন সভায় মুসলিম সদস্য সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে বেশী হয়।

মিঃ জিন্নাহ মুসলিম জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মুসলমানরা তাঁকে কায়েদে আযম (শ্রেষ্ঠ নেতা) হিসাবে বরণ করে নেয়। তাঁরই নেতৃত্বে এবং মুসলিম লীগের উদ্যোগে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে ঐতিহাসিক মহা সম্মেলন অনষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হকই ঐ সম্মেলনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলো নিয়ে ভারত থেকে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন, যা সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাবটিই ইতিহাসে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

www.icsbook.info

১৯৪৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভা ও ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুসলিম লীগ ঐ পাকিস্তান প্রস্তাবকেই নির্বাচনী ইস্যু বানায়। সারা ভারতে মুসলিমগণ একটি পৃথক জাতিসত্তার মযার্দা সহকারে ঐ নির্বাচনে নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি না থাকলে এ বিজয় কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। এ বিজয়ের ফলে বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার পাকিস্তান দাবী মেনে নেয় এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

পাকিস্তান আন্দোলন ও ইসলাম

"পাকিস্তানের অর্থ কী—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।এ শ্লোগানই মুসলমানদের এ আন্দোলনে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এমন কি ভারতের যে ৭টি প্রদেশ ভারতের অন্তরভুক্ত থাকবে বলে জানাই ছিল, সেখানেও মুসলমানরা ইসলামের আকর্ষণে পাকিস্তানের দাবীকে নিরংকুশভাবে সমর্থন করেছে। এর পরিণামে লক্ষ লক্ষ মুসলমান শহীদ হয়েছে এবং জন্মভূমি ও সহায় সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা তাদের ঐ "অন্যায়ের কঠোর শাস্তি" এখনও ভোগ করে চলেছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, "পাকিস্তান আন্দোলন" ইসলামের নামে চলা সত্ত্বেও তা "ইসলামী আন্দোলন" হিসাবে গড়ে উঠেনি। পাকিস্তান কায়েম হবার পর স্বাধীন মুসলিম দেশটিতে ইসলামী আইন, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা চালু করার কোন পরিকল্পনাই আন্দোলনের নেতারা করেননি। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে। যারা ইসলামকে জানেন না বা যারা নিজের জীবনেই ইসলাম মেনে চলেন না, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রে কী করে ইসলাম কায়েম করবেন ? ইসলামের ব্যাপারে এ ধোকাবাজি করার ফলে নেতারা অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা হারালেন। সেনাপতি আইয়ুব খান সে সুযোগে ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করলেন।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আন্দোলন

অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন অনষ্ঠিত হয় তাতে ভারতের ১০ কোটি মুসলমান একটি আলাদা জাতি হিসেবে পাকিস্তান দাবীকে নির্বাচনী ইস্যু বানায়। ঐ দাবীতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জাতি

www.icsbook.info

অখন্ড ভারত রাষ্ট্রে বিশ্বাসী নয়। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম আসনগুলোর শতকরা ৯৭টিতে পাকিস্তানবাদীরাই জয়ী হয়। বর্তমান পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের কোথাও এমন বিপুল সংখ্যায় বিজয় লাভ সম্ভব হয়নি। সুতরাং এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, পাকিস্তান আন্দোলনে বাংগালী মুসলমানদের অবদানই সবচেয়ে বেশী। এর যুক্তিসংগত কারণও রয়েছে।

ইংরেজ শাসন সর্বপ্রথম বাংলায়ই কায়েম হয়। দিল্লী পর্যন্ত দখল করতে ইংরেজদের আরও একশ বছর লেগে যায়। সে হিসাবে এদেশের মানুষ সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ইংরেজদের গোলামী করতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর স্বাভাবিকভাবেই তাদের রাজত্ব স্থায়ী ও মজবুত করার উদ্দেশ্যে এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অমুসলমানদের মধ্য থেকে সহায়ক শক্তি তালাশ করতে থাকে। রাজ্যহারা ও ক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের পক্ষে ইংরেজদের দাসত্ব মেনে নেয়া যেমন সম্ভব ছিল না, ইংরেজদের পক্ষেও মুলমানদেরকে বিশ্বাস করা সহজ ছিল না। বিশেষ করে সব জায়গায়ই মুসলমানরা সাধ্য মতো প্রতিরোধের চেষ্টা করায় তারা এক শ্রেণীর হিন্দুদের সহযোগিতাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য মনে করলো। মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই দেখা গেল যে, সরকারী চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে পুর্বে মুসলমানরাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল সেখানে হিন্দুরা একচেটিয়াভাবে কর্তৃত্বের আসন পেয়ে গেল। এ কারণেই বাংগালী মুসলমানরা প্রায় দেড়শ' বছর ইংরেজদের রাজনৈতিক গোলামী, হিন্দুদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামী সহ্য করেছে। এ ডবল দাসত্ব মুসলমানদের মধ্যে এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে, বাংগালী মুসলমানদের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বাণী অতি সহজেই জনপ্রিয় হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলমানদের প্রাধান্যে আলাদা রাষ্ট্র কায়েম না হলে ইংরেজদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েও হিন্দুদের অধীনতা থেকে রক্ষা পাওয়া যে কিছুতেই সম্ভব ছিল না সে কথা বুঝতে বাংগালী মুসলমানদের কোন বেগ পেতে হয়নি।

এ কারণেই বাংগালী মুসলামনদের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদেরকে পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তের মুসলমানদের এতটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়নি।

পাকিস্তান আন্দোলন ১৯৪০ সালে সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে শুরু হয় এবং সাত বছরের মধ্যে বিজয় লাভ করে। ঐ আন্দোলনের সময় যাদের বয়স ১৫/২০ বছরের নীচে ছিল না। তাদের এ বিষয় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকার কথা।

www.icsbook.info

১৯৪০ সালে যাদের বয়স অন্তত ১৫ বছর ছিল তারা একাথার সাক্ষী যে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, জমিদারী-কাচারিতে মুসলমানদের সাথে হিন্দুরা কিরূপ আচরণ করতো।

আমাদের এলাকায় (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জিলার নবীনগর থানা) কৃষ্ণ নগর জমিদার বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে কোন মুসলমানের ছাতা মাথায় ও জুতা পায়ে দিয়ে চলার অনুমতি ছিল না। বরকন্দাজ লাঠিয়ালরা এ নিয়ম অমান্যকারী মুসলমানদেরকে গ্রেফতার করে জমিদার বাবুর নায়েবের নিকট বিচারের জন্য পেশ করতো।

কুমিল্লা জিলার চান্দিনা থানা কেন্দ্রে ১৯৩৬ সালে আমার আব্বা চাকুরী উপলক্ষে বদলী হয়ে যান। তখন চান্দিনা হাইস্কুলে এক ব্রাহ্মণ হেডমাস্টার ছিলেন এবং আরবীর শিক্ষক ছাড়া মাত্র একজন মুসলমান শিক্ষক ছিলেন। ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে স্কুল কমিটিতে মুসলমান ছাত্রদের অভিভাকদের দু'জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। কমিটির বৈঠকের সময় সবার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা থাকলেও মুসলমান সদস্য দু'জনকে গোল টুলেই বসতে বাধ্য হতে হতো। পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হবার পর সুস্পষ্ট দাবীর ফলে মুসলমানদের ভাগ্যে চেয়ার জুটে।

এখনও এমন অনেক লোক বেঁচে আছে যারা এককালে নিজেদের এলাকায় জমিদারদের দাপটের দরুণ গরু কুরবানী দিতে পারেনি। জমিদারদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণে মুসলমানদেরকেও বাধ্য হয়ে খাজনার সাথে পূজার চাঁদা দিতে হতো। খাজনা ও ঋণের দায়ে মুসলমান কৃষকের বেশীর ভাগ লোকের জমিজমা ও ভিটেমাটি নিলামের মাধ্যমে জমিদার ও টাকা লগ্নীকারী সাহাদের দখলে চলে যেতো। ১৯৩৭ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হক ও খাজা নাযীমুদ্দিনের মন্ত্রীত্বের সময় প্রজাস্বত্ব আইনের বলে এ জাতীয় চরম যুলুম থেকে মুসলমানরা রেহাই পায়।

এসব কথা ঐতিহাসিক সত্য। উচ্চ বর্ণের ঐ হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই এখন বাংলাদেশে নেই। যারা আছে তাদের পূর্ব-পুরুষদের কৃতকর্মের জন্য তারা অবশ্যই দায়ী নয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। তারা এদেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের দেশীয় ভাই। কিন্তু হিন্দুদের সাথে মিলে অখন্ড ভারতে একই রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হতে কেন মুসলমানরা রাজি হতে পারেনি, সে কথা বুঝতে হলে ঐ ইতিহাসের আলোচনা না করে উপায় নেই।

www.icsbook.info

আজকের মুসলমান যুবকদের মধ্যে যারা হিন্দু মুসলিম মিলিত জাতীয়তার সমর্থন করছে তারা ঐ ইতিহাস জানে না। না জানার জন্য তারা অবশ্যই দায়ী নয়। পাকিস্তান হবার পর এদেশের মুসলমানদের পরবর্তী বংশধরদেরকে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই জানানো উচিত ছিল যে, কী কারণে ভারত বিভক্ত হলো, কিভাবে বাংলাভাষী অঞ্চলটি পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে গেল এবং শত শত বছর এক দেশে বাস করেও হিন্দু-মুসলমান-শিখ মিলে কেন এক জাতির সৃষ্টি হতে পারলো না।

যারা পাকিস্তানের উপর ২৫ বছর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করেছেন তারা যদি দ্বিজাতিতত্ত্বের মর্ম বুঝতেন এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতেন তাহলে যাদের ভোটে ভারত বিভক্ত হয়েছিল তাদের সন্তানদের মধ্যে চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো না।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মুসলমানদের পার্থিব উন্নতির মূলে

ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের মুসলমান গোটা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে অনুন্নত ছিল। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ হয় তখন সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙ্গালী মুসলমান ছিল না বল্লেই চলে। অফিসার তো দূরের কথা জোয়ানের সংখ্যাও অতি নগণ্য ছিল। পুলিশ কর্মকর্তা কিছু থাকলেও ১৯৪৭ সালে হিন্দু পুলিশ অফিসার ও সিপাহীরা ভারতে চলে যাবার পর এদেশের থানা পাহারা দেবার মতো পুলিশেরও অভাব দেখা দিল। সিভিল সার্ভিসে একজন মাত্র আই, সি, এস, মানের বাঙ্গালী মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রমোশনের মাধ্যমে এ পদ পেয়েছিলেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষকদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

যদি ভারত বিভক্ত না হতো তাহলে আজকাল যারা সরকারী অফিসে বড় বড় পদ দখল করে আছেন তাদের অনেকেই কেরানী থেকে প্রমোশন পেয়ে বড় জোর সেকশন অফিসার পর্যন্ত উন্নতি করতে পারতেন। আজ যারা জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার তাদের কয়জন অফিসার হতে পারতেন—তারাই হিসাব করে দেখতে পারেন।

আজ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত থেকে মুসলিম জাতীয়তার নাম শুনলেই নাক সিটকান এবং কংগ্রেসীদের ভাষায় সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেন তাদের ক'জন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পেতেন তা বিবেচনা করার যোগ্যতাটুকু তারা রাখেন বলেই আশা করি।

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখান ও আমদানি-রপ্তানির ময়দানে আজ যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা এ ময়দানে কোন পাত্তা পাওয়ার আশাও কি করতে পারতেন?

জীবনের সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা হতো যদি পাকিস্তান সৃষ্টি না হতো। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই যে, মুসলিম জাতীয়তাই বাঙ্গালী মুসলমানদের বর্তমান পার্থিব উন্নতির মূলে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

www.icsbook.info

বাংলাদেশ হবার সাথে সাথে মাড়োয়ারী ও পশ্চিম বঙ্গের দাদারা যে রকম তৎপরতা শুরু করেছিলেন, মুসলিম জাতীয়তাবোধই তাদেরকে শেষ পর্যন্ত নিরাশ করেছে। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের পর মুসলিম জাতীয়তার চেতনা আবার জাগ্রত না হলে বর্তমান বৈষয়িক অবস্থাটুকুও টিকে থাকতো না। সুতরাং মুসলিম জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশের মুসলমানদের পার্থিব স্বার্থেরও সংরক্ষক।

মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত না হলে ঢাকা কখনো রাজধানীর মর্যাদা পেতো না। অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতার অধীনে ঢাকা এককালে একটি জিলা শহর মাত্র ছিল। পাকিস্তান হবার পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায় এর উন্নতি শুরু হয়। বাংলাদেশ হবার পর এর আরও উন্নতি হয়েছে এবং এ উন্নতি অব্যাহত থাকাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে যে হারে শিল্প ও বড় বড় কল-কারখানা গড়ে উঠেছে তাও ভারত বিভাগেরই ফলে সম্ভব হয়েছে। অবিভক্ত ভারতের অধীনে এদেশে শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি হলেও তাতে মুসলমানদের সামান্য প্রাধান্য লাভ করাও সম্ভব হতো না।

আজ মুসলমানদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে এদেশের সর্বক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে তা মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত বিভাগেরই প্রত্যক্ষ ফসল।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

পাকিস্তান আমলের কুশাসন

ইসলামের নাম নিয়ে মুসলমানদের ঈমানকে উজ্জীবিত করে পাকিস্তান হাসিল করা সত্ত্বেও এর শাসকগণ ইসলামের প্রতি আন্তরিকতার কোন পরিচয়ই দিতে পারেনি। ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও যদি তারা অন্তত গণতন্ত্রকে চালু হতে দিত তাহলে পাকিস্তানের এ দুর্গতি হতো না। একই সাথে পাক ভারত স্বাধীন হলো এবং একই গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পয়লা সরকার গঠিত হলো। অথচ ভারতে দু'বছরের মধ্যেই শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে গেল এবং কয়েকটি নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হল। আর পাকিস্তানে ২৫ বছরেও কোন স্থায়ী শাসনতন্ত্র হতে পারলো না। জনগণের নির্বাচিত সরকারও গঠিত হলো না।

সামরিক ও বেসামরিক যেসব চক্রান্তকারী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে দিন দিন এ ধারণা সৃষ্টি হতে লাগল যে,

www.icsbook.info

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাংগালী মুসলমানরা দেশ শাসন থেকে বঞ্চিত। যদি গণতান্ত্রিক শাসন চালু করা হতো তা হলে অর্থনৈতিক অবিচার ও বৈষম্য নিয়ে আইন সভায় বিতর্ক হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির সুযোগ হতো না। জনগণের সরকার কায়েম হলে বৈষম্য ও শোষণ দূর করা সহজ হতো এবং বাংগালী মুসলমান তার অধিকার আইনের মাধ্যমে হাসিল করতে পারতো।

গণতন্ত্রের ঐ দুশমনরা পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী বলে কি সেখানকার জনগণ তাদেরকে সমর্থন করেছিল ? জনগণ সেখানেও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে। সুতরাং একথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে পাকিস্তানেরঅ গণতান্ত্রিক শাসক-চক্রই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। *(বাংগালী মুসলমান কোন পথে)*

আইয়ুব খানের যুগ

আইয়ুব খান জাঁদরেল শাসক ছিলেন। মুসলিম লীগের নামেই তিনি রাজত্ব করেছেন। অথচ তিনি তার শাসনকালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে একনায়কত্বই চালিয়ে গেছেন। গণতন্ত্রকামী সব দলের সাথে মিলে জামায়াতে ইসলামী আইয়ুব আমলের দশ বছর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে আগা গোড়াই সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাস থেকে জামায়াতের এ বলিষ্ঠ ভূমিকা মুছে ফেলার সাধ্য কারো নেই।

আইয়ুব খান জামায়াতে ইসলামীর উপর সবচেয়ে বেশী ক্ষেপা ছিলেন। কারণ জামায়াত গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার সাথে সাথে আইয়ুব খার ইসলাম বিরোধী কার্য-কলাপের প্রতিবাদ করতো। তাই ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলাকালে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীকেই বে-আইনি ঘোষণা করা হয় এবং ৬০ জন জামায়াত নেতাকে জেলে আটক করা হয়। ৯মাস পর সুপ্রীম কোর্ট রায় দেন যে জামায়াতকে বে-আইনি ঘোষণা করাটাই বে-আইনি হয়েছে।

সরকারী অবহেলার ফলে ইসলামী চেতনা ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ তো আইয়ুব আমলের পূর্ব থেকেই লোপ পাচ্ছিল। আইয়ুব আমলে ভাষা ও এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তা শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এল। পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও ভৌগলিক দিক দিয়ে একসাথে থাকায় এবং ভারতের সাথে কয়েকদফা যুদ্ধ হওয়ায় সেখানে মুসলিম ঐক্যবোধ কোন রকমে বেঁচে রইল।

www.icsbook.info

কিন্তু পূর্বাঞ্চলের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ভৌগলিক দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিসের ভিত্তিতে এখানকার মানুষ পশ্চিমের সাথে একাত্মতা বোধ করবে ? ইসলামই একমাত্র সেতু বন্ধন হতে পারতো। কিন্তু সরকারী ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে কোন স্থানই দেয়া হল না। যে মুসলিম জাতীয়তার চেতনা গোটা উপমহাদেশের মুসলিমদেরকে ১৯৪৬ সালে ঐক্যবদ্ধ করেছিল সে চেতনা বাঁচিয়ে রাখারও কোন প্রচেষ্টা দেখা গেল না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হবার মাত্র ১০/১৫ বছর পর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একথা জানারও সুযোগ রইল না যে ভারতবর্ষ দু'ভাগ কেন হলো ? পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলার মাতৃভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা কেন দু'ভাগ হলো ? বাংলাভাষী অমুসলিমের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদেরকে কেন বেশী আপন মনে করতে হবে ? ফলে ঈমান ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ বিনষ্ট হয়ে এলাকা ও ভাষা ভিত্তিক ঐক্যবোধ জন্ম নিলএবং বাংলাভাষী অঞ্চলে স্বাতন্ত্র বোধের বিকাশ অবধারিত হয়ে উঠল।

রাজনৈতিক ময়দানে যে আদর্শিক শূন্যতা সৃষ্টি হল সেখানে সমাজতন্ত্র এগিয়ে আসার সুযোগ পেল। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে যাতে ইসলামের কোন প্রভাব না পড়ে সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ময়দান দখল করতে এগিয়ে এল। এভাবে এলাকা ও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক অংগনে মুসলিম জাতীয়তার স্থান দখল করতে লাগল।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগের পরিণাম

মুসলিম জাতীয়তাবোধ চল্লিশের দশকে অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী দশ কোটি মুসলমানকে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিল। এরই সুফল হিসাবে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ঐ জাতীয়তাবোধকে লালন না করার ফলে যে শুন্যতা সৃষ্টি হল তা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবোধ এসে পূরণ করল।

যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ মুসলিম জাতীয়তার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাকেই রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলেন তারা স্বাভাবিক কারণেই নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতি করার অযোগ্য হয়ে পড়লেন। কারণ পাঠান জাতীয়তার পতাকাবাহী বাংলাভাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সিন্ধী জাতীয়তাবাদী নেতা পাঠানদের নেতা বলে গণ্য হওয়া সম্ভব নয়। তেমনি বাংগালী জাতীয়তাবাদ

www.icsbook.info

পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তে রাজনৈতিক আদর্শ বলে গণ্য হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং স্বাভাবিক রাজনৈতিক বিবর্তনেই আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ হয়ে যাবার পর তাদের রাজনীতি পাকিস্তান ভিত্তিক না হয়ে শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। গোটা পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে চিন্তা করার পরিবর্তে তাদের সকল পরিকল্পনা শুধু বর্তমান 'বাংলাদেশ' এলাকাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল।

কিন্তু যারা রাজনীতি করেন, তারা অবশ্যই ক্ষমতায় যেতে চান। ক্ষমতাসীন না হয়ে কোন রাজনেতিক কর্মসূচীই বাস্তবায়ন করা যায় না। সুতরাং যারা শুধু পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাদের ক্ষমতায় যেতে হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

ওদিকে মিঃ ভুট্টোও ক্ষমতার জন্য পাগল হয়ে একই দেশে দু'মেজরিটি দলের অদ্ভুত দাবী তুললেন। দেশ ভাগ না হলে ভুট্টোরও ক্ষমাতাসীন হবার কোন উপায় ছিল না। ভুট্টো ক্ষমতায় যাবার জন্য জেনারেল ইয়াহইয়ার সাথে যে ষড়যন্ত্র করলেন, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়া ত্বরান্বিত হয়ে গেল।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

ইয়াহইয়া খানের সামরিক শাসন

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে প্রচন্ড গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ক্ষমতা ত্যাগ করে সেনাপতি ইয়াহইয়া খানকে সামরিব আইন জারী করার সুযোগ করে দিলেন। আইয়ুবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দশ বছর ধরে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলেছিল এর ফলে বিনা নির্বাচনে আর দেশ শাসন সম্ভব ছিল না। তাই ইয়াহইয়া খান সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করলেন। সমগ্র অবিভক্ত পাকিস্তানে এটাই প্রথম ও শেষ সাধারণ নির্বাচন।

যে টু-নেশন থিউরি ও পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছিল এবং যে মুসলিম ঐক্যবোধের ভিত্তিতে পশ্চিমের ৪টি প্রদেশের সাথে পূর্ব বাংলাকে মিলিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়েছিল, সে জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার কোন সরকারী প্রচেষ্টা না থাকায় পাকিস্তান কায়েমের ২৩ বছর পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তার ফলাফল দেখে বুঝা গেল যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান ৩ ভাগে ভাগ হয়ে গেল।

www.icsbook.info

বাংলাদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে মিঃ ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টি এবং বাকী দু'টো প্রদেশে অন্য দু'টো দলের নিরংকুশ বিজয় একথা প্রমাণ করল যে, পাকিস্তানের ঐক্যের ভিত্তি আর বেঁচে নেই। যে ভিত্তিতে নির্বাচনের ফলে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, সে ভিত্তি না থাকায় নির্বাচনের মাধ্যমেই পাকিস্তানের ভিত্তি ভেংগে গেল।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

১৯৭০-এর নির্বাচন ও বাংগালী মুসলমান

দীর্ঘ ২৩ বছর পর ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে গোটা পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্ত নিবার্চনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলমানের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও হিন্দুরা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে যে দলটিকে একচেটিয়া ভোট দিয়েছে, বাংগালী মুসলমান ভোটাররা সে দলটিকেই বিপুল সংখ্যায় ভোট দিলেও তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। বাংগালী মুসলমানদের অধিকাংশের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় একজন বাংগালী নেতাকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে এবং কেন্দ্রীয় আইন-সভায় সেই নেতার পক্ষে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন না থাকলে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করা সম্ভব হবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে বিভিন্ন কারণে বাংগালী মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনগণ একমাত্র শেখ মুজিবকেই প্রাধান্য দেয়। শেখ সাহেবের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপনের ফলে তাঁর দলকে এক চেটিয়াভাবে জয়যুক্ত করা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হস্তগত করা সম্ভব ছিল না। কারণ শেখ সাহেবের দলের পশ্চিম পাকিস্তানের কোন আসন লাভের আশা ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইন সভায় পূর্ব পাকিস্তানেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবার কথা। তাই পূর্ব পাকিস্তানের সব আসনে শেখ সাহেবের সমর্থক প্রার্থীকে ভোট না দিলে ঐ উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না। একমাত্র এ কারণেই বাংগালী মুসলমান ভোটারদের অধিকাংশই শেখ সাহেবকে ভোট দেয়া প্রয়োজন মনে করে।

যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিও একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে বাংগালী মুসলমান জনগণ পাকিস্তান থেকে আলাদা হবার উদ্দেশ্যে শেখ সাহেবকে ভোট দেয়নি। নির্বাচন অভিযানের প্রতিটি জনসভায় তিনি জনগণকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না এবং যারা তার সম্পর্কে এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা জঘন্য মিথ্যা প্রচার করছে। শেখ সাহেবকে জয়যুক্ত করার জন্য যারা বিরামহীন চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে

www.icsbook.info

বিচ্ছিন্নতাবাদী লোক থাকলেও মুসলিম জনগণ এ উদ্দেশ্যে তাঁকে ভোট দেয়নি—একথা নিতান্ত সত্য।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

৭০-এর নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি

নির্বাচনের পর

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন সভায় আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ায় শেখ মুজিবকে ইয়াহইয়া খান পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে মন্তব্য করা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকলেন। ওদিকে ভুট্টো "এধার হাম,ওধার তুম" বলে এক দেশে দু'টো মেজরিটি পার্টির অদ্ভুত শ্লোগান তুললেন। বুঝা গেল যে, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের বাদশাহ হতে চান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আলাদা না হলে সে সুযোগ তার হয় না। তাই ইয়াহইয়া খানের সাথে যোগসাজশ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন।

সে সময় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বার বার জোর দাবী জানানো হলো যে,"ব্যালটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংখ্যাগুরু দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হোক"। কারণ, জামায়াত আশংকা করেছিলো যে, ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব হলে রাজনৈতিক সংকটের সাথে সাথে দেশে চরম বিশৃংখলা দেখা দেবে। সে সময়কার দৈনিক পত্রিকাগুলো জামায়াতের এ দাবীর ঐতিহাসিক সাক্ষী।

নির্বাচনের পর ১৯৭১-এর জানুয়ারীতে লাহোরে মাওলানা মওদূদীর সভাপতিত্বে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মাজলিশে শূরায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পযার্য়ক্রমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যেতে থাকে, তাহলে জামায়াত এর বিরোধিতা করবে না। এ বিষয়ে এখানকার প্রাদেশিক জামায়াতকে যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্য পূর্ণ ইখতিয়ার দেয়া হলো। এরপর এ সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক জামায়াতই নিতে থাকে।

(বাংগালী মুসলমান কোন পথে)

ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি

জেনারেল ইয়াহইয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হিসাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন বলে দাবী করা সত্ত্বেও নির্বাচনের পর তিনি মোটেই আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেননি।

www.icsbook.info

নির্বাচন সঠিকভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে গৌরবের সাথে ঘোষণা করা সত্ত্বেও নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে দেশকে তিনি চলতে দিলেন না। অযৌক্তিক কারণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানে বিলম্ব করতে থাকলেন।

৬-দফার দোহাই দিয়ে শেখ সাহেব নির্বাচনে জয়লাভ করেন। একথা জানা থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো সাহেব ৬-দফার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালালেন। ইয়াহইয়া খানের সাথে ভুট্টো সাহেবের বারবার সাক্ষাত ও ভুট্টো সাহেবের ক্ষমতায় অংশগ্রহণের দাবী থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হল যে, শেখ সাহেবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার উদ্দেশ্যেই ইয়াহহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে ষড়যন্ত্র চলছে।

সমস্ত রাজনৈতিক দলের দাবীতে অবশেষে ইয়াহইয়া খান ঢাকায় ৩রা মার্চ ১৯৭১-এ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন। একমাত্র ভুট্টো সাহেবই এ অধিবেশন মুলতবী করার দাবী জানালেন এবং মুলতবী না হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন সদস্যকে যেতে না দেবার হুমকি দিলেন। ইয়াহইয়া খান ভুট্টো সাহেবের দাবী মেনে নিয়ে শেখ সাহেবের মতামত ছাড়াই যখন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করলেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। ক্ষমতা হস্তান্তর না করার সন্দেহ তাদের মনে আরও ঘনিভূত হল। এ সুযোগে শেখ মুজিব বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। জনগণের বিক্ষোভকে দমন করতে অক্ষম হয়ে অবশেষে ইয়াহইয়া খান শেখ সাহেবের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এলেন। ৫ দিন পর্যন্ত আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে দু'পক্ষ থেকে দেশবাসীকে বার বার আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও হঠাৎ শেষ মুহূর্তে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইয়াহইয়া খান সামরিক শক্তি দিয়ে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা করলেন। কায়েদে আযম শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্র করেননি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারবার শক্তি প্রয়োগ করে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। জনগণ বিশেষ করে বাংগালী মুসলমানরা ইচ্ছা করে বিচ্ছিন্ন হয়নি। *(বাংগালী মুসলমান কোন পথে)*

টিক্কা খানের অভিযান

২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ব্যাপক হত্যা ও অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অসহযোগ আন্দোলনকে দমন করার প্রচেষ্টা করল। শেখ মুজীবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হল।

www.icsbook.info

কয়েক রাতের সামরিক অপারেশনে ঢাকা মহানগরী স্তব্ধ হয়ে গেল এবং রাজধানী তাদের পুনর্দখলে এল।

ঢাকার বাইরে সব জিলায়ই এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ জিলা ও মহকুমা শহরে অসহযোগ আন্দোলন জারি রাখলেন। ঢাকার বাইরে সেনাবাহিনী এবং পুলিশেও বিদ্রোহ দেখা দিল। যেসব শহরে অবাংগালী (বিহারী নামে) উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিল সেখানে বিহারীদেরকে হত্যা করে ঢাকার প্রতিশোধ নেয়া হলো।

এর প্রতিক্রিয়া সেনা বাহিনী ঐ সব এলাকায় যেয়ে বাংগালী হত্যা করল এবং সরকারী ক্ষমতা বহাল করল । এভাবে দু'দিকের আক্রমণে নিরপরাধ সাধারণ মানুষ নিহত ও অত্যাচারিত হতে থাকল। এক মাসের মধ্যে মোটামুটি দেশে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল বটে কিন্তু দেশটিকে নিশ্চিতভাবে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়া হল।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

আত্মঘাতী লড়াইয়ের পরিণাম

অদৃষ্টের কি কঠোর পরিহাস ! কতক লোকের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হয়ে গেল এবং চির দুশমন ভারত এক ভাইয়ের বন্ধু সেজে উভয়কেই সর্বনাশ করার সুযোগ পেল। দু'ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়ার সুযোগে উভয়ের দুশমন এক পক্ষের বন্ধু সেজে গোটা সম্পত্তিই আত্মসাত করার নজীর বিরল নয়। পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারত ঠিক সে ভূমিকাই গ্রহণ করার মহাসুযোগ পেয়েছে। দুশমন তার কাজ ঠিকই করেছে। পাকিস্তানকে ধংস করার এ মহাসুযোগ ভারত কেন ছেড়ে দেবে ? দোষ দুশমনের নয়। দুশমনকে সে সুযোগ দেয়াটাই প্রকৃত অন্যায়। আমাদের নির্বাচিত সব নেতাই এর জন্য কম বেশী দায়ী। এ আত্মঘাতী লড়াই চলাকালে সত্যিকারের প্রতিটি দেশপ্রেমিকের প্রাণ কেঁদেছে। কি মারাত্মক পরিস্থিতি তখন! সেনাবাহীনি দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য আপন দেশবাসীকেই মারল। আর বাগালী মুসলমানদের দুদর্শার অন্ত থাকল না। এক দল মুসলমান ভারতের গোলামীর ভয়ে সেনাবহিনীর সহযোগিতা করল। আর এক দল পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে মাতৃ ভূমিকে রক্ষার জন্য ভারতের মতো দুশমনের সাহায্য গ্রহণ করতে নিজেদেরকে বাধ্য মনে করল। হিন্দুদের তো এতে কোন মানসিক অসুবিধা ছিল না। কিন্তু দু'পক্ষেই বাংগালী মুসলমান দেশ প্রেমের তাগিদে যেসব কাজ করল তার পরিণাম কত করুণ।

www.icsbook.info

একদল ভারতের দেয়া বোমা দিয়ে নিজের দেশেরই পুল উড়ায়, আর একদল পুল রক্ষার জন্য প্রাণ হারায়। দু'পক্ষেই দেশপ্রেম। কুশাসন ও রাজনৈতিক ভ্রান্তি এমনিভাবেই দেশের জন্য আত্মত্যাগিদেরকে এমন আত্মঘাতী লড়াইয়ে লিপ্ত করে থাকে । একদলকে ভারতের দালাল, আর অন্য দলকে পাকিস্তানের দালাল বলে গালি দিলেই কি এদের দেশ প্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে ?

এর পরিণামে কত দেশ প্রেমিক উভয় পক্ষে খতম হয়ে গেল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গত ২৫ বছরে যা কিছু অগ্রগতি হয়েছিল তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। অরাজকতার সুযোগে সমাজ বিরোধী ও উচ্ছৃংখলদের হাতে কত নিরীহ নাগরিক জানমাল হারাল। যে শোষণ থেকে বাঁচার জন্য এত কিছু করা হল তার চেয়ে কত বেশী গুণ শোষণ তথাকথিত বন্ধু রাষ্ট্র জঘন্য ও ব্যাপকভাবে চালাচ্ছে ! সমস্ত সামরিক জিনিসপত্র তারা নিয়ে গেল। দেশে আজ খাবার নেই, কাপড় নেই, ঔষধ নেই, নিরাপত্তা নেই—আছে শুধু হাহাকার। জনগণ কি এ অবস্থার আশায় গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছিল ? বিজয়ী দল কি দেশকে এ অবস্থায় দেখতে চেয়েছিলেন ? নিশ্চয়ই নয়। কেউই ধ্বংসের নিয়তে কাজ করেনি। কিন্তু যে নিয়তেই করা হউক ভুলের পরিণাম ভোগ করতেই হয়। ভুলের ক্ষতি অনিবার্য । ব্যক্তিগত ভুলের ফল এত বড় ব্যাপক হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেসব ভ্রান্তি শাসকরা ও রাজনৈতিক নেতারা করে থাকেন তার পরিণাম যে কত বেদনাদায়ক ও মারাত্মক হয় বাংলার মুসলমান তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পনের ফলে বাংলাদেশ আপাতত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে এসেছে বটে—কিন্তু এ কলংক কি বাংগালী মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনে কালিমা লাগায়নি ? ইতিহাস তো একথা বলবে না যে, পাঞ্জাবী সেনবাহিনী আত্ম-সমর্পন করেছে। ইতিহাস জোর গলায় বলবে যে, এক লাখ মুসলিম সশস্ত্রবাহিনী হিন্দুস্তানের সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পন করেছে। এ কালিমা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধে যে গৌরব অর্জন করা হয়েছিল তা যেমন বাংগালী মুসলমানদের জন্যও সম্মানজনক ছিল তেমনি এ অপমানও তাদেরকে স্পর্শ করবে।

এমনিভাবে এ আত্মঘাতী লড়াই সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এবং বিশেষভাবে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এবং আর্থিক, নৈতিক ও মানবিক দিক দিয়ে বাংগালী মুসলমানদের জন্য যে কত মারাত্মক পরিণতি বয়ে এনেছে তা কদ্দিন ভোগ করতে হবে তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। *(বাংগালী মুসলমান কোন পথে)*

www.icsbook.info

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তারা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। শেখ মজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীনের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ছাত্র জীবনে আমি তাদের সমসাময়িক ছিলাম। পাকিস্তান আন্দোলনে তাদের ভূমিকা কত বলিষ্ঠ ছিল আমি এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মুসলিম জাতীয়তার পতাকাবাহী হিসেবেই তারা ভারতীয় কংগ্রেসের ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। গান্ধী ও নেহেরুর নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে অখন্ড ভারতের একটি মাত্র রাষ্ট্র কায়েমের কংগ্রেসি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলনে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

তারা ছিলেন তখন তরুণ ছাত্রনেতা। তারা মুসলিম লীগ নেতা শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভক্ত ও অনুরক্ত হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। গোটা বংগদেশ পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত না হওয়ায় এবং কংগ্রেসের দাবী মেনে নিয়ে বৃটিশ শাসকরা পশ্চিম বংগকে পূর্ববংগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতে শামিল করার ফলে পূর্ববংগে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্ব কায়েম হতে পারেনি।

অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগে দু'টো গ্রুপ ছিল। এক গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশেম এবং অপর গ্রুপের নেতা ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন ও জনাব নুরুল আমীন। বংগদেশ বিভক্ত না হলে হয়ত সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন। পশ্চিম বংগ আলাদা হবার ফলে পূর্ববংগে খাজা নাজিমুদ্দীন গ্রুপের হাতেই ক্ষমতা আসে।

শেখ মুজিব ও জনাব তাজউদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী গ্রুপের অন্তরভুক্ত ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতাশীন নাজিমুদ্দীন গ্রুপের প্রতি বিরূপ ছিলেন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব কোলকাতায়ই রয়ে গেলেন বলে তারা নেতৃত্বহীন অবস্থায় পড়ে গেলেন। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা

www.icsbook.info

আবদুল হামিদ খান ভাসানী এসে এ গ্রুপের নেতৃত্বের অভাব পূরণ করেন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে মুসলিম লীগের বিকল্প দল গঠন করেন। এভাবে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দ্বারাই সরকার বিরোধী দল গঠিত হয়। *(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)*

সরকারের ভ্রান্তনীতি

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবাহিনী সরকারী ও বিরোধী দলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ সরকার যদি ইসলামী আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন, মুসলিম জাতীয়তাকে শুধু শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার না করতেন, গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলতেন এবং অর্থনৈতিক ময়দানে ইনসাফের পরিচয় দিতেন তাহলে জাতিকে যে ধরনের সংকটের মুকাবিলা করতে হয়েছে তা সৃষ্টি হত না। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সকল ক্ষেত্রেই ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করে দেশকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেন।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ঃ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ পূর্ববংগের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে অস্বীকার করা এবং বাংলাভাষীদের উপর উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার ভ্রান্তনীতিই সর্বপ্রথম বিভেদের বীজ বপন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীরা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবী তুলেনি। তারা উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবী জানিয়েছিল।

এ দাবী জানাবার আগেই জনসংখ্যার বিচারে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা সরকারের কর্তব্য ছিল। অথচ দাবী জানাবার পর এটাকে 'প্রাদেশিকতা' বলে গালি দিয়ে সরকার সংগত কারণেই বাংলাভাষীদের আস্থা হারালেন। ভাষার দাবীটিকে সরকার এমন রাষ্ট্রবিরোধী মনে করলেন যে, গুলী করে ভাষা আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে চাইলেন। এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার জন্ম দেয়।

গণতন্ত্রের প্রশ্নে ঃ গণতান্ত্রিক পন্থায় পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও সরকার অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে টিকে থাকার ষড়যন্ত্র করলেন। শাসনতন্ত্র রচনায় গড়িমসি করে নির্বাচন বিলম্বিত করতে থাকলেন। ১৯৫৪ সালে পূর্বাঞ্চলে প্রাদেশিক নির্বাচনে সরকারী মুসলিম লীগ দলের ভরাডুবির পর কেন্দ্রে ষড়যন্ত্র আরও গভীর হয়। পরিণামে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারী হয়।

আইয়ুব খান গণতন্ত্র হত্যা করার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করলেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে জনগণকে সরকার গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত

www.icsbook.info

করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় এবং আসল ক্ষমতা আইয়ুব খানের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে, আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় এবং এর পরিণামে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে। আইয়ুব খানের দশ বছরের শাসনকালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব দ্রুত বেড়ে যায়।

অর্থনৈতিক ময়দানে ঃ শাসন-ক্ষমতায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এবং ক্ষমতাসীনদের স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার দরুন শিল্প ও বাণিজ্যনীতি প্রণয়নে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। মন্ত্রিসভায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে গণ-প্রতিনিধি গ্রহণ করার পরিবর্তে সুবিধাবাদীদেরকেই গ্রহণ করা হতো। এর ফলে অর্থনৈতিক ময়দানে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে অক্ষম হতেন। এভাবে গণতান্ত্রিক সরকারের অভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অর্থনৈতিক দিক থেকেও আস্থা হারাতে থাকে।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

ভুট্টো-ইয়াহইয়া ষড়যন্ত্র

উপরোক্ত কারণসমূহ স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি রচনা করলেও ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি এবং অবশেষে দমনমূলক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণই এ আন্দোলনের জন্ম দেয়। নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমি বার বার সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার দাবী জানিয়েছি। জেনারেল ইয়াহইয়া ভুট্টোর দাবী মেনে নিয়ে ১লা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পার্লামেন্ট অধিবেশন মুলতবী করায় চরম রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার মহল্লায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে অবস্থান করতেন। ছাত্র জীবনের বন্ধু হিসেবে তাঁর সাথে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল এর সুযোগে তার কাছ থেকে সংলাপের যেটুকু রিপোর্ট পেতাম, তাতে আমার এ ধারণাই হয়েছে যে, সংলাপ ব্যর্থ হবার জন্য ভুট্টোই প্রধানত দায়ী এবং ইয়াহইয়া খান দ্বিতীয় নম্বর দোষী।

নির্বাচনের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলে আওয়ামী লীগের হাতেই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব অর্পিত হতো। সে অবস্থায় পরিস্থিতির চিত্র ভিন্নরূপ

www.icsbook.info

হতো। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকায় রাজনৈতিক সমস্যা অবশ্যই দেখা দিত। কিন্তু ৭১-এ যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হলো তা থেকে অবশ্যই রক্ষা পাওয়া যেত। শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পার্লামেন্টের মাধ্যমেই হয়ত এক সময় দেশ বিভক্ত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ত। ঐ অবস্থায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তার প্রয়োজন হতো না।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

স্বাধীনতা আন্দোলনে কার কী ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলন

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতে আশ্রয় নিলেন। অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দলের অধিকাংশ নেতাও তাই করলেন। পাক সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে ও অন্যান্য স্থানে হিন্দু বস্তির উপরও আক্রমণ করায় তারাও দলে দলে ভারতে পাড়ি জমালেন। পাক সেনাবাহিনীর ভ্রান্ত নীতির ফলে দেশের গোটা হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তান বিরোধী হয়ে গেল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও অধিকাংশ সমাজতন্ত্রী দল পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো।

মেহেরপুর জেলার মফস্বলে (যে স্থানের বর্তমান নাম মুজিব নগর) আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কায়েম করার পর স্বাধীনতা আন্দোলন যে রূপ পরিগ্রহ করল, তা কোন বিদেশী সরকারের সাহায্য ছাড়া চলা সম্ভব ছিল না। তাই কোলকাতা থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত হয়।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

বামপন্থীদের ভূমিকা

রুশপন্থী হউক আর চীনপন্থী হউক কমিউনিষ্ট ও তথাকথিত বামপন্থীরা কোন দিনই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। গণতান্ত্রিক পন্থায় কমিউনিজম কোন দেশেই কায়েম হয়নি এবং কোন কমিউনিষ্ট দেশেই গণতন্ত্র নেই। তাই জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য গণতন্ত্রের এ দুশমনেরা সমাজতন্ত্রের শ্লোগানই দেয়। কমিউনিজমের নাম নিতে সাহস পায় না। বিশেষ করে মুসলমানদের নিকট কমিউনিষ্টরা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আজাদী আন্দোলনের সময় এরা ভারত বিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল এবং পাকিস্তানের পক্ষে ক্ষতিকর প্রতিটি ব্যাপারে এরা উৎসাহের সাথে কাজ করেছে। ইয়াহইয়া মুজিব আলোচনাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা উঠে পড়ে লেগেছিল। এরা ভয় পাচ্ছিল যে যদি জনগণের সরকার কায়েম হয় তাহলে এদের কোন সুযোগ থাকবে না। এরা নির্বাচনে কোন পাত্তাই পায়নি। এদের দু'টো দল তো নির্বাচন থেকে পালিয়েই যায়। মস্কোপন্থী ন্যাপ দু'একটি

www.icsbook.info

আসন ছাড়া সর্বত্র জামানত পর্যন্ত হারিয়েছে এবং ৮-৯টি দলের মধ্যে এরা সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছে। নিবার্চনে যারা জয় লাভ করল তারা যখন রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য চেষ্টা করছিল তখন গণতন্ত্রের এ দুশমনেরা তা ব্যর্থ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করল এর পরিণামে আজ যখন বাংলার মানুষ কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন তখন এরাই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অথচ এদের নিকট দেশের কোন সমস্যারই সমাধান নেই। বিদেশী কোন রাষ্ট্রের লেজুড় বানিয়ে দেশকে একনায়কত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা ছাড়া এদের আর কোন্ পথই বা জানা আছে ? রুশপন্থী ও চীনপন্থীর পরিচয় কি বিদেশী হবার প্রমাণ নয় ?

(বাংগালী মুসলমান কোন্ পথে)

ভারতের ভূমিকা

পাকিস্তানের চির দুশমন ভারতের সম্প্রসারণবাদী কংগ্রেস সরকার এ মহাসুযোগ গ্রহণ করল। প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠত করা হলো। মুক্তিযুদ্ধে অংগ্রহণকারীদেরকে গেরিলা ট্রেনিং দেয়া, তাদেরকে অস্ত্র ও গ্রেনেড দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা, রেডিও যোগে প্রবাসী সরকারের বক্তব্য বাংলাদেশের ভেতরে প্রচার করা ইত্যাদি সবই ভারত সরকারের সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতায় চলতে থাকল। রুশ সরকার এ বিষয়ে ভারতের সাথে এক সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং বহু দেশ সফর করে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন যোগানোর চেষ্টা করেন। নিসন্দেহে এসবই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ভারত সরকার তার স্বার্থেই এ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

ভারত বিরোধীদের পেরেশানী

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকে যারা ভারতীয় কংগ্রেসের আচরণ লক্ষ্য করে এসেছে, পাকিস্তান কায়েম হবার পর ভারতের নেহেরু সরকার হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর নিয়ে যে হিংস্র খেলা দেখিয়েছেন, মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমিকে পংগু করার জন্য যত রকম প্রচেষ্টা ভারতের পক্ষ থেকে হয়েছে, পূর্ব বাংলার সীমান্ত নিয়ে ভারত বার বার যে ধোঁকাবাজি করেছে, সর্বোপরি ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে গংগার পানি আটকে রেখে উত্তরবংগকে মরুভূমি বানাবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে এদেশের কোন সচেতন মুসলিমের পক্ষে ভারত সরকারকে এদেশের বন্ধু মনে করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

www.icsbook.info

যেসব রাজনৈতিক দল ও নেতা ভারতের আদিপত্যবাদী মনোভাবের দরুন আতংকগ্রস্ত ছিল, তারা মহাসংকটে পড়ে গেল। তারা সংগত করণেই আশংকা করল যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে ভারত একদিকে মুসলমানদের উপর "ভারত মাতাকে" বিভক্ত করার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে, কোলকাতার এক কালের অর্থনৈতিক পশ্চাদভূমি বাংলাদেশ অঞ্চলকে পুনরায় হাতের মুঠোয় আনার মহাসুযোগ গ্রহণ করছে। এ অবস্থায় ভারতের নেতৃত্বে ও সাহায্যে বাংলাদেশ কায়েম হলে ভারতের আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই হয়তো থাকবে না। বাংলাদেশের চারদিকে ভারতের যে অবস্থান তাতে এ আশংকাই স্বাভাবিক ছিল।

বিশেষ করে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমের উপর যে হিংস্র আচরণ অব্যাহতভাবে চলছিল, তাতে প্রত্যেক সচেতন মুসলিমের অন্তরেই পেরেশানী সৃষ্টি হলো। ভারতের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কারো পক্ষে আতংকগ্রস্ত না হয়ে উপায় ছিল না।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

ইসলামপন্থীদের সংকট

যারা মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিল এবং যারা চেয়েছিল যে, দেশে আল্লাহর আইন ও রাসূলের প্রদর্শিত সমাজ ব্যবস্থা চালু হোক, তারা আরও বড় সংকটের সম্মুখীন হলো। তারা তো স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্তের বিরোধী ছিল। তদুপরি স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনকারীদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী চেহারা তাদেরকে চরমভাবে আতংকিত করে তুলল। তারা মনে করল যে, ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হওয়া সত্ত্বেও যখন ইসলাম বিজয়ী হতে পারল না, তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা যদি ভারতের সাহায্যে কোন রাষ্ট্র কায়েম করতে পারে, তাহলে সেখানে ইসলামের বিজয় কী করে সম্ভব হবে?

ভারতে মুসলমানদের যে দুর্দশা যাচ্ছে, তাতে ভারতের সাহায্যে বাংলাদেশ কায়েম হলে এখানেও কোন্ দুরবস্থা নেমে আসে, সে আশংকাও তাদের মনে কম ছিল না।

স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের শ্লোগান তুলতেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা যদি তারা না হতেন এবং ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া যদি আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন, তাহলে ইসলামপন্থীদের পক্ষে ঐ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা খুবই স্বাভাবিক ও সহজ হতো।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীদের ভূমিকা

ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীরা উভয় সংকটে পড়ে গেল। যদিও তারা ইয়াহইয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমননীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন, তবু এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোন সাধ্য তাদের ছিল না। বিরোধিতা করতে হলে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো—যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।

তারা একদিকে দেখতে পেল যে, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহইয়া সরকারকে বিব্রত করার জন্য কোন গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোন পুল বা থানায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাকবাহিনী যেয়ে ঐ গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাতে কোন বাড়ীতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়ীতেই সেনাবাহিনীর হামলা হয়ে যায়। এভাবে জনগণ এক চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গোলো।

ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থীরা শান্তি কমিটি কায়েম করে সামরিক সরকার ও অসহায় জনগণের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করার চেষ্টা করলেন, যাতে জনগণকে রক্ষা করা যায় এবং সামরিক সরকারকে যুলুম করা থেকে যথাসাধ্য ফিরিয়ে রাখা যায়। শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে সামরিক শাসকদেরকে তাদের ভ্রান্তনীতি ও অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে ফিরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

একথা ঠিক যে, শান্তি কমিটিতে যারা ছিলেন, তাদের সবার চারিত্রিক মান এক ছিল না। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা সুযোগ মতো অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করেছে।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা

ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হলেও পাকিস্তানের কোন সরকারই ইসলামের ভিত্তিতে দেশকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেনি। জামায়াতে ইসলামী যেহেতু ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে একটি বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী অনুযায়ী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল, সেহেতু কোন সরকারই জামায়াতকে সুনজরে দেখেনি।

তদুপরি ইসলামেরই নীতি অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য জামায়াতে ইসলামী প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন তুলে নেবার পর

www.icsbook.info

আইয়ুবের তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলেছিল, তাতে জামায়াত কোন দলের পেছনে ছিল না।

এভাবেই জামায়াতে ইসলামী আইন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসনের জন্য নিষ্ঠার সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬২ থেকে ৬৯ পর্যন্ত আইয়ুব আমলের আট বছরের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কোন দলকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়নি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে জামায়াতকে বে-আইনি ঘোষণা করে ৯ মাস পর্যন্ত ৬০ জন নেতাকে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে সরকারের ঐ বে-আইনি ঘোষণাটি বাতিল হয়ে যায়।

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ইসলামী আদর্শ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সংগ্রামেরই গৌরবময় ইতিহাস। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতির ময়দানে যে ভূমিকা পালন করছে, তা সবার সামনেই আছে। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা পাকিস্তান আমলে যেমন স্বীকৃত ছিল, তেমনি বর্তমানেও সর্ব মহলে প্রশংসিত।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা

জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমানের ভূমিকা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে জামায়াত আপোসহীন। দুনিয়ার কোন স্বার্থে জামায়াত কখনও আদর্শ বা নীতি সামান্যও বিসর্জন দেয়নি। এটুকু মূলকথা যারা উপলব্ধি করে, তাদের পক্ষে ৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রথমত, আদর্শগত কারণেই জামায়াতের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহকগণের সহযোগী হওয়া সম্ভব ছিল না। যারা ইসলামকে একটি পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান বলে সচেতনভাবে বিশ্বাস করে, তারা এ দু'টো মতবাদকে তাদের ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনে করতে বাধ্য। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস দলের আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। জামায়াতে ইসলামী তখন থেকেই এ মতবাদের অসারতা বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে। আর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ধর্মহীনতা।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের অতীত আচরণ থেকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে এদেশের এবং মুসলিম জনগণের বন্ধু মনে করাও কঠিন ছিল। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সংগত কারণেই

www.icsbook.info

তাদের যে আধিপত্য সৃষ্টি হবে এর পরিণাম মংগলজনক হতে পারে না বলেই জামায়াতের প্রবল আশংকা ছিল।

তৃতীয়ত, জামায়াত একথা বিশ্বাস করত যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশী হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে গোটা পাকিস্তানে এ অঞ্চলের প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে। তাই জনগণের হাতে ক্ষমতা বহাল করার আন্দোলনের মাধ্যমেই জামায়াত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল।

চতুর্থত, জামায়াত বিশ্বাস করত যে, প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী দেশটির বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রভুক্ত থাকাই সুবিধাজনক। আলাদা হয়ে গেলে ভারত সরকারের আধিপত্য রোধ করা পূর্বাঞ্চলের একার পক্ষে বেশী কঠিন হবে। মুসলিম বিশ্ব থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় এ অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জামায়াতের নিকট উদ্বেগের বিষয় ছিল।

পঞ্চমত, পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পলিসির কারণে এ অঞ্চলে স্থানীয় পুঁজির বিকাশ আশানুরূপ হতে পারেনি। এ অবস্থায় এ দেশটি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খপ্পরে পড়লে আমরা অধিকতর শোষণ ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হব বলে জামায়াত আশংকা পোষণ করত।

জামায়াত একথা মনে করত যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতের সাথে সমমর্যাদায় লেনদেন সম্ভব হবে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব জিনিস এখানে আমদানী করা হতো, আলাদা হবার পর সে সব ভারত থেকে নিতে হবে। কিন্তু এর বদলে ভারত আমাদের জিনিস সমপরিমাণে নিতে পারবে না কারণ, রফতানীর ক্ষেত্রে ভারত আমাদের প্রতিযোগী দেশ হওয়ায় আমরা যা রফতানী করতে পারি, তা ভারতের প্রয়োজন নেই। ফলে আমরা অসম বাণিজ্যের সমস্যায় পড়ব এবং এদেশ কার্যত ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

ষষ্ঠত, জামায়াত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা এবং সকল বৈষম্যের অবসান করতে চেয়েছিল। জামায়াতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম হলে বে-ইনসাফী, যুলুম ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং অসহায় বঞ্চিত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আসবে।

এসব কারণে জামায়াতে ইসলামী তখন আলাদা হবার পক্ষে ছিল না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এদেশে যারাই জামায়াতের সাথে

www.icsbook.info

জড়িত ছিল, তারা বাস্তব সত্য হিসেবে বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে। আজ পর্যন্ত জামায়াতের লোকেরা এমন কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টার সাথে শরীক হয়নি যা বাংলাদেশের আনুগত্যের সামান্য বিরোধী বলেও বিবেচিত হতে পারে। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা বাস্তব কারণেই যোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তাঁরা কোন প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় পাবে না। তাই এদেশকে বাঁচাবার জন্য জীবন দেয়া ছাড়া তাদের কোন বিকল্প পথ নেই।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও দেশপ্রেম

জন্মভূমিরূপ আল্লাহর মহাদানের শুকরিয়াই হলো দেশপ্রেম

জন্মভূমি সত্যি প্রিয়। মায়ের সাথে এর তুলনা চলে। তাই জন্মভূমিকে মাতৃভূমিও বলা হয়। কিন্তু দু'কারণে আমি মাতৃভূমি বলি না। এক কারণ হল এ উপমহাদেশে মাতৃভূমিকে দেবী মনে করে পূজা করা হয়। দ্বিতীয় কারণ হল জন্মভূমি শুধু মাতৃভূমিই নয় পিতৃভূমিও। তাই জন্মভূমি বলাই বেশী সঠিক। তা ছাড়া কারো মায়ের জন্ম অন্য দেশে হলে তার নিজের জন্মের দেশটাকে মায়ের দেশ বলা সঠিক হয় না। মাতৃভাষা কথাটি অবশ্যই সঠিক। কারণ শিশু পয়লা মা থেকেই কথা শেখে এবং মায়ের সাথে বেশী সময় থাকার ফলে সে মায়ের মুখের ভাষা ও উচ্চারণই শেখে। এ ব্যাপারে পিতার অবদান কম বলেই পিতৃভাষা কখনও বলা হয় না। জন্মভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করার কারণ কয়েকটি ঃ-

১। মায়ের প্রতি ভালবাসা যেমন সহজাত তেমনি জন্মভূমির প্রতি ভালবাসাও মানুষের প্রকৃতিগত। শৈশব থেকেই শিশু যেমন মাকেই সবচেয়ে বেশী কাছে পায় এবং মায়ের স্নেহ মমতায় বড় হতে থাকে, তেমনি জন্মভূমির আলো-বাতাস, গাছ-পালা, পশু-পাখী, খাল-বিল-পুকুর, মাছ-তরকারী, মাঠের ফসল ইত্যাদির সাথে যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, তাতে জন্মভূমির সাথে দেহ মনের এক স্বাভাবিক ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। বিদেশে যারা যায়নি তারা এটা তেমন অনুভব করে না। মা মারা গেলে যেমন তার অভাবটা বুঝে আসে, তেমনি কিছুদিন বিদেশে থাকলে দেশের প্রতি ভালবাসার সূতায় টান পড়ে।

বিলাতে ৭৩ সাল থেকে ৬ বছর থাকাকালে মনে হতো, সে দেশের আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পালা সবই অপরিচিত। শীতকালে গরম ঘরে বসে কাঁচের জানালা দিয়ে বরফ পড়া দেখতে এত চমৎকার লাগতো যে, অনেক্ষণ চেয়ে থাকতে বাধ্য হতাম। সে দেশে শীতের মওসুমেই বৃষ্টি বেশী হয়। টিপটিপ বৃষ্টি আর না হয় বরফ পড়া চলতেই থাকে। আমার জন্মভূমির সকালের সুন্দর সূর্য সে দেশে কোথাও নেই। আমার দেশে শীতকালেও চিরসবুজ গাছ-পালার অভাব হয় না। সে দেশে গাছ ভর্তি পার্কে শীতকালে

www.icsbook.info

প্রথম যেয়ে আমার মনে হলো যে গাছগুলো শুধু মরাই নয়, পুড়ে কাল হয়ে গিয়েছে। এসব গাছের আবার পাতা গজাতে পারে বলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

২। ছোট বয়স থেকে যে ধরনের খাবার খেয়ে অভ্যাস হয়, সে খাবারের আকর্ষণ যে এত তীব্র তা দীর্ঘদিন বিদেশে না থাকলে টের পাওয়া যায় না। মাতৃভাষার মতোই মায়ের হাতের খাবার মানুষের সত্তার অংশে পরিণত হয়। মাঝে মাঝে যারা অল্প দিনের জন্য বিদেশে যায়, তাদের নিকট ভিন্ন ধরনের খাবার বৈচিত্রের স্বাদ দান করে—একথা ঠিক। কিন্তু দীর্ঘদিন জন্মভূমির অভ্যস্ত খাবার না পেলে যে কেমন খারাপ লাগে এর কোন অভিজ্ঞতা যাদের হয়নি, তারা এ সমস্যাটা বুঝতে পারে না। পুষ্টিকর, মজাদার ও দামী খাবার পেলে আবার দেশের খাবারের কথা মনে হবে কেন—এমন প্রশ্ন অনভিজ্ঞ লোকই করতে পারে।

আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো, বহু রকমের মজাদার খাবারের টেবিলে খাওয়ার সময় চিংড়ি ও পুঁই শাকের চচ্চড়ি, কেসকী মাছের ভোনা, কই মাছ-পালং শাকের চচ্চড়ি,টাকী মাছ ও কচি লাউ-এর সালুন, ভাজা পুটি মাছ ইত্যাদির কথা মনে উঠলে ওসব ভাল ভাল খাবারও মজা করে খেতে পারতাম না। খাওয়ার পর মনে হতো যে খাবার কর্তব্য পালন করলাম বটে, তৃপ্তি পেলাম না।

৩। মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাদটাও যে কত তৃপ্তিদায়ক সে অভিজ্ঞতাও দেশে থাকাকালে টের পাইনি। বিলাতে বাংলায় কথা বলার লোকের অভাব ছিল না। আমেরিকায় এক ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে ৭৩ সালের আগষ্টে যেতে হল। "মুসলিম ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন (M.S.A) নর্থ আমেরিকা"-এর উদ্যোগে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ দিনের সম্মেলনের পর নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলস পর্যন্ত এম, এস, -এর যত শাখা আছে সেখানে আমাকে এক সপ্তাহ সফর করাল। কোন দিন দু' জায়গায় কোনদিন তিন জায়গায় বক্তৃতা করতে হলো। এ ৭ দিনের মধ্যে বাংলায় কথা বলার কোন সুযোগ পেলাম না। লন্ডন ফিরে এসে আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে চাপলাম। কামরার এক কোণায় বসলাম। দূরে আর এক কোণায় একজন লোক এদেশী মনে হলো। কাছে যেয়ে বসলাম। ভদ্রলোক বই পড়ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম বাংলা বই। নিশ্চিত হলাম যে, বাংলায় কথা বলা যাবে। বার বার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম—যাতে কথা বলার সুযোগ পাই। দশ দিনের ভুখা। আমি যে তার দিকে তাকিয়ে আছি তা টের পেয়ে মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। আলাপ শুরু করলাম। তিনি কোন ষ্টেশনে নামবেন, আমি কোথা থেকে

www.icsbook.info

এলাম, কার বাড়ী কোথায়, লন্ডনে কে কোন জায়গায় থাকি ইত্যাদি আলাপ চলল। মনে হল, ফাঁপা পেট যেন হালকা হচ্ছে। ভদ্রলোকের বাড়ী কোলকাতা এবং তিনি হিন্দু। খুব আন্তরিকতার সাথে বাংলাদেশ নিয়েও বেশ কথা হলো।

বাংলাদেশের আবহাওয়া, খাবার জিনিস ও মাতৃভাষা নিয়ে এসব ঘটনা একথার প্রমাণ হিসেবেই পেশ করলাম যে, জন্মভূমির ভালবাসা সত্যিই সহজাত। এ ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোন কৃত্রিম কর্মসূচী রচনার দরকার হয় না। অবচেতনভাবেই এ ভালবাসা জন্মে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, রাজনৈতিক ভাষায় যাকে 'দেশপ্রেম' বলে তাও কি সহজাত ব্যাপার ? আমর হিসেবে দেশপ্রেমও নিঃসন্দেহে সহজাত। আমার জন্মভূমিতেই রাজনীতি চর্চা করা আমার জন্য স্বাভাবিক। অন্য দেশে আমার রাজনীতি করার সুযোগ কোথায় ? বিলাতে বাংলাদেশীরা যেটুকু রাজনীতি করে তা তাদের জন্মভূমিকে কেন্দ্র করেই। তাই এদেশের প্রধান সব ক'টি দলেরই শাখা সেখানে আছে।

মানুষ প্রধানত নৈতিক জীব। কিন্তু মানুষ সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবও। আমার রাজনীতি চর্চা নিয়ে লন্ডনে আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধুর সাথে আলাপ হয়। আমার রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনাকালে সেখানে তিনি ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ডক্টরেট করতে এসে এখানে সেট্‌ল করে গেছেন। নিজের বাড়ীতেই থাকেন। এটা ১৯৭৬ সালের কথা। সাড়ে চার বছর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের পর ৭৬-এর মে মাসে আমার স্ত্রী, ছোট ছেলে দু'টোকে নিয়ে লন্ডন পৌঁছেছে। বড় চার ছেলে আমার ছোট ভাই-এর কাছে মাঞ্চেষ্টারে আশ্রয় নিয়েছে।

ঐ বন্ধুটি আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, স্ত্রী পুত্র সবাই যখন চলে আসতে পেরেছে, তখন এখানে স্থায়ীভাবে বাস করার পরিকল্পনাই করুন। ওরা আপনার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে। আপনি সহজেই 'এসাইলাম' পেয়ে যাবেন। আমি বললাম, আমি তো আমার জন্মভূমি থেকে হিজরত করে আসিনি। দেশে পৌঁছতে পারলাম না বলে সুযোগের অপেক্ষায় বাধ্য হয়ে বিদেশে পড়ে আছি। তিনি বললেন, যারা বাংলাদেশ বানাল তাদের মধ্যে আমার জানা বেশ কিছু লোক দেশের অরাজকতা অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। আপনি উল্টা চিন্তা কেন করছেন, বুঝলাম না।

আমি বললাম, এরই নাম দেশপ্রেম। আমার আল্লাহ আমাকে যে দেশে পয়দা করলেন আমি সে দেশের মায়া ত্যাগ করতে পারি না। আমাকে ঐ

www.icsbook.info

দেশে পয়দা করে আল্লাহ ভুল করেছেন বলে আমি মনে করি না। আমি আর কোন দেশকে জন্মভূমির চেয়ে বেশী ভালবাসব কেমন করে?

তিনি বললেন, আমি দেশপ্রেমের কথা বলছি না। আপনার ও আপনার পরিবারের কল্যাণ চিন্তা করেই এ পরামর্শ দিয়েছি। আমি বললাম, আমি তো কল্যাণ মনে করতে পারছি না। আমার ছেলেরা বৃটিশ পাসপোর্ট পেয়ে গেলেও এ দেশকে জন্মভূমি বানাতে পারবে না। আমি তাদেরকে জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই না। আমার পক্ষে যদি দেশে যাবার সুযোগ নাও হয়, তবু ছেলেদেরকে তাদের জন্মভূমিতেই পাঠাতে চাই।

বিলাতেও স্থানীয় অস্থানীয় বিতর্ক থেকে কিছু কিছু সংঘর্ষও হচ্ছে। ইংরেজ জাতীয়তাবাদীরা এদেশের লোক বলে আমার ছেলেদেরকে স্বীকার করবে না। শুধু পাসপোর্ট সে মযার্দা দিতে সক্ষম নয়। জন্মভূমি আল্লাহর দান। এ মহাদানের শুকরিয়াই হলো দেশপ্রেম।

৭ বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে থাকার পর ১৯৭৮ সালের জুলাই মসের ১১ তারিখ আমার প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরে আসার পর যে কেমন আনন্দ লেগেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গৃহহীন লোক বাড়ী পেলে যেমন খুশী হয়, তার চাইতেও বেশী আনন্দিত হয়েছি। হারানো মহামূল্যবান সম্পদ ফিরে পাওয়ার আনন্দ যে কেমন, তা শুধু তার পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব—যার জীবনে বাস্তবে এমনটা ঘটে। মনে হয়েছে যে, আমি যেন আমার প্রকৃতিকে ফিরে পেলাম। মাছ শুকনায় পড়ে যাবার পর আবার পানিতে ফিরে গেলে সম্ভবত এমনি প্রশান্তি বোধ করে।

বিদেশে আটকা পড়ে থাকা কালে প্রতি বছরই হজ্বের মওসুমে মক্কা শরীফ পৌঁছার সৌভাগ্য হতো। বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলগণের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ও বাংলাদেশী জনগণের সাথে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য এটাই একমাত্র মাধ্যম ছিল।

দোয়া কবুল হবার স্থানসমূহে বিশেষ করে মহান আরাফাতের ময়দানে দয়াময়ের দরবারে কাতরভাবে দোয়া করার সময় আমি ধরণা দিয়ে বলতাম "হে আমার খালিক ও মালিক তুমি আমার জন্য যে দেশটিকে জন্মভূমি হিসাবে বাছাই করেছ, সে দেশে পৌঁছার পথে যত বাধা আছে তা মেহেরবানী করে দূর করে দাও"। আমার এ দোয়া যে কবুল হয়েছে তা দেশে ফিরে আসতে পারায় বুঝতে পারলাম।

বিদেশে থাকাকালে বহু ইসলামী বিশ্ব সম্মেলনে মেহমান হবার সুযোগ হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ট

www.icsbook.info

যোগাযোগের বিরল সৌভাগ্য হলো। আমার দেশে চলে আসার পর গত ১ বছরে বহু ইসলামী সম্মেলনের দাওয়াত পেয়েও বাংলাদেশী পাসপোর্টের অভাবে যেতে অক্ষম বলে জানাতে বাধ্য হয়েছি। আমার নাগরিকত্ব নিয়ে যে অহেতুক সমস্যা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, সে কথা জানার পর কয়েকটি সম্মেলনে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমার কাছে দাবী জানিয়েছে। এ সুযোগে ইসলামী আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ঐ সব সম্মেলনে মেহমান হিসেবে গিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে কোন কারণে আসলে আমার সাথে দেখা করে পয়লাই প্রশ্ন করেন যে, আপনাকে আমাদের দেশে আর দেখতে পাই না কেন ? জওয়াবে বলি, "বিদেশে থাকাকালে গিয়েছি। কিন্তু এখন সুযোগ পাচ্ছি না। ৭ বছর আমাকে দেশে আসতে দেয়নি, এখন আর যেতে দেয় না।" নাগরিকত্বের সমস্যার কথা জেনে এবং আমার ঐ জওয়াব শুনে তারা খুব হাসেন। আমি তাদেরকে বলি যে, দোয়া করুন, যাতে বাইরে যাবার বাধা দূর হয়ে যায়। তারা জানতে চান যে, আমার বিদেশে যাবার আগ্রহ আছে কি না। আমি হেসে বলি, "আল্লাহ পাক আমার জন্মভূমিতে তাঁর দ্বীনের কাজ করার যে সুযোগ দিয়েছেন, এতেই আমি তুষ্ট। বিদেশে যাবার সুযোগ পাচ্ছি না বলে আমার সামান্য আফসোসও নেই। তাছাড়া বিদেশে থাকাকালে দেশে আসবার ব্যবস্থা করার জন্যই দোয়া করেছি। মাঝে মাঝে আবার বিদেশে যাবার সুযোগ দেবার জন্য দোয়া করতে ভুলে গিয়েছিলাম"। এসব কথা শুনে সবাই বেশ কৌতুক বোধ করেন।

(দৈনিক সংগ্রাম, মার্চ, ১৯৯৩)

যারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শরীক হয়নি তারা কি স্বাধীনতা বিরোধী ছিল ?

১৯৭০-এর নির্বাচনের দীর্ঘ অভিযানে শেখ মুজিব প্রায় প্রতিটি নিবার্চনী জনসভায় জনগণকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, "আমরা ইসলাম বিরোধী নই" এবং "আমরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাই না"। জনগণ তাকে ভোট দিয়েছিলেন তাদের অধিকার আদায়ের জন্য। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন মেন্ডেট তিনি নেননি। নির্বাচনের পরও এ জাতীয় সুস্পষ্ট কোন ঘোষণা তিনি দেননি।

তাই ১৯৭১-এ যারা বাংলাদেশ আন্দোলনে শরীক হয়নি, তারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিল না। ভারতের অধীন হবার ভয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের খপ্পরে পড়ার আশংকাই তাদেরকে ঐ

www.icsbook.info

আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল। তারা তখনও অখন্ড পাকিস্তানের নাগরিকই ছিল। তারা রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজে লিপ্ত ছিল না বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করেনি। নিজ দেশের কল্যাণ চিন্তাই তাদেরকে এ ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কাজ করেছে। তাই আইনগতভাবে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

নৈতিক বিচারে ব্যক্তিগতভাবে যারা নরহত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও অন্যান্য অন্যায় করেছে, তারা অবশ্যই নরপশু। যাদের চরিত্র এ জাতের, তারা আজও ঐসব করে বেড়াচ্ছে। পাক সেনাবাহিনীর যারা এ জাতীয় কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তারাও নরপশুদেরই অন্তর্ভুক্ত। যাদের কোন ধর্মবোধ, নৈতিক চেতনা ও চরিত্রবল নেই, তারা এক পৃথক শ্রেণী। পাঞ্জাবী হোক আর বাংগালী হোক, এ জাতীয় লোকের আচরণ একই হয়।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও স্বাধীনতা বিরোধী হওয়া এক কথা নয়

অবিভক্ত ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের আন্দোলনে কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের মতবিরোধকে কতক নেতা স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রচার করত। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাবী করতো এবং গোটা ভারতকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ জানত যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের গোলামী থেকে মুক্তি পেয়েও মুসলমানদেরকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধীন থাকতে হবে। তাই ঐ স্বাধীনতা দ্বারা মুসলমানদের মুক্তি আসবে না।তাই মুসলিম লীগ পৃথকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চালোনো এবং ভারত বিভাগ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পাকিস্তান দাবী করল। ফলে মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন একই সংগে ইংরেজ ও কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেল।

কংগ্রেস নেতারা তারস্বরে মুসলিম লীগ নেতাদেরকে ইংরেজের দালাল ও দেশের স্বাধীনতার দুশমন বলে গালি দিতে লাগল। কংগ্রেসের পরিকল্পিত স্বাধীনতাকে স্বীকার না করায় মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার বিরোধী বলাটা রাজনৈতিক গালি হতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য হতে পারে না।

ঠিক তেমনি যে পরিস্থিতিতে ভারতের আশ্রয়ে বাংলাদেশ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল, সে পরিবেশে যারা ঐ আন্দোলনকে সত্যিকার স্বাধীনতা

www.icsbook.info

আন্দোলন বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাদেরকে স্বাধীনতার দুশমন বলে গালি দেয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যতই প্রয়োজনীয় মনে করা হোক, বাস্তব সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

বিশেষ করে স্বাধীনতার নামে প্রদত্ত শ্লোগানগুলোর ধরন দেখে ইসলামপন্থীরা ধারণা করতে বাধ্য হয় যে, যারা স্বাধীন বাংলাদেশ বানাতে চায়, তারা এদেশে ইসলামকে টিকতে দেবে না, এমনকি মুসলিম জাতীয়তাবোধ নিয়েও বাঁচতে দেবে না। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বাংগালী জাতীয়তাবাদের (মুসলিম জাতীয়তার বিকল্প) এমন তুফান প্রবাহিত হলো যে, মুসলিম চেতনাবোধসম্পন্ন সবাই আতংকিত হতে বাধ্য হলো। এমতাবস্থায় যারা ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারল না, তাদেরকে দেশের দুশমন মনে করা একমাত্র রাজনৈতিক হিংসারই পরিচায়ক। ঐ স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ভারতের অধীন হবার আশংকা যারা করেছিল, তাদেরকে দেশপ্রেমিক মনে না করা অত্যন্ত অযৌক্তিক।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক মরহুম আবুল মনসুর আহমদ দৈনিক ইত্তেফাক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বলিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ এত কিছু লিখে গেছেন, যা অন্য কেউ লিখলে হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে শাস্তি পেতে হতো। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে পরাজিত পক্ষকে বিজয়ী পক্ষ দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করার চিরাচরিত প্রথা সাময়িকভাবে গুরুত্ব পেলেও স্থায়ীভাবে এ ধরনের অপবাদ টিকে থাকতে পারে না।

আজ একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবিদার কিছু নেতা ও দলকে দেশের জনগণ বর্তমানে ভারতের দালাল বলে সন্দেহ করলেও বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেনি, সে সব দল ও নেতাদের সম্পর্কে বর্তমানে এমন সন্দেহ কেই প্রকাশ করে না যে, এরা অন্য কোন দেশের সহায়তায় এদেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিতে চায়।

তারা গোটা পাকিস্তানকে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে রক্ষা করা উচিত বলে বিবেচনা করেছিল। তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। বাংলাদেশ পৃথক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবার পর তারা নিজের জন্মভূমি ছেড়ে চলে যায়নি। যদি বর্তমান পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে ভৌগোলিক দিক দিয়ে ঘনিষ্ঠ হতো, তাহলেও না হয় এ সন্দেহ করার সম্ভাবনা ছিল যে, তারা হয়তো আবার বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। তাহলে তাদের ব্যাপারে আর কোন্ প্রকার সন্দেহের কারণ থাকতে পারে? বাংলাদেশকে স্বাধীন রাখা এবং এ দেশকে রক্ষা করার লড়াই করার গরজ

www.icsbook.info

তাদেরই বেশী থাকার কথা। বাংলাদেশের নিরাপত্তার আশংকা একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই হতে পারে। তাই যারা ভারতকে অকৃত্রিম বন্ধু মনে করে, তারাই হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। কিন্তু যারা ভারতের প্রতি অবিশ্বাসের দরুন ৭১ সালে বাংলাদেশকে ভারতের সহায়তায় পৃথক রাষ্ট্র বানাবার পক্ষে ছিল না, তারাই ভারতের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জীবন দেবে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হওয়ার মানসিক, আদর্শিক ও ঈমানী প্রেরণা তাদেরই, যারা এদেশকে একটি মুসলিম প্রধান দেশ ও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়।

পশ্চিমবংগের বাংগালীদের সাথে ভাষার ভিত্তিতে যারা বাংগালী জাতিত্বের ঐক্যে বিশ্বাসী, তাদের দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকে থাকার আশা কতটা করা যায় জানি না। কিন্তু একমাত্র মুসলিম জাতীয়তাবোধই যে বাংলাদেশের পৃথক সত্তাকে রক্ষা করতে পারে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মুসলিম জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিতদের হাতেই বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা সবচেয়ে বেশী নিরাপদ।

শেরে বাংলার উদাহরণ ঃ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবই পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তি ছিল। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক সে ঐতিহাসিক দলিলের প্রস্তাবক ছিলেন। অথচ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে এক ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরের সাথে হাত মিলান এবং পাকিস্তান ইস্যুতে ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন হয়, তাতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মনোনিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করেন। পাকিস্তান হয়ে যাবার পর তিনি কোলকাতায় নিজের বাড়ীতে সসম্মানে থাকতে পারতেন। তিনি ইচ্ছে করলে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতো ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হতে পারতেন। কিন্তু যখন পাকিস্তান হয়েই গেল, তখন তাঁর মতো নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক কিছুতেই নিজের জন্মভূমিতে না এসে পারেননি। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত থাকা সত্তেও এদেশের জনগণ শেরে বাংলাকে পাকিস্তানের বিরোধী মনে করেনি। তাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তাঁরই নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের উপর এত বিরাট বিজয় লাভ করে। অবশ্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে গালি দিয়ে তাঁর প্রাদেশিক সরকার ভেংগে দেয়। আবার কেন্দ্রীয় সরকারই তাঁকে প্রথমে গোটা পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বানায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরও নিযুক্ত করে। এভাবেই তাঁর মতো দেশপ্রেমিককেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রদ্রোহী বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

www.icsbook.info

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর উদাহরণ ঃ জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম বড় নেতা ছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে যখন বংগদেশ পূর্ববংগ ও পশ্চিমবংগে বিভক্ত হয়, তখন গোটা বংগদেশ ও আসামকে মিলিয়ে "গ্রেটার বেংগল" গঠন করার উদ্দেশ্যে তিনি শরৎ বসুর সাথে মিলে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হলে পূর্ববংগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতো না। তিনি পশ্চিমবংগের লোক। পশ্চিমবংগের বিপুল সংখ্যক মুসলমানের স্বার্থরক্ষা এবং কোলকাতা মহানগরীকে এককভাবে হিন্দুদের হাতে তুলে না দিয়ে বাংলা ও আসামের মুসলমানদের প্রাধান্য রক্ষাই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি পূর্ববংগে আসেন, তখন তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে পাকিস্তানের দুশমন বলে ঘোষণা করা হয় এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। অবশ্য তিনিই পরে পাকিস্তানের উযিরে আযম হবারও সুযোগ লাভ করেন। বলিষ্ঠ ও যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার প্রয়োজনে দুর্বল নেতারা এ ধরনের রাজনৈতিক গালির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের গালি দ্বারা কোন দেশপ্রেমিক জননেতার জনপ্রিয়তা খতম করা সম্ভব হয়নি।

তাই ৭১-এর ভূমিকাকে ভিত্তি করে যেসব নেতা ও দলকে "স্বাধীনতার দুশমন"ও "বাংলাদেশের শত্রু" বলে গালি দিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যতই বিষোদগার করা হোক, তাদের দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও জনপ্রিয়তা ম্লান করা সম্ভব হবে না। *(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)*

www.icsbook.info

স্বাধীন বাংলাদেশে ৭২ সালের সমস্যা ও সমাধান

বর্তমান সমস্যার কারণ

অদ্ভুত জনপ্রিয়তা, একদলীয় একচ্ছত্র ক্ষমতা ও বিশ্বের নিরংকুশ সমর্থন এবং আমেরিকা, রাশিয়া ও ভারতের ব্যাপক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা দূরের কথা মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা এবং কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতেও ব্যর্থ হলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা হিসেবে নতুন দেশ গড়ার সমস্যা অনেক—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দিন দিন অবস্থা ক্রমে উন্নতির দিকে কেন যাচ্ছে না ? দেশের সম্পদ বিদেশে ব্যাপকহারে চলে যাচ্ছে। চাউল, কাপড়, মাছ, খাবার তেল, কেরোসিন, ঔষধ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কেবল বেড়েই চলল। অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলায় দেশে নিরাপত্তা বোধ খতম হয়ে গেল।

আমাদের বাপ-ভাই-মা-বোন ও বিবি-বাচ্চা-ছোট বড় সবাই এসবের ভুক্তভোগী। সরকার ও জনগণ সবাই চান যে, অবস্থার উন্নতি হোক। কিন্তু শুধু চাইলেই কি তা হয়ে যাবে ? আর এসব সমস্যা নিয়ে যারা হৈ চৈ করে তাদেরকে দালাল বলে গালি দিলেই এর সমাধান হবে কি ?

সত্যিই যদি আমরা এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি চাই তাহলে বর্তমান অবস্থার মূল কারণ তালাশ করতে হবে। রোগের কারণ না জানলে সুচিকিৎসা অসম্ভব। যারা এখন দেশ শাসন করছেন তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ সবরকম লোকই হয়তো আছেন। কিন্তু আগে থেকে তাদের আন্দোলনে কর্মীদেরকে শৃংখলা শিক্ষা দেবার পরিবর্তে উচ্ছৃংখলতা, বেআদবি, অশালীনতা, এমনকি গুন্ডামী করতে পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে দেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা যেতে পারে, শান্তি প্রিয় নাগরিকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করা যেতে পারে, জোর করে ক্ষমতা দখলও সম্ভব, নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করাও সহজ—কিন্তু এ ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরী লোকদের দ্বারা দেশ শাসন ও জনসেবা কিছুতেই সম্ভব নয়।

যে কর্মীবাহিনীকে এক সময় বিরোধী দলের সভায় লাঠি ও ইট পাটকেল দিয়ে আক্রমণের প্রেরণা যোগান হয়েছে আজ তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। সুতরাং সে হারেই অরাজকতা বাড়ছে। এক পক্ষ এ পথে গেলে অপর পক্ষও বাধ্য হয়েই সে পথে যাবে। তা ছাড়া 'বন্দুকের নল থেকে বিপ্লব' এর নীতিতে

www.icsbook.info

যারা বিশ্বাসী এবং 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' যাদের কর্মসূচী তারা এ ধরনের পরিবেশেই এগিয়ে আসার সুযোগ পায়। তাই বর্তমান অরাজক পরিবেশের পরিবর্তন সহজে হবে না।

(বাংগালী মুসলমান কোন্ পথে)

সমাধানের উপায়

যদি জনগণ শান্তি চায় তাহলে বেসরকারীভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। আইন ও শৃংখলার দায়িত্বশীলগণ একমাত্র শান্তি রক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করবেন। সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সবাইকে অস্ত্রের ভাষায় রাজনীতি করা বন্ধ করতে হবে। এমন রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে যাদের নেতৃবৃন্দ ভদ্র ও শালীন ভাষায় সমালোচনা করতে সক্ষম। গালিগালাজের পরিবর্তে যারা যুক্তির অস্ত্রে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করবে। এমন কর্মীদল গঠন করতে হবে যারা গুন্ডামীকে ঘৃণা করে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখে, শৃংখলাকে ভালবাসে এবং আইনের শাসন কায়েমের জন্য বদ্ধপরিকর। বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো যদি এসব নীতি পালন করতে রাজি না হয় তাহলে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদেরকে দেশ ও জনগণের কল্যাণের খাতিরে শত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে হলেও এ ধরনের দল গঠন করতে হবে। আর না হলে মারামারি কাটাকাটি করে ধ্বংস হতে হবে।

এ পথে দেশকে ধাবিত করতে সময় লাগবে নিশ্চয়ই। যারা এ নীতিতে চলবেন তাদের বহু বিপদ পোহাতে হবে। কিন্তু জনগণ শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সাথেই মিলবে। জনগণ কখনো অরাজক পরিবেশ ভালবাসে না। দুনিয়ায় কোন দেশই উচ্ছৃংখলতার মাধ্যমে উন্নতি করেনি। তাই শৃংখলা বা ধ্বংস এ দু'পথের একটা জনগণ বেছে নেবেই।

(বাংগালী মুসলমান কোন্ পথে)

বাংগালী মুসলমানদের করণীয়

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংগালী মুসলমানদের জন্য তিনটি পথ রয়েছে ঃ

১। ভারতের সাহায্যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও স্বাভাবিকভাবে ভারতের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রায় চারদিক থেকে ভারতের মত একটা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাকে ভাগ্যের দান বলে মেনে নিয়ে ভারতের একটি উপরাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকা।

www.icsbook.info

কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে এবং আযাদী পাগল মনস্তত্ত্বের দরুন বাংগালী মুসলমান এ অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নিজেদের পূর্ণ অধিকার হাসিলের জন্য যারা মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তারা ভারতীয় প্রাধান্যকে মেনে নিতে পারে না।

২। রাশিয়া বা চীনের সহায়তায় ভারত থেকে মুক্ত একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

এ পথ বিভিন্ন কারণে বাংগালী মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য তো নয়ই বরং এ পথে এ অঞ্চলে আর একটি ভিয়েতনামই সৃষ্টি হবে মাত্র। ভারত কেরালা এবং পশ্চিম বংগে যেমন কমিউনিষ্ট শাসন বরদাস্ত করেনি এখানেও তা করবে না। এটা ভারতের অস্তিত্বের পক্ষেও বিপদজনক বলে তারা মনে করবে। সুতরাং এ পথ চির অশান্তির পথ এবং বৃহৎশক্তিসমূহের আখড়ায় পরিণত হবার পথ। রাশিয়া বা চীন যদি ভারতের মর্জির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে তাহলে আমেরিকাও ভারতকে সাহায্য করবে। সুতরাং বাংগালী মুসলমানদের এ এলাকাকে অবিরাম যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হতে দেয়া আত্মহত্যারই শামিল।

৩। বাংগালী মুসলমানদের জন্য একমাত্র পথ হল ভারতের প্রভাব মুক্ত অকমিউনিষ্ট সরকার গঠন করে সত্যিকার আযাদ রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করা। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে যেটুকু আযাদী ছিল তার চেয়েও বেশী রাজনৈতিক স্বাধীনতা হাসিল করতে না পারলে এতসব খুইয়ে কি লাভ হল ? দেশের মানুষের জন্য ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা না করতে পারলে আযাদীর কি মূল্য রইল ? বাংগালী মুসলমান যদি নিজস্ব মুসলিম সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টি হারিয়ে হিন্দুদের সাথে এক হয়ে যায় তাহলে ভারতের গোলামী আরও স্থায়ী হবে।

কিন্তু এসব কিভাবে সম্ভব ? আজ এটাই বাংগালী মুসলমানদের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যারা দেশের ভিতরে বর্তমান অরাজক ও সমস্যা জর্জরিত পরিবেশে জীবন কাটাচ্ছে তাদের আজ দিশেহারা অবস্থা। আমরা যারা বিদেশে আছি—ভিতরের আগুন এসে বাইরেও আমাদেরকে অস্থির করে তুলেছে। প্রিয় জন্মভূমিকে কিভাবে স্থিতিশীল করা যায়, দেশবাসী কিভাবে নিরাপত্তাবোধ নিয়ে বাঁচতে পারে এবং জনগণ কি প্রকারে স্থায়ী শান্তি ভোগ করতে পারে এ চিন্তা প্রতিটি দেশপ্রেমিককে—দেশের ভিতরে ও বাইরে অস্থির করে তুলেছে। দেশ ও দেশবাসীর জন্য যাদের প্রাণ কাঁদে, অনাগত ভবিষ্যতে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির যারা স্বপ্ন দেখে এবং সত্যিকারের আযাদীর জন্য যাদের পিপাসা রয়েছে তাদের জন্য কি কোন পথই নেই ? ভারতের গোলামী থেকে কি মুক্তির কোন উপায়ই নেই ?

(বাংগালী মুসলমান কোন্ পথে)

www.icsbook.info

মুক্তির একই পথ

মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানসিক মুক্তি চেতনার উপর। মন যদি গোলাম না হয় তা হলে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সকল প্রকার গোলামী থেকে মুক্তি সম্ভব। বাংগালী মুসলমানকে আজ মনের গভীরে নেমে খুঁজতে হবে ঃ মুক্তির উৎস কোথায় ?

শুধু বাংগালী হওয়ার মনোভাব নিয়ে আমরা কোনক্রমেই হিন্দুর প্রভাব থেকে মুক্তি পাব না। আর হিন্দু থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে চিন্তা করা ছাড়া ভারতের গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। বাংগালী মুসলমান হিসেবে আমাদের পৃথক সত্তাকে জাগ্রত না করে আমরা মুক্তির পথে পা-ই দিতে পারব না।

ভারত আমাদের মনে এ চিন্তা ঢুকাবার চেষ্টা করছে যে, পাকিস্তান হওয়াটাই ভুল হয়েছে। কারণ এ চিন্তা না ঢুকালে গোলামীর জিঞ্জির মযবুত হতে পারে না এবং 'হিন্দু মুসলমান এক জাতি' একথা মুসলমানরা স্বীকার না করলে ভারতের প্রভাব স্থায়ীও হতে পারে না।

কিন্তু বাংগালী মুসলমানরা একথা ভাল করে জানে যে পাকিস্তান না হলে অবিভক্ত বাংলা ভারতের একটি প্রদেশ হতো মাত্র। আজ বাংগালী মুসলমান প্রধান একটি পৃথক দেশ কায়েম হবার কি কোন সুযোগ হতো যদি পাকিস্তান না হতো ? সুতরাং দূর প্রাচ্যের এলাকায় সাত কোটি মুসলমানের একটি নিজস্ব দেশ গঠনে পাকিস্তানের জন্ম অপরিহার্য ছিল। অবশ্য এখনো সে নিজস্ব দেশটি হাসিল হয়নি—হওয়ার পথে এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে মাত্র।

একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, হিন্দু ও মুসলমান যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথক দু'টো জাতি তা পাক-ভারতের ইতিহাসের এক অমোঘ সত্য। পৌত্তলিক ও তওহীদবাদী কোন দিন এক হতে পারে না। উপমহাদেশে ১২শ বছরের বেশী হল হিন্দু-মুসলমান বাস করছে। জাতি হিসেবে উভয়ই এত আত্মসচেতন যে, কোন দিন এরা এক হতে পারেনি। ব্যক্তি হিসেবে কোন হিন্দু মুসলমান হয়ে গেলেও বা কোন মুসলমান হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলেও বা হিন্দু কৃষ্টি গ্রহণ করলেও জাতি হিসেবে দু'টো পৃথক সত্তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভারতীয় সভ্যতার নামে 'শকহুন দল—পাঠান-মোগল'কে এক দেহে লীন করার যত মিষ্টি বুলিই আওড়ানো হোক, বাদশাহ আকবরের মতো দীনে এলাহী কায়েম করে এ দু'জাতিকে এক করার যত চেষ্টাই করা হোক—এ

www.icsbook.info

দু'টো জাতির মানসিক চেতনা ও কৃষ্টির মধ্যে এত মৌলিক তফাত রয়েছে যে, তাদেরকে এক জাতি বানাবার কোন উপায়ই নেই।

মুসলিম জাতীয়তাবোধ যেমন একদিন ইংরেজ ও কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত বিভাগ সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিল আজও আবার ঐ চেতনাবোধই সত্যিকারের আযাদীর পথে এগিয়ে নেবে। যারা এটাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে তারা ভারতের মানসিক গোলাম। এটা সাম্প্রদায়িকতা নয় সচেতন জাতীয়তা। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এটা নয়—ভারতের মানসিক গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতারই এটা উদাত্ত আহবান। স্বাধীন হয়ে বাঁচতে হলে এ ডাকে সাড়া দিতেই হবে।

(বাংগালী মুসলমান কোন্ পথে)

জনগণের দাবী

বর্তমান দুরবস্থায় জনগণ কিছুতেই উদাসিন থাকতে পারে না। বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে ঘরে বসে থাকা এক মারাত্মক নৈতিক অন্যায়। তাই আশাহত দেশবাসীর উচিত তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাবী জানাতে হবে ঃ

১। আমরা সত্যিকার স্বাধীনতা চাই। আযাদীর সুফল আমাদের ঘরে ঘরে পৌছাতে হবে। প্রতিটি বাংগালী মুসলিম পরিবারকে খেয়ে পরে ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে দিতে হবে। ক্ষমতার বলে, অস্ত্রের বলে শাসক সেজে রাতা-রাতি বড়লোক হবার নীতি বর্জন করেত হবে।

২। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুন্ডামী, অস্ত্র প্রয়োগ ও গায়ের জোরে সরকারী ক্ষমতা দখলের চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আইনের শাসন চালু করতে হবে।

৩। রাজনৈতিক মতবিরোধ গণতন্ত্রের পরিচায়ক। তাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিরোধী দলকে দালাল বলে গালি দেবার ঘৃণ্য অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। গালাগালির রাজনীতি দেশকে ধ্বংস করতে পারে, গড়তে পারে না।

৪। ভারতের গোলামী থেকে মুক্তির সংগ্রাম চলবেই চলবে।

৫। ভারতের প্রভাব মুক্ত গণতান্ত্রিক সরকারই আমাদের একমাত্র কাম্য। অন্য কোন সরকার জনগণের কল্যাণ করতে পারে না।

(বাংগালী মুসলমান কোন্ পথে)

www.icsbook.info

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা কী ছিল ?

জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা কী ছিল ?

যেকোন সমস্যারই একাধিক বিশ্লেষণ হতে পারে। এবং সমাধানের ব্যাপারেও আন্তরিকতার সাথেই মতপার্থক্য থাকতে পারে। জামায়াতে ইসলামী তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছে, তা যদি কেউ নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করে, তাহলে একথা উপলব্ধি করা সহজ হবে যে, জামায়াত কেন বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করা প্রয়োজন মনে করেনি। এ বিষয়ে জামায়াতের সাথে কেউ একমত হোক বা না হোক, জামায়াতের দৃষ্টিভংগীকে ভালভাবে বুঝতে পারবে।

জামায়াত কখনও সুবিধাবাদের রাজনীতি করে না এবং কোন প্রকারে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিও জামায়াত করে না। ইসলামী জীবন বিধানকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই জামায়াত কাজ করে যাচ্ছে।

জামায়াত স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছে না বলে দেশকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলবার যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী সৃষ্টি না করে ক্ষমতা গ্রহণে মোটেই আগ্রহী নয়। তাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জামায়াতের বিরুদ্ধে ৭১-এর ভূমিকা সম্পর্কে যত অপপ্রচারই চালান হোক, তাতে কারো কোন উপকার হবে না। যারা ধীরচিত্তে জামায়াতের দৃষ্টিভংগিকে বুঝতে চান, তাদের জন্যই এদেশের সমস্যা সম্পর্কে নিম্নরূপ বিশ্লেষণ পেশ করা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান কায়েম হয়, তখন বর্তমান বাংলাদেশের এলাকা সবচাইতে অনুন্নত ছিল। যেমন ঃ

১। সশস্ত্র বাহিনীতে এ অঞ্চলের লোক ছিল না বললেই চলে।

২। পুলিশ বাহিনীতেও খুব কম লোকই ছিল। তাই ভারত থেকে যেসব মুসলমান পুলিশ অপশন দিয়ে এসেছিল, তারাই প্রথম দিকে থানাগুলো সামলিয়েছে।

৩। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মাত্র গুটিকয়েক ছিলেন।

৪। ২/৩টা কাপড়ের কারখানা ছাড়া শিল্প কিছুই ছিল না। এ এলাকার পাটেই কোলকাতার পাটকল চলতো। এখানে পাটের কারখানা ছিল না।

www.icsbook.info

৫। বিদেশের সাথে বাণিজ্য করার যোগ্য একটা সামুদ্রিক বন্দরও এখানে ছিল না।

৬। কোন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল না।

৭। ঢাকা শহর একটা জেলা শহর ছিল মাত্র। প্রাদেশিক রাজধানীর অফিস ও কর্মচারীদের জন্য বাঁশের কলোনী তৈরী করতে হয়েছে। আর ইডেন মহিলা কলেজ বিল্ডিংকেই সেক্রেটারীয়েট (সচিবালয়) বানাতে হয়েছে। *(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)*

বংগভংগ আন্দোলন

এ দুরবস্থার প্রধান কারণ এটাই ছিল যে, পূর্ব বাংলাকে বৃটিশ আমলে কোলকাতার পশ্চাদভূমি (হিন্টারল্যান্ড) বানিয়ে রাখা হয়েছিল। এখানকার চাউল, মাছ, মুরগী, ডিম, দুধ, পাট ও যাবতীয় কাঁচামাল কোলকাতার প্রয়োজন পূরণ করত। আর কোলকাতার কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য এখানকার বাজারে বিক্রয় হতো। তদুপরি শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি অমুসলিমদেরই কুক্ষিগত ছিল।

ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানরা নিজেদের এলাকার ও এর অধিবাসীদের উন্নয়নের প্রয়োজনে ঢাকাকে রাজধানী করে একটি আলাদা প্রদেশ করার আন্দোলন চালায়, যাতে কোলকাতার শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে এ এলাকাটি উন্নতি করতে পারে। এ দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করে ইংরেজ সরকার ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববংগ ও আসাম এলাকা নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে। ১৯০৬ সালে এ নতুন প্রাদেশিক রাজধানীতে নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এ সম্মেলনে গোটা ভারতবর্ষের বড় বড় মুসলিম নেতা যোগদান করায় ঢাকার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। *(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)*

বংগভংগ বাতিল আন্দোলন

এ নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রভাব ও উন্নতির যে বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিল, তাতে কোলকাতার কায়েমী স্বার্থে তীব্র আঘাত লাগল। অমুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য পেশাজীবীগণ "বাংলা-মায়ের দ্বিখন্ডিত" হওয়ার বিরুদ্ধে চরম মায়াকান্না জুড়ে দিলেন। অখন্ড মায়ের দরদে তারা গোটা ভারতে তোলপাড় সৃষ্টি করলেন।

www.icsbook.info

এ আন্দোলনে ব্যারিস্টার আবদুর রাসুলদের মতো কিছু সংখ্যক মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবীও শরীক হয়ে অখন্ড বাংলার দোহাই দিয়ে বংগভংগের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েন। এ আন্দোলনের পরিণামে ১৯১১ সালে বংগভংগ রহিত হয়ে পূর্ব বাংলা আবার কোলকাতার লেজুড়ে পরিণত হয়। যদি বংগভংগ রহিত না হতো, তাহলে ১৯৪৭ সালে ঢাকাকে একটি উন্নত প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে এবং চট্টগ্রামকে পোর্ট হিসেবে রেডী পাওয়া যেত। তাছাড়া শিক্ষা ও চাকুরিতে মুসলমানরা এগিয়ে যাবার সুযোগ এবং এ এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে উঠত।

মজার ব্যাপার এই যে, ১৯৪৭ সালে গোটা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত করার পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রবল দাবীতে বৃটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে পশ্চিমবংগকে ভারতের হাতে তুলে দিল। যে অমুসলিম নেতৃবৃন্দ ১৯১১ সালে বংগভংগ রহিত করিয়ে ছিলেন, তারাই ১৯৪৭ সালে বংগভংগ করিয়ে ছাড়লেন। স্বার্থ বড় বালাই।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

পূর্ব বাংলার উন্নয়ন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার পরই পূর্ব বাংলার সার্বিক উন্নয়ন শুরু হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস ইত্যাদিতে মুসলমান অফিসার নিয়োগ শুরু হলো। অগণিত পদে মুসলিম যুবকরা ব্যাপকভাবে চাকরি পেতে লাগল। এমনকি সশস্ত্র বাহিনীতেও বেশ সংখ্যায় লোক ভর্তি হবার সুযোগ এলো।

অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ময়দানে অমুসলিমদের স্থানে মুসলিমদের অগ্রযাত্রা শুরু হলো। ভারত থেকে হিজরাত করে আসা লোকেরাই অমুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে বিনিময়ের ভিত্তিতে দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল করল। শিল্প-কারখানার পুঁজি এবং অভিজ্ঞতা নিয়ে মুহাজিররাই এ এলাকার উন্নয়নে লেগে গেল।

যদি পাকিস্তান না হতো এবং আমরা যদি অখন্ড ভারতের অন্তর্ভুক্তই থাকতাম, তাহলে আজ স্বাধীন বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। এ অবস্থায় এ এলাকার মুসলমানদের কী দশা হতো তা কি আমরা ভেবে দেখি ? আজ যারা জেনারেল, তাদের কয়জন নন-কমিশন অফিসারের উপর কোন স্থান দখল করার সুযোগ পেতেন ? সেক্রেটারীর মর্যাদা নিয়ে আজ যারা সচিবালয়ে কর্তৃত্ব করছেন, তাদের কতজন সেকশন অফিসারের উর্ধে উঠতে পারতেন ? আজ যারা পুলিশের বড় কর্তা, তারা দারোগার বেশী হতে পারতেন কী ?

www.icsbook.info

মুসলিম নামের অধিকারী হয়েও বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বড় বড় মর্যাদার আসন অলংকৃত করছেন, তাদের কি এ সুযোগ ঘটতো ? ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের যে বাহিনী এখন বিদেশে পর্যন্ত বিরাট সুযোগ পাচ্ছেন, তাদের মধ্যে শতকরা কতজন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করতেন ?

বাংলাদেশে এখন যেসব শিল্প-কারখানা রয়েছে পাকিস্তান না হলে তা কি সম্ভব হতো ? আজ যারা বড় বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন, তারা মাড়োয়ারীদের দাপটে কি মাথা তুলতে পারতেন ?

আজ বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তান হয়েছিল বলেই এটুকু পজিশন সম্ভব হয়েছে। তা নাহলে আমরা ভারতের একটা প্রদেশের অংশ হয়েই থাকতে বাধ্য হতাম। একটা পৃথক প্রদেশের মর্যাদাও পেতাম না। *(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)*

কেন সার্বিক উন্নয়ন হলো না ?

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পূর্ব বংগের সার্বিক উন্নয়ন না হওয়ার জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারই প্রধানত দায়ী। ইংরেজ চলে যাবার পর প্রশাসনিক কর্মকর্তা হয়ে যারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করলেন, তাদের মধ্যে পূর্ব বংগের কোন বড় কর্মকর্তা ছিল না। আর পাকিস্তান আন্দোলনের যেসব নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন, তাদের মধ্যে পূর্ব বংগের যারা প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, তারা এত অনভিজ্ঞ ও দুর্বল ছিলেন যে, পূর্ব বংগের উন্নয়নের ব্যাপারে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের যতটা করণীয় ছিল তার সামান্য কিছুই আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

বৃটিশ আমলে পূর্ব বংগ চরমভাবে অবহেলিত থাকার দরুন এ অঞ্চল শিল্প-বাণিজ্য, সেচ প্রকল্প, বন্দর-সুবিধা, কৃষি-উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, পেশাগত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক অনুন্নত ছিল। এ অবস্থায় পূর্ব বংগের উন্নয়নের প্রতি শুরু থেকেই বিশেষ মনোযোগ দেয়া কর্তব্য ছিল। এ কর্তব্য পালন করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এখানকার জনগণের এমন আস্থা সৃষ্টি হতো, যা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় করতে সক্ষম হতো।

পূর্ব বংগের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার জন্য শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমাদের নিজেদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতা ঢেকে রাখার যারা চেষ্টা করে আমরা তাদের সাথে একমত নই।

www.icsbook.info

যারা নিজেদের পশ্চাদগামিতার জন্য শুধু অপরকে দোষী সাব্যস্ত করেই আপন দায়-দায়িত্ব শেষ করে, তারা নিজেদের দোষ ও ভুল দেখতে পায় না। তাদের পক্ষে সত্যিকার উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হয় না। পাকিস্তান হবার পর এ এলাকার জনগণের অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন না হওয়া এবং যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে, তা দ্রুত না হওয়ার জন্য পাকিস্তানীদের উপর দোষ চাপাবার প্রবণতা এত প্রবল ছিল যে, সব ব্যাপারেই শুধু পশ্চিমের শোষণের দোহাই দেয়া হতো।

নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের যোগ্যতা না থাকলে এক মায়ের পেটের ভাই-এর কাছেও ঠকতে হয়। যে ভাই ঠকায়, সে নিশ্চয়ই দোষী। কিন্তু সে তার স্বার্থ যেমন বুঝে নিচ্ছে, অপর ভাইও যদি নিজের অধিকার আদায় করার যোগ্য হয়, তাহলে আর ঠকতে হয় না।

আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল নিঃস্বার্থ, জনদরদী, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। পূর্ব পাকিস্তানের উপর যত অবিচার হয়েছে এর জন্য প্রধানত দায়ী এখানকার ঐসব নেতা, যারা কেন্দ্রীয় সরকারে শরীক থেকেও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেননি। বিশেষ করে আইয়ুব আমলে যারা মন্ত্রিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পেয়ে গণতন্ত্রের বদলে একনায়কত্বকে সমর্থন করেছিলেন, তারা এদেশের জনগণকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সাথে সাথে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পংগু করে রাখার জন্যও বিশেষভাবে দায়ী।

নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের জন্য যারা শুধু লর্ড ক্লাইভকে গালি দেয়, তাদের সাথে একমত হওয়া যায় না। ক্লাইভ তার জাতীয় স্বার্থের পক্ষে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মীর জাফরের স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই যে আমরা পরাধীন হয়েছিলাম, তা থেকে শিক্ষা আজও আমরা নিচ্ছি না। পশ্চিম পাকিস্তানের "ক্লাইভদের" চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের "মীর জাফররাই" যে আমাদের অবনতির জন্য অধিকতর দায়ী, সে কথা উপলব্ধি না করার ফলে আজও আমাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের অভাব

সত্যিকার আদর্শবান, নিঃস্বার্থ জনদরদী, চরিত্রবান ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে না। আমাদের দেশে কোন পলিটিকেল সিস্টেম গড়ে ওঠার লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। এখানে রাজনীতি করা মানে যেকোন উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। দলীয় নেতৃত্বের

www.icsbook.info

আসন দখল করাই রাজনৈতিক দল গঠনের একমাত্র লক্ষ্য। ঐ আসন বেদখল হয়ে গেলে দল ভেংগে হলেও নেতা হবার রীতি এদেশে প্রচলিত হয়ে গেছে।

গণতন্ত্রের শ্লোগান আমাদের দেশে একনায়করাই বেশী জোরে দিয়ে থাকে। কারণ, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারায় যেন পার্থক্য স্পষ্ট নয়।

এ ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ আছে বলেই সেনাপতিরাও ক্ষমতা দখল করে রাজনৈতিক দল গঠন করার ডাক দিলে গণতন্ত্রের বহু তথাকথিত ধ্বজাধারী একনায়ককেই গণতন্ত্রের নায়ক হিসেবে মেনে নেয়।

নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব থাকলে জনগণের সব অধিকারই অর্জন করা সম্ভব হতো। আর ঐ জিনিসের অভাব থাকায় বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দুর্দশা বেড়েই চলেছে। নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ঃ

১। নিষ্ঠার সাথে গণতন্ত্রের আদর্শ মেনে চলার অভ্যাস।

২। সরকারী ও বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে সত্যিকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রচলন।

৩। দেশ শাসনের উদ্দেশ্যে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলবার ব্যবস্থা।

৪। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধান।

৫। যারা বিনা নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করে, তাদেরকে গণতন্ত্রের দুশমন মনে করা এবং তাদের নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করা।

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা

আমার দেশ বাংলাদেশ

প্রত্যেক মানুষই তার একখানা নিজস্ব বাড়ী কামনা করে। ছোট একটি কুঁড়ে ঘরও গৃহহীনের নিকট কামনার বস্তু। আপন বাড়ীর মতো আপন দেশও মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন। পৃথিবীর কোন একটি ভূখন্ডকে আমার দেশ হিসেবে গণ্য করার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তারাই এর অভাব সত্যিকারভাবে অনুভব করতে পারে। তাই যারা জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত তাদের বংশধররা পর্যন্ত অন্য দেশে পয়দা হলেও পিতামাতার জন্মভূমিকে আপন দেশ মনে করে। ফিলিস্তিনে যেসব মুসলিম অধিবাসী কয়েক দশক পূর্বে জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে, তাদের সন্তানেরা অন্যান্য দেশে পয়দা হয়ে সেখানেই লেখা-পড়া বা কাজ-কর্ম শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন রকম প্রতিষ্ঠাই তাদের আপন দেশের অভাব দূর করতে পারছে না। তাই ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের যুবকদের যারা কোনদিন ফিলিস্তিন দেখেওনি, তারা পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জন্য অকাতরে জীবন দিচ্ছে। আমার দেশ এমনই এক আকর্ষণীয় বিষয়।

ঘটনাচক্রে ১৯৭১ সালে ২২শে নভেম্বর থেকে ১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাই পর্যন্ত প্রায় সাত বছর বাধ্য হয়ে বিদেশে ছিলাম। যেখানেই রয়েছি সম্মানের সাথেই ছিলাম। কিন্তু আমার দেশের মায়া কোন দিন বিদেশে মনকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। সাড়ে চার বছর পর পরিবার পরিজন দেশ থেকে যেয়ে আমার সাথে মিলিত হবার পর দেশের জন্য অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল।

আমি লন্ডনে ছিলাম দূর সম্পর্কের এক ভাতিজার বাসায়। তার স্ত্রী আমাকে পিতার মতো সেবা-যত্ন করেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা আমাকেই আপন দাদা মনে করত। আমার পরিবার ওখানে যাবার পর ওরা দাদী পেয়ে আরও খুশী। কিন্তু আমার ছেলেদের লেখা-পড়া নিয়ে মহাচিন্তায় পড়লাম। বাংলাদেশী আমার পুরনো বন্ধুদের যাঁরা ওখানে বাড়ী কিনে স্থায়ী বাসিন্দা, এমন কি বৃটিশ নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন তাঁরা আমার অস্থিরতা দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁরা ছেলেদের লেখা-পড়া সে দেশেই শেষ করার পরামর্শ দিলেন। সে দেশের লেখা-পড়ার এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমার অস্থিরতা কমল না। বিলাতের বড় বড় শহরগুলোতে বাংলাদেশীদের সংখ্যা এত বেশী যে, বিয়ে-

www.icsbook.info

শাদী ও সামাজিকতার সব কাজ-কর্মেই নিজ দেশের পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব। তবুও ছেলেদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হলাম। কারণ সে দেশে দীর্ঘকাল থাকলেই ওরা ইংরেজ হতে পারবে না। অথচ বাংলাদেশী হয়েও গড়ে উঠবে না। যে ছেলে নবম শ্রেণীর ছাত্র সে এক বছরেই ইংরেজীতে সেখানে অনেক উন্নতি করা সত্ত্বেও অন্ততঃ প্রবেশিকা পর্যন্ত দেশে না পড়লে মাতৃভাষা শেখা হবে না বলে আশংকা ছিল। তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। সবার ছোট ছেলেটির মাত্র সোয়া দু'বছর বিদেশে পড়ার পর দেশে এসে বাংলার মাধ্যমে পড়তে গিয়ে ভাষা সমস্যা দেখা দিল। বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দু'বছর পর্যন্ত ইংরেজীতে অনুবাদ করে বহু বাংলা শব্দ বুঝাতে হয়েছে।

বিলাতে বাংলাদেশীদের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কথা বলতে গিয়ে ভাষা সমস্যা প্রথমেই প্রকট হয়। বয়স্ক যারা তারা বাংলা ভাষায় না বললে সবাই বুঝতে পারে না। কিন্তু বাংলা বললে যুবক ও কিশোরদের পক্ষ থেকে ইংরেজীতে বলার জোর দাবী উঠে। কারণ ঘরে আঞ্চলিক বাংলায় কথা বলতে পারলেও কোন আলোচনা বাংলায় হলে ওদের বুঝতে খুব কষ্ট হয়। ৬ বছর বিলাত থাকাকালে যখনই বাংলাদেশী কিশোর ও যুবকদের সাথে মিশবার সুযোগ হয়েছে তখনই তাদেরকে কয়েকটি পরামর্শ দেয়া কর্তব্য মনে করেছি।

১। তোমরা বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে শিখবার চেষ্টা করবে। নইলে দেশে যেয়ে জনগণের সাথে আপন হতে পারবে না এবং তাদের ভালবাসাও পাবে না। দেশের সেবা ও জনগণের খিদমত করার সুযোগ এবং তৃপ্তি পেতে হলে দেশবাসীর ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

২। বিদেশে যত সুযোগ-সুবিধাই পাও, সে দেশকে আপন দেশ হিসেবে পাবে না। বৃটিশ পাসপোর্ট পেলেই ইংরেজরা তোমাদেরকে আপন দেশী মনে করবে না। সে দেশের আইনগত নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও মনের দিক থেকে নিজেকে বিদেশীই ভাবতে হবে।

৩। যত ভাল বেতনেই বিদেশে চাকুরী কর, কোন দিন নিজের দেশকে সেবা করার মত মানসিক তৃপ্তি পাবে না। নিজের দেশে যতটুকু কাজই কর, মনে গভীর তৃপ্তি বোধ হবে যে দেশের জন্য সামান্য সেবা হলেও করতে পারছি। ভাড়া বাড়ী উন্নয়নের জন্য কোন ভাড়াটেই টাকা ব্যয় করে না এবং সে বাড়ীতে যত সুবিধাই থাকুক আপন বাড়ী বলে মনে হয় না। নিজের কুঁড়ে ঘরে থাকলেও তার চাইতে বেশী সুখ অনুভূত হয় এবং সেটাকে উন্নত বাড়ীতে পরিণত করে সন্তানদের জন্য রেখে যাবার আকাঙ্খা স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়।

www.icsbook.info

আমার ছেলেরা যাতে বাংলাভাষার চর্চা করে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিলাম। কখনও তাদের কাছে ইংরেজীতে চিঠি লিখি না। তাদেরকে বাংলায় চিঠি দিতে বাধ্য করি।

জন্মভূমি স্রষ্টার দান ঃ মাতৃভাষা ও জন্মভূমি মানুষ নিজের চেষ্টায় অর্জন করে না। মহান স্রষ্টার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দু'টো বিষয় অর্জিত হয়। তাই এ দু'টো আকর্ষণ জন্মগত ও মজ্জাগত। আমি নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশে জন্মলাভ করিনি। আমার খালিক ও মালিক আল্লাহ পাক নিজে পছন্দ করে যে দেশে আমাকে পয়দা করেছেন সে দেশই "আমার দেশ" হবার যোগ্য এবং যে মায়ের গর্ভে আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ভাষাই আমার প্রিয়তম ভাষা। বাল্যকাল থেকে যে ভাষায় মানুষ চিন্তা করে স্বপ্ন দেখে ও ভাব প্রকাশ করে সে ভাষা এবং জীবনের প্রথম পনর বছর যে ভৌগলিক পরিবেশে কাটে সে এলাকার মায়া কোন মানুষ সহজে ত্যাগ করতে পারে না।

আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনে বারবার মনকে প্রবোধ দেবার জন্য চিন্তা করেছি যে, জন্মের পর যেটুকু জমিতে আমাকে শোয়ান হয়েছে সেটুকু জায়গায়ই শুধু আমার জন্মভূমি নয়। যখন হামাগুড়ি দিতে শিখেছি তখন আমার জন্মভূমির আয়াতন বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হল। দাঁড়াবার বয়সে আরও প্রশস্ত হল। কর্মজীবনে আমার জন্মস্থান যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তার সমগ্র এলাকাই জন্মভূমিতে পরিণত হল। এটাকে আরও প্রশস্ত মনে করে গোটা এশিয়া কেন, পৃথিবীর সবটাকেই তো আমার দেশ মনে করা যায়। ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে যে বাংলাদেশ সেখানে যাবার এত আকুল আগ্রহ কেন—সেখানের মায়া ভুলতে পারা যায় না কেন ? যে দেশে অশান্তি, বিশৃংখলা নিরাপত্তার অভাব, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য, রোজগারের অভাব ইত্যাদির দরুন সেখানকার মানুষ বিদেশে পাড়ি জমাবার জন্য পাগল, সে দেশের হাতছানি আমাকে উল্টো পাগল করল কেন ?

এসব প্রবোধবাক্য ও দার্শনিক প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক কোন জওয়াবের প্রয়োজন নেই। এর সরল জওয়াব আমার মন থেকে যা পেয়েছি তার সামনে অন্য যুক্তি অচল। মায়ের নিকট সন্তান এবং সন্তানের নিকট মায়ের মূল্য তাদের চেহারার সৌন্দর্য, গায়ের রং বা অন্যান্য গুণের দ্বারা বিচার্য নয়। কদর্য সন্তানও স্নেহময়ী মায়ের নিকট আদরের দুলালই , আর কদর্য মাও মাতৃভক্ত সন্তানের নিকট স্নেহময়ী মা বলেই পরিচিত।

www.icsbook.info

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, কতটুকু ভৌগলিক এলাকা জন্মভূমি বলে গণ্য হবে ? ১৯২২ সালে যখন আমি ঢাকা শহরে পয়দা হই তখন বৃটিশ-ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিলাম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর স্বাভাবিকভাবেই আমার জন্মভূমি আকারে ক্ষুদ্র হয়েছে এবং প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের যে এলাকাটি এখন বাংলাদেশ নামে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করেছে সেটুকুই এখন আমার প্রিয় দেশ বা "আমার দেশ"।

জন্মভূমিকে ভালবাসা ঃ জন্মভূমির ভালবাসা মানুষের সহজাত। যারা কখনও বিদেশে দীর্ঘদিন কাটায়নি তারা এ ভালবাসার গভীরতা সহজে অনুভব করতে পারে না। চাকুরী, উচ্চশিক্ষা বা ব্যবসা উপলক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে যাঁরা বিদেশে বসবাস করেন, তাঁদের সবাই আমার সাথে একমত হবেন যে, বিদেশে যাবার আগে জন্মভূমি এত প্রিয় বলে মনে হয়নি। কিন্তু যারা বাধ্য হয়ে বিদেশে অবস্থান করে এবং কোন কারণে দেশে আসতে অক্ষম হয় তাদের এ অনুভূতি আরও গভীর হয়। তারা দৈহিক দিক দিয়ে বিদেশে পড়ে থাকলেও তাদের মনটা দেশেই পড়ে থাকে। দেশের মানুষ দেশের গাছ-পালা, দেশের আবহাওয়া, দেশের ফলমূল, দেশের পশু-পাখী, দেশের মাটি যেমন আপন মনে হয় বিদেশের এসব জিনিস তেমন মনে হতে পারে না। সাময়িকভাবে বা আংশিকভাবে কোন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যতই মনোমুগ্ধকর মনে হোক সামগ্রীকভাবে জন্মভূমিই যে প্রিয়তম একথার সাক্ষী আমি নিজে।

বিদেশে যাবার আগে জীবনের ৪৯টি বছর যে আবহাওয়ায় কেটেছে, যে ধরনের খাদ্য খেয়ে দেহ গঠিত হয়েছে, যে রকমের শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় দেহ-মন আবর্তিত হয়েছে কোন দেশেই সামগ্রীকভাবে তা পাইনি। লন্ডনের গ্রীষ্মকাল কোন কোন বছর এ দেশের বসন্তকালের মতো মিষ্টি মনে হলেও সেখানকার শীতকালটা মহাবিপদই মনে হয়েছে। শীতকালে সেখানে বৃষ্টি হতেই থাকে—গ্রীষ্মে বৃষ্টি নেই। ক্রমাগত ৫/৭ দিন প্রচন্ড শীতের মধ্যে যখন সূর্যের সাথে একটুও সাক্ষাৎ হয় না, তখন ঢাকার প্রিয়তম সূর্যের কথা মনে না হয়ে পারেনি। গরমের দিনে রিয়াদ বা কুয়েতে যখন ১২৫ ডিগ্রি গরমে এয়ারকন্ডিশনড কামরা থেকে বের হওয়া দুষ্কর মনে হয়েছে, তখন বাংলাদেশের গরমের মিষ্টতা মনে আসাই স্বাভাবিক। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত বাংলাদেশের যে আবহাওয়ায় আমি অভ্যস্ত হয়েছি তার ঘর্মাক্ত গ্রীষ্ম, বিরামহীন বর্ষা ও কুয়াশাচ্ছন্ন শীত সাময়িকভাবে যতই বিরক্তিকর মনে হোক না কেন সামগ্রীকভাবে জন্মভূমির আবহাওয়াই সর্বোত্তম।

www.icsbook.info

খাদ্যের ব্যাপারটা আরও বেশী অনুভূতিপ্রবণ। মানুষ যে ধরনের খাবারে অভ্যস্ত হয় সে খাবার ব্যতীত একটানা অন্য ধরনের খাবারে তৃপ্তি পায় না। জন্মভূমির মাছ-ভাত ও শাকসবজিকে কিছুতেই ভুলতে পারা গেল না। যত উন্নতমানের খাবারই বিভিন্ন দেশে খেলাম বাংলাদেশের চিংড়ি মাছ ও পুঁইশাক, কইমাছ ও পালং শাকের চচ্চরি জাতীয় খাবারের স্মৃতি বার বার মনে এসেছে। অনভ্যস্ত খাবারে শরীরের প্রয়োজন পূরণ অবশ্যই হয়েছে। খাওয়ার দায়িত্বও পালন হয়েছে কিন্তু সত্যিকার তৃপ্তিলাভের জন্য বিলাতেও বাংলাদেশের পাবদা, ইলিশ ও অন্যান্য মাছ এবং শুটকি যোগাড় করে খেয়েছি। বহু বাংলাদেশী সে দেশে থাকার দরুন বাংলাদেশীদের দোকানে দেশী তরিতরকারী পর্যন্ত পাওয়া যায়।

জন্মভূমির মানুষের ভালবাসাও বিদেশে বেশী অনুভূত হয়। বিলাতে পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রেনে বা টিউবে (আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেন) দেশী অপরিচিত লোকের সাক্ষাৎ পেলেও অত্যন্ত আপন মনে করে আলাপ-পরিচয় করতে আগ্রহ বোধ হয়েছে। দেশের মানুষ সম্পর্কে কোন সুখবর শুনলে মনে গভীর তৃপ্তিবোধ হয়েছে। আবার কোন দুঃসংবাদ পেলে প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়েছে।

এভাবেই "আমার দেশের" সাথে নাড়ীর গভীর সম্পর্ক বিদেশে না থাকলে এমনভাবে অনুভব করতে পারতাম না। যারা কোন কারণে বিদেশে থাকে তারা সেখানে আপান দেশে থাকার মানসিক তৃপ্তি কিছুতেই পেতে পারে না। আপন বাড়ী ও আপন দেশ সত্যিই প্রিয়তম। তাই বাংলাদেশই আমার দেশ, এর উন্নতিই আমার উন্নতি, এর দুর্নামই আমার দুর্নাম। আমার দেশের কল্যাণের প্রচেষ্টা চালান তাই আমার ঈমানী কর্তব্য।

জন্মভূমির প্রতি মহব্বত এতটা গভীর যে, নবীদের জীবনেও এর স্বাভাবিকতা লক্ষ্যণীয়। দুনিয়ার প্রতি নবীদের সামান্যতম আকর্ষণও নেই। আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ পালন করার প্রয়োজনে নিজের সন্তানকে আপন হাতে যবেহ করা বা শিশু পুত্রসহ প্রিয়তমা স্ত্রীকে নির্জন মরুভূমিতে ফেলে আসা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) দুনিয়াতে মুসাফিরের মতো জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। দুনিয়ার মহব্বতকে সমস্ত পাপের মূল বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করা ছাড়া তিনি দুনিয়ার জীবনের প্রতি কোন মায়া পোষণ করতেন না। অথচ মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা যাবার সময় মক্কা শহর থেকে বের হবার পর পেছন ফিরে মক্কাকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে মক্কা! দুনিয়ার শহরগুলোর মধ্যে তুমিই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় এবং আল্লাহর সবগুলো

www.icsbook.info

শহরের মধ্যে তোমাকেই আমি সবচাইতে বেশী মহব্বত করি। ইসলামের দুশমনরা যদি তোমাকে ছেড়ে যাবার জন্য আমাকে বাধ্য না করত তাহলে কখনও আমি তোমাকে ত্যাগ করে যেতাম না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত যদিও নবী ছিলেন তবুও তিনি মানুষ ছিলেন। তাই মানুষ হিসেবে বিবি-বাচ্চার প্রতি মহব্বত যেমন তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ছিল, জন্মভূমির প্রতি ভালবাসাও তেমনি সহজাত ছিল। এ ঘটনা জানার পর জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার মধ্যেও ধর্মীয় প্রেরণা অনুভব করছি।

জন্মভূমির প্রতি এ ভালবাসা সত্ত্বেও তিনি ইসলামের স্বার্থে হিযরত করে মদীনায় চলে গেলেন। এ থেকে মানবজাতি এ শিক্ষাই পেল যে, দ্বীন ইসলামকে জন্মভূমি থেকেও বেশী ভালবাসতে হবে। নিজের জন্মভূমিতে ইসলামকে বিজয়ী করা যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে যেখানে সম্ভব মনে হয় সেখানে হিযরত করে হলেও দ্বীনকে কায়েম করতে চেষ্টা করা মুসলিম জীবনের প্রধান দায়িত্ব। *(আমার দেশ বাংলাদেশ)*

আমার ভাষা বাংলাভাষা

মানুষের জন্মভূমির মতো মাতৃভাষাও আল্লাহর দান। নিজের ইচ্ছায় যেমন কেউ কোন এলাকায় জন্মলাভ করতে পারে না, তেমনি মাতৃভাষাও কেউ বাছাই করে নিতে পারে না। যে মায়ের কোলে আমার মহান স্রষ্টা আমাকে তুলে দিয়েছেন সে মায়ের ভাষাই আমাকে শিখতে হয়েছে। এ ব্যাপারটা মোটেই ঐচ্ছিক নয়। জন্মভূমির আবহাওয়ার মতোই মাতৃভাষা প্রত্যেকের মজ্জাগত। দুনিয়ার যত ভাষা খুশি শিখুন। সেসব ভাষায় যোগ্যতা অর্জন করুন কিন্তু আপনার শৈশব ও কৈশোর যদি জন্মভূমিতে কাটিয়ে থাকেন, বিশেষ করে ছাত্র জীবন যদি নিজের দেশেই যাপন করে থাকেন তাহলে সব ভাষা ছাপিয়ে মাতৃভাষাই আপনার মনমগজকে চিরদিন দখল করে থাকবে। বিদেশেও স্বপ্ন দেখবেন মাতৃভাষায়ই, চিন্তা প্রধানতঃ মাতৃভাষায়ই আসবে এবং মনে মাতৃভাষায়ই ভাব সৃষ্টি হবে।

কোন্ ভাষায় কথা বলতে মনে বেশী তৃপ্তি পাওয়া যায় ? বাংলাদেশী হয়েও যাঁরা ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে বেশী পছন্দ করেন তাদের কৈফিয়ত নিশ্চয়ই আছে। হয়তো মাতৃভাষায় নিজ এলাকার কথ্য রূপ ছাড়া বাংলা বলতে অক্ষম বলে ইংরেজী বলা সুবিধাজনক মনে করেন। কিন্তু আমি বিলাতেও বহু উচ্চ শিক্ষিত লোককে দেখেছি যে, তাঁরা ইংরেজী ভাষায় যতই যোগ্য হোন নিজ দেশের লোকদের সাথে মাতৃভাষায় কথা না বললে মোটেই তৃপ্তি বোধ করেন না। বিশেষ করে নিজ নিজ জেলার বা এলাকার

www.icsbook.info

লোক পেলে স্থানীয় কথ্য ভাষায় কথা বলার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারেন না। এটাই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম যা তা অবশ্যই কৃত্রিম।

দুনিয়ার বহু দেশ দেখার আমার সুযোগ হয়েছে। বিদেশী একাধিক ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাভাষী লোকের সাথে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলতে মোটেই পছন্দ করিনি। বাংলাদেশের বহু লোক বিলাতে সপরিবারে বাস করে এবং বাড়ীতে তারা মাতৃভাষায়ই কথা বলে। কিন্তু তাদের যেসব ছেলেমেয়ে সে দেশে পয়দা হয়েছে বা শৈশবকালেই সেখানে গিয়েছে তারা সেখানকার স্কুলে পড়া-লেখা করার ফলে ইংরেজীতে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, বাড়ীতেও বাপ-মা ছাড়া আর সবার সাথেই ইংরেজীতে কথা বলে। বহু পরিবারে দেখেছি যে, ছেলেমেয়েরা পরস্পর শুধু ইংরেজীতে বলে। অবশ্য বাপ-মা যদি ইংরেজী বলতে না পারে বা না চায় তাহলে বাপ-মায়ের কথ্য ভাষায়ই কথা বলতে বাধ্য হয়। আমার সবচেয়ে ছোট ভাই-এর ছেলের বয়স যখন ৬ বছর তখন বিলাতে ওর সাথে পয়লা দেখা হলো। সে সেখানেই পয়দা হয়েছে। নার্সারীতে তখন পড়ছে। ওর বাপ-মায়ের কাছে ওর বড় চাচার কথা বহু শুনেছে। তাই আমাকে সেও পিতা মাতার সাথে সাদরেই অভ্যর্থনা জানাল। ওকে কোলে টেনে নিয়ে আদর করে কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়লাম। আমি বাংলায় জিজ্ঞেস করি, আর সে ইংরেজীতে জওয়াব দেয়। কতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করেও যখন একটি বাক্যও বাংলা বলাতে পারলাম না তখন চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বললাম, "আমি কোন ইংরেজের চাচা নই। আমার সাথে বাংলায় কথা না বললে চাচা হতে রাজী নই।" ফল আরও খারাপ হলো। সে আমার কাছে আর আসতে চায় না—কথা বলাও বন্ধ করল। বাধ্য হয়ে আমাকেই আত্মসর্মপণ করতে হলো এবং ইংরেজীতে কথা বলে ওর Uncle (চাচা নয়) এর মর্যাদা পেলাম। সে যদিও বাপ মায়ের সাথে ছোট থেকেই বাংলা বলায় অভ্যস্ত, তবুও পারিবারিক বাঁধাধরা কতক কথাই বাংলায় শিখেছে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য যত শব্দ ও বচন সে স্কুলে ৩ বছর বয়স থেকেই শিখছে সে ভাষাই তার মাতৃভাষায় পরিণত হয়েছে।

দেশ বিদেশে ঘুরে আমার উপর মাতৃভাষার প্রভাব যেন আরও বেশী অনুভব করলাম। কোন সময় এমনও হয়েছে যে, সপ্তাহ খানিক বাংলা বলার লোক না পেয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠেছি। একটানা অনভ্যস্ত খাবার খেয়ে মাছ-ভাতের জন্য মন যেমন অস্থির হতো, বাংলায় কথা বলার লোক না পেলেও কেমন যেনো অস্বস্তি বোধ হতো। কোন সময় আরব দেশের আরবী খানা খেতে খেতে বাংলায়ই দেশী খাবারের কথা ভেবেছি। অথচ

www.icsbook.info

ইংরেজীর মাধ্যমেই আজীবন লেখাপড়া করেছি। ১৯৪০ সালে যখন ঢাকায় সপ্তম শ্রেণীতে উঠলাম তখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুলে বাংলা মাধ্যম চালু হলেও ঢাকা বোর্ডে ইংরেজী মাধ্যমই চালু ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গোটা শিক্ষাই ইংরেজীর মাধ্যমে হলেও বাংলা ভাষার প্রভাব আমার উপর এত বেশী ছিল যে, বি. এ-তে বাধ্যতামূলক এক পেপার বাংলা পড়ে যেন আমার পেট ভরতো না। স্পেশাল বিষয় হিসেবে বাংলা নিয়ে আরও তিন পেপার বাংলা পড়া যেতো। আমার সে বিষয় নেবার সুযোগ না থাকলেও বাংলা বিভাগের শিক্ষকগণ আমার উৎসাহ দেখে নিয়মিত তাঁদের ক্লাশে যেতে অনুমতি দিতেন এবং আমি তাঁদের কয়েকজনের ক্লাশে রীতিমত যোগদান করতাম। ক্লাশে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অধ্যাপকগণের মনোযোগও আমার প্রতি যথেষ্ট পেয়েছি। এমন কি বি, এ, পরীক্ষার বাধ্যতামূলক এক পেপারের পরীক্ষায় ভাল নম্বর দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্ব রঞ্জন ভাদুরী আমাকে বাংলায় এম, এ, পড়ার জন্য অতি স্নেহ ভরে তাকিদ দিলেন। বাংলা ভাষায় ডিগ্রি নেবার আমার আগ্রহ ছিল না। বাংলাভাষার চর্চা এবং লেখাপড়ার উৎসাহ অবশ্যই ছিল ও আছে এবং স্বাভাবিকভাবেই থাকবে বলে আশা করি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, তিন কারণে তোমরা আরবী ভাষাকে ভালবাসবে। এর পয়লা কারণ তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ আমি আরবীভাষী। এ থেকে বুঝা যায় মাতৃভাষার প্রতি মানুষের ভালবাসা এমন স্বাভাবিক যে, রাসূলের জীবনেও তা প্রমাণিত। এ হাদীস জানার পর থেকে আমার মাতৃভাষাকে ভালবাসার মধ্যে একটি পবিত্র অনুভূতি যোগ হলো।

রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে যখন প্রথম এ আন্দোলনের সূচনা হয় তখন এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক গন্ধ আমি অনুভব করিনি। তখনকার শাসকগণের পক্ষ থেকে এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বলে প্রচার করলেও আমি এটাকে অপপ্রচার মনে করেছি। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কারো থাকুক বা নাই থাকুক এ আন্দোলনের আবেদন ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মানবিক। ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদের প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী (১৯৪৬-৪৭) এবং ডাকসুর তদানীন্তন জি, এস, (১৯৪৭-৪৮) হিসেবে হলের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের সাথে আলোচনায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আমি যা বলতাম তা নিম্নরূপ ঃ

www.icsbook.info

ইংরেজ থেকে আযাদী হাসিল করার পর যোগ্যতার সাথে এর সুফল ভোগ করতে হলে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতেই হবে। ইংরেজরা এদেশ দখল করার পর যখন ইংরেজী ভাষায় রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করল তখন মানুষ পরাধীনতার বিস্বাদ তীব্রভাবে অনুভব করল। মাতৃভাষায় মহাজ্ঞানী ব্যক্তিও তখন রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে নিরক্ষরে পরিণত হলো। ইংরেজের ভাষা না জানায় সরকারের নিকট আর কোন যোগ্যতাই গণ্য রইল না। ফলে ইংরেজী না জানা সব শিক্ষিত লোক রাতারাতি মূর্খের সমপর্যায়ে অবনমিত হলো।

"এ সুস্পষ্ট যুক্তির ভিত্তিতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একমাত্র উর্দু হলে বাংলাভাষী সব লোকই সরকারী ব্যাপারে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। উর্দু ভাষা শিখে যোগ্য হবার শত চেষ্টা করলেও বাংলাভাষী পাকিস্তানীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হতে বাধ্য হবে। তাছাড়া বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা না পেলে শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে বাংলাভাষার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে।"

"স্বাধীন জাতীয় মর্যাদা নিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজনে তাই উর্দুর সাথে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করতেই হবে। পূর্ব পাকিস্তানী জনসংখ্যা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আমরা করছি না। আমরা উর্দু ও বাংলা দু'টো ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার দাবী জানাচ্ছি। এ দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই।"

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকালে আমরা যে শ্লোগান দিতাম তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। "বাংলা উর্দু ভাই ভাই–রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" "উর্দু বাংলা ভাই ভাই–উর্দুর সাথে বাংলা চাই।"

আমার বাংলাভাষার রূপ ঃ একই ইংরেজী ভাষা বৃটেন ও আমেরিকায় প্রচলিত থাকলেও উভয় দেশের ভাষায় এত পার্থক্য কেন সৃষ্টি হলো ? উভয় দেশ একই খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে ভাষার পাথর্ক্য বাড়ছে। ধর্মকে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রাখার যত চেষ্টাই হোক আধুনিক যুগেও ভাষা ও সংস্কৃতিতে ধর্মীয় প্রভাব অবচেতনভাবে হলেও থেকেই যায়। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলিম দু'টো প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে। এদেশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ভাষা ও সংস্কৃতি হিন্দু প্রধান। হিন্দুদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে মুসলিমদের ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য এতটা স্পষ্ট যে, ভাষা ও সাহিত্যে এর স্বাভাবিক প্রতিফলন হয়েছে। মুসলমানদের ভাষায় কুরআন হাদীসের পরিভাষা ও শব্দ এবং এরই প্রভাবে ফারসী ও উর্দু শব্দ ব্যাপক হারে চালু রয়েছে।

www.icsbook.info

মুসলিম সাহিত্যিক ও কবিদের ভাষা এবং হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের ভাষায় স্বাভাবিকভাবেই যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা জোর করে দূর করার চেষ্টাকে অপচেষ্টাই বলতে হবে। হিন্দু ভাইরা "নেমন্তন্ন" খাবেন তাতে মুসলমানদের আপত্তি থাকা যেমন অন্যায়, মুসলমানরা "দাওয়াত" খেলে কারো নারাজ হওয়া সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়। পাকিস্তান হবার আগেও হোষ্টেলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, যেমন ফজলুল হক মুসলিম হলে আমরা "গোশত" খেতাম । পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ঢাকা হলে (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল) আমার হিন্দু সহপাঠীরা "মাংস" খেতো।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যের ভাষা ও কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এত পার্থক্য কেন ? এ পার্থক্যকে কৃত্রিম মনে করা ভুল। নজরুল কাব্যে আরবী ফারসী ও উর্দু প্রাচুর্যের ফলে মুসলিম সমাজে তার জনপ্রিয়তা স্বাভাবিক ছিল। তাই বাংলাভাষী মুসলমানদের নিকট নজরুলই জাতীয় কবি হিসেবে সমাদৃত। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার মহান কবি হিসেবে আমাদের অন্তরে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হলেও মুসলিম জাতীয় কবির মর্যাদা তিনি পাননি। অথচ উভয় কবিই পশ্চিম বংগে জন্ম নিয়েছেন।

জনাব আবুল মনসুর "পূর্ব বাংলার" জনগণের ভাষাকে বাংলাদেশের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বংগের জনগণের ভাষা থেকে আলাদা করে দেখেছেন। কিন্তু পশ্চিম বংগ ও বাংলাদেশের জনগণের ভাষার যে পার্থক্য রয়েছে তার চেয়েও বড় পার্থক্য উত্তর বংগ ও সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা, মোমেনশাহী ও নোয়াখালীর ভাষায় সুস্পষ্ট। তাই জিলায় বা এলাকায় কথ্য ভাষার যে পার্থক্য তা সাহিত্যে সংলাপ পর্যায়েই ব্যবহৃত হতে পারে। বাংলাদেশে সার্বজনীন সাহিত্যের ভাষা কোন একটি আঞ্চলিক ভাষা হতে পারে না।

পশ্চিম বাংলার সাহিত্য হিন্দু সংস্কৃতি প্রধান এবং বাংলাদেশের সাহিত্য মুসলিম সংস্কৃতি প্রধান হওয়াই স্বাভাবিক। এর ফলে দু'দেশে ভাষায় কিছু পার্থক্য এমন থাকাই সঙ্গত যা সংস্কৃতিগতভাবে আপন পরিচয় বহন করবে। এ স্বাতন্ত্রটুকুই একটি দেশের নিজস্ব পরিচিতি। বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দ্বারাই জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কোন একটি দেশকে অন্য জাতি অস্ত্রের বলে জয় করা সত্ত্বেও আপন সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকলে একদিন সে দেশ রাজনৈতিক আযাদীও হাসিল করতে পারে। কিন্তু যদি বিজয়ী জাতির সংস্কৃতির নিকট সে দেশের জনগণ পরাজিত হয় তাহলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া অসম্ভব।

www.icsbook.info

"আমার দেশ বাংলাদেশ" আমার ভাষা বাংগালী ভাষা নয়–"বাংলাদেশী ভাষা।" কারণ মুসলিম সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এদেশের শতকরা ৯০ জনের ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার দিক দিয়ে আমরা আদর্শগতভাবে মুসলিম জাতি এবং ভৌগলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশী জাতি। এদেশের সব ধর্মের নাগরিক মিলে আমরা রাজনৈতিক পরিভাষায় বাংলাদেশী নেশান বা জাতি। কিন্তু আদর্শিক মানে আমরা মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। আমি পশ্চিম বংগের সাহিত্য তৃপ্তির সাথে অধ্যয়ন করি। সেখানকার সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁদের সাহিত্য কর্মের মান অনুযায়ী যথারীতি শ্রদ্ধা পোষণ করি। ইংরেজী সাহিত্য থেকেও আমি সাহিত্যের সুস্বাদু খোরাক পাই। কিন্তু তাদের সাহিত্য ও ভাষা আমার জাতীয় সাহিত্য বা জাতীয় ভাষা নয়। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের সহজবোধ্য যে ভাষা তাই আমার ভাষা। এর নাম যদিও বাংলাভাষাই—তবু পশ্চিম বংগের ভাষা থেকে এর পরিচয় ভিন্ন। এ ভাষা "বাংলাদেশের বাংলাভাষা" যেমন আমেরিকান ইংরেজী ভাষা দেখতে ইংরেজী হলেও ইংল্যান্ডের ইংরেজী ভাষা থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। *(আমার দেশ বাংলাদেশ)*

আমার হল ফজলুল হক মুসলিম হল

মানুষের জীবনে কোন এক সময়ে সাধারণ একটা ঘটনাও বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং মনে দীর্ঘস্থায়ী অনুভূতির সৃষ্টি করে। ১৯৮০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম 'মুসলিম' হল ফজলুল হক হলে চমৎকার অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ হয়। "পুনর্মিলনী উৎসব ১৯৮০" নামে এ অনুষ্ঠানটিতে এ হলের প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে বর্তমানে অবস্থানরত ১৪০০ তরুণ ছাত্রের পরস্পর মিলিত হবার এক প্রশংসনীয় ব্যবস্থা হয়। হলের বয়স ৪০ বছর। সুতরাং এ হলের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কমপক্ষে ৬০ বছর বয়সের বৃদ্ধের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। চাকুরী জীবন থেকে অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের সাথে পরিচয়ও হলো।

প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের যাঁরা এ মহান উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা সত্যিই আন্তরিক মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। তাঁরা এমন এক দুর্লভ মুহূর্তের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন যা আমার মতো অনেককেই নিঃসন্দেহে পরম মানসিক তৃপ্তি দান করেছে। এর প্রভাব আমার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে। প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের কয়েকজন আমার সমসাময়িক—কেউ সহপাঠি, কেউ সিনিয়ার, আবার কেউ জুনিয়ার।

www.icsbook.info

এ অনুষ্ঠানের সভাপতি হলের প্রভোষ্ট, প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি, হলের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাক্তন কয়েকজন ছাত্রের বক্তৃতা তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। ১৯৪৪ থেকে ৪৮ সাল পর্যন্ত এ হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে হলের যাবতীয় ক্রিয়াকান্ডে আমার ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। হল-সংসদের বর্তমান দায়িত্বশীলদের কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে আমার পুরাতন মধুর দিনগুলোকে ফিরে পেলাম বলে মনে হচ্ছিল।

ছাত্র জীবনটা সত্যি জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়। পরবর্তী জীবন যতই অনিশ্চিত হোক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে উজ্জলতম জীবনের স্বপ্ন আনন্দেরই সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়। আমি "প্রাক্তন ছাত্র" হিসেবে ঐ অনুষ্ঠানে বসে সত্যিই যেন ছাত্র জীবনের আনন্দ বোধ করছিলাম। প্রাক্তন হলেও ছাত্র হিসেবেই স্বীকৃতি তো পেলাম। তরুণ ছাত্রদের সাথে এক সামিয়ানার নীচে বসে ৫৭ বছর বয়সেও সত্যি তারুণ্য অনুভব করলাম।

হলের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছিল। আমি যেন তাদের মধ্যে নিজের অতীতকে ফিরে পেলাম। ১৯৪৬-৪৭ সালের এ হলেরই জি, এস, এবং ৪৭-৪৮ সালে ডাকসুর জি, এস, এবং পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের জি, এস, হিসেবে হল মিলনায়তন ও কার্জন হলে যেসব অনুষ্ঠান পরিচালনার সুযোগ আমার হয়েছিল সেদিন যেন সে পুরাতন ছবিই নতুন করে দেখলাম। সত্যি সেদিন আমি এতটা ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম যে, গোটা অনুষ্ঠানটি আমাকে অভিভূত করে রেখেছিল।

এমন কিছু পুরনো বন্ধুর সাথে সেখানে দেখা হলো যাদের সাথে এ সুযোগ ছাড়া জীবনে আর দেখা হতো কি না জানি না। বেশ কিছু পরিচিত বিশিষ্ট লোক এমনও পেলাম যারা এ হলের ছাত্র বলে জানা ছিল না। তাদের সাথে নতুন করে পরিচয় হলো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু প্রাক্তন ছাত্রের এমন এক সমাবেশ সেদিন দেখলাম যার স্মৃতি স্থায়ীভাবেই মনে জাগরুক থাকবে। প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতি গঠিত হলে এ ধরনের সমাবেশের আরও সুযোগ হবে। সমিতির প্রস্তাবটি প্রধানত দু'টো কারণে আমার মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রথমত হলের উন্নয়নে এবং ছাত্রদের কল্যাণমূলক কার্যাবলীকে প্রাক্তন ছাত্রদের যথাসাধ্য অংশগ্রহণের মহাসুযোগ হবে। দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন মত, পথ, আদর্শ ও চিন্তার লোকেরা অন্তত একটি মহৎ উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে ভাবের বিনিময় করার সুযোগ পাবে। যাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতেরও কোন সুযোগ হয় না তাঁরা হলকে কেন্দ্র করে এক সাথে

www.icsbook.info

কাজ করারও সুযোগ পাবে, এটা সত্যিই বড় আনন্দের বিষয়। এমন কি রাজনৈতিক কারণেও যারা একে অপর থেকে অনেক দূরে তারাও হলের কল্যাণে একযোগে কাজ করার মাধ্যমে নৈকট্য বোধ করবে।

অনুষ্ঠানে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের বক্তৃতায় এ হলের অতীত গৌরবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার মহান আন্দোলনের গৌরব। ১৯৪৮ সালে এ আন্দোলন ফজলুল হক মুসলিম হল থেকেই শুরু হয়। অনুষ্ঠানে এ বিষয় বক্তৃতা শুনবার সময় আমার চোখের সামনে ঐ সময়কার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কর্মতৎপরতার পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠলো। শ্লোগান দেবার জন্য টিনের তৈরী চুংগা এক একজনের হাতে তুলে দিয়ে ১০-১২ জনের এক একটি দলকে বিভিন্ন এলাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে একটি দল নিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। ভাষা আন্দোলনে এ হলের অগ্রণী ভূমিকা কেউ অস্বীকার করবে না।

ফজলুল হক মুসলিম হলের একটি বড় অবদানের কথা কেউ উল্লেখ করেননি। সেটা হল–সংসদের নির্বাচনের সাথে সম্পর্কিত। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম হল। ফজলুল হক মুসলিম হল এর ১৮ বছর পর শুরু হয়। এ দু'টো হল সংক্ষেপে এস, এম, হল ও এফ, এইচ, হল নামেই ছাত্রদের নিকট পরিচিত। হলের সংসদ নির্বাচনে এস, এম, হলে এমন এক ঐতিহ্য চালু হয়ে যায় যা শিক্ষিত রুচিশীলদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জিলাবাদই (ডিষ্ট্রিক্টিজম) সেখানে নির্বাচনী আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। কুমিল্লা ও নোয়াখালী জিলার ছাত্র এত বেশী ছিল যে, এ দু'জিলার ছাত্র নির্বাচনী ঐক্য গঠন করলে তদানীন্তন পূর্ববংগের সব জিলার ছাত্র মিলেও সংখ্যা লঘুতে পরিণত হতো। যদিও প্রতিভা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের ভিত্তিতেই নির্বাচনের প্রার্থী মনোনীত হতো তবু জিলাবাদের দরুন ঐ মানদন্ড জিলার সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়ে যেতো।

১৯৪০ সালে ফজলুল হক মুসলিম হলের জন্ম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪ সালে বি,এ, ক্লাসে ভর্তি হই এ হলের মাধ্যমে। নোয়াখালী জিলার জনাব নাজমুল করিম (মরহুম ডঃ নাজমুল করিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রফেসার) এ হলের অন্যতম সিনিয়র ছাত্র। ৪৪–৪৫ শিক্ষাবর্ষের হল সংসদের নির্বাচনের শুরুতেই জনাব নাজমুল করিমের নেতৃত্বে জিলাবাদের পরিবর্তে প্রতিভা ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনার আন্দোলনে কুমিল্লা জিলার পক্ষ থেকে আমি উৎসাহের সাথে শরীক হলাম। সে বছরই প্রথম সাফল্যের সাথে জিলাবাদকে উৎখাত করা হয়। জনাব নাজমুল করিম হলের স্পীকার নির্বাচিত হন এবং বরিশালের জনাব মেসবাহ উদ্দিন (অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ

www.icsbook.info

সরকারের সচিব) ভি, পি নির্বাচিত হন। অবশ্য নির্বাচনী যুদ্ধে এ দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী দলে ছিলেন। এরপর আরও ৩টি নির্বাচনে আমি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলাম। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় বিভিন্ন আকর্ষণীয় নামে নির্বাচনী দল গঠিত হতো। এসব দল হল ভিত্তিক ছিল। নির্বাচনের পর ঐসব নামের কোন ব্যবহার হতো না। জিলাবাদের পরিবর্তে এভাবেই নির্বাচন চলতে থাকে। অবশ্য পরবর্তীকালে দেশভিত্তিক ছাত্র সংগঠন গঠিত হওয়ায় ঐসব সংগঠনের নামেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতি চালু হয়। এখন সব হলেই দলভিত্তিক নির্বাচন যুদ্ধ চলে। জিলাবাদ খতম করে নীতি ও কর্মসূচী ভিত্তিতে হলের সংসদ নির্বাচন পরিচালনার মহান ঐতিহ্য এফ, এইচ, হলেরই বিশেষ অবদান।

এফ, এইচ, হলের সাথে মনের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অত্যন্ত সজীব হওয়ায় পরম তৃপ্তিবোধ করেছি এবং আমার হল জীবনকে আবার ফিরে পাওয়ার সুস্বাদ উপভোগ করেছি। এ "হল" এত আপন যে সেখানকার সবকিছুই "আমার দেশের" মতোই প্রিয়। তাই এ হলকে "আমার হল" বলতে গৌরব বোধ করি। এর গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য কিছু করতে পারলে সৌভাগ্য মনে করব। প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতি সুসংগঠিত হলে এ সুযোগ আমার মতো অনেকেই নিতে পারতেন। কিন্তু সমিতির উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন কারণে নিরাশ হয়ে এ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করেন।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

বাংলাদেশের জাতীয়তা

বাংলাদেশের জাতীয়তা

বাংলাদেশের কোন সচেতন দেশপ্রেমিকই জাতীয় আযাদী ও নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। দুনিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যা প্রায় চারপাশ থেকেই একটি মাত্র দেশ দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। একমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের অপর পারে বার্মা রয়েছে। এছাড়া গোটা বাংলাদেশ ভারত দ্বারাই বেষ্টিত। এমনকি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও ভারতের অংশ। সুন্দরবনের দক্ষিণে নতুন গজিয়ে উঠা দ্বীপটি ভারত বিনা বাধায় দখল করার পর ঐ বেষ্টনী আরও মজবুত হলো।

একথা সত্য যে অগণিত উস্কানী সত্ত্বেও বাংলাদেশ ভারতের সাথে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলার চেষ্টা করছে। প্রতিবেশীর সাথে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে রাখা কোন দেশের জন্য কল্যাণকর নয়। বাংলাদেশের আযাদী আন্দোলনে ভারত যে উদ্দেশ্যেই সহায়তা করুক বাংলাদেশী জনগণ একমাত্র আযাদীর উদ্দেশ্যেই ঐ সংগ্রাম করেছিল। তাই কোন অবস্থাতেই তারা আযাদী বিপন্ন হতে দিতে পারে না। ভারতের কুক্ষিগত হবার উদ্দেশ্যে তারা আন্দোলন করেনি।

জাতীয় নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক রয়েছে। ভৌগলিক নিরাপত্তাই প্রধানতঃ সবার নিকট প্রাথমিক গুরুত্ব পায়। কারণ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে কোন রাষ্ট্র যদি ভৌগলিক দিক থেকেই অন্য রাষ্ট্রের দখলে চলে যায় তাহলে সর্বগ্রাসী দাসত্বের পথই সুগম হয়। কিন্তু ইতিহাস থেকে সারা দুনিয়ায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্বের পরিণামেই ভৌগলিক দাসত্ব আসে। কোন জাতি আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আযাদীর হেফাযতে সক্ষম হলে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব সহজে আসতে পারে না। আবার অর্থনৈতিক আযাদী ছাড়া রাজনৈতিক আযাদী ভোগ করাও সম্ভব নয়। কোন সময় রাজনৈতিক ভুলের কারণে বা শক্তিমান কোন বিদেশী বাহিনীর আক্রমণে একটি দেশ তার ভৌগলিক ও রাজনৈতিক আযাদী হারালেও আদর্শিক চেতনা এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীন সত্তার হেফাযতের ফলে ঐ আযাদী ফিরে পাওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু যদি কোন স্বাধীন দেশ অন্য কোন দেশের আদর্শ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহলে

www.icsbook.info

এর পরিণামে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক আযাদী থেকে চিরতরে বঞ্চিত হতে সে বাধ্য। তাই মজবুত সশস্ত্র বাহিনীই দেশের একমাত্র রক্ষাকবচ নয়।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

বাংগালী মুসলমান বনাম বাংগালী জাতি

বাংলাভাষী মানুষ অবাঙ্গালীদের নিকট বাঙ্গালী নামেই পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গের কোন লোক স্থায়ীভাবে দিল্লীতে অবস্থান করলেও তার ভাষাগত পরিচয়ের কারণেই তাকে বাঙ্গালী বলা হয়। যদিও সে ব্যক্তি দিল্লীর উর্দু বা হিন্দীভাষীর মতোই জাতিতে ভারতীয়। লন্ডনে বাংলাদেশী ও পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বাংলাভাষী হিসেবে ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের নিকট বাঙ্গালী বলেই পরিচিত। বুঝা গেল যে, সব বাংলাভাষীই এক জাতিতে পরিণত হয়নি।

পাঞ্জাবী ভাষাভাষী ভারতীয় শিখ ও পাকিস্তানী পাঞ্জাবী মুসলমানের ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও শিখ ও মুসলমান এক জাতীয়তায় বিশ্বাসী নয়। কারণ শুধু ভাষার কারণে কোন জাতি গড়ে উঠে না। জাতিত্বের আসল ভিত্তি যাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে তাদের ভাষাও যদি এক হয় তাহলে জাতীয়তাবোধ অধিকতর মজবুত হতে পারে। কিন্তু ধর্ম, কৃষ্টি ও ইতিহাসের ঐক্যই প্রকৃত জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে। এসব দিক দিয়ে যদি কোন এক জনগোষ্ঠী অপর জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন হয় তাহলে শুধু ভাষার ঐক্য তাদেরকে কখনো এক জাতিতে পরিণত করতে পারে না। এ কারণেই পাঞ্জাবী শিখ ও পাঞ্জাবী মুসলমান এক জাতি নয়। এ একই কারণে বাঙ্গালী মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দু এক জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। তাদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এ পার্থক্যের কারণেই তাদের কৃষ্টি ও জীবন ধারণ পদ্ধতিতে এত অমিল দেখা যায়। ইতিহাসও তাদের এক নয়। বখতিয়ার খিলজির বিজয় ও রাজা লক্ষণ সেনের পরাজয় বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে একই ধরনের আবেগ সৃষ্টি করে না। শাহ জালালের সাথে রাজা গৌর গোবিন্দের সংঘর্ষ উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরিত ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাস করা সত্ত্বেও বাঙ্গালী মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দু কেন এক জাতি নয় এবং বাঙ্গালী হওয়ার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে কেন জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়নি সে কথা ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি দ্বারা বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মুসলমানের পরিচয় ঃ দুনিয়ার প্রতিটি সৃষ্টির যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য যে মহান স্রষ্টা প্রত্যেক সৃষ্টির উপযোগী বিধানের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি অবশ্যই তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জন্যও জীবন বিধান দিয়েছেন। সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধি-বিধানের নামই ইসলাম এবং ইসলামী জীবন বিধান

www.icsbook.info

পালনকারীকেই মুসলিম বলে। মুসলিম শব্দটি আরবী। ফারসী ভাষায় বলা হয় মুসলমান। মুসলমান ঐ ব্যক্তির নাম যে সচেতনভাবে আল্লাহ পাককে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র মনিব হিসেবে এবং রাসূল (সাঃ)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। যে কালেমা তাইয়েবা কবুল করে মুসলমান হতে হয় এ কালেমার মাধ্যমে আসল আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে মেনে নেয়া হয়। এটাই কালেমার মর্মকথা।

একজন অমুসলিম যেমন ঐ কালেমার মাধ্যমে ইসলামী জীবন পদ্ধতি কবুল করে মুসলমান হয়, তেমনি কোন মুসলমান যদি ঐ কালেমা পরিত্যাগ করে তাহলে সে আর মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে না। কাফেরের সন্তান ইসলাম গ্রহণ করলে যদি মুসলমান হয় তাহলে মুসলমানের সন্তান ইসলাম ত্যাগ করলে কেন কাফের হবে না ? সুতরাং মুসলমানিত্ব গ্রহণ ও বর্জনযোগ্য একটা গুণ। কলেজের প্রিন্সিপালের ছেলে বলেই কোন অশিক্ষিত ব্যক্তি যেমন গদিনশীন প্রিন্সিপাল হতে পারে না, তেমন ইসলামী আদর্শ ত্যাগ করে মুসলিম পিতামাতার সন্তানও গদিনশীন মুসলমান বলে গণ্য হতে পারে না।

মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি ঃ যারা ইসলামী জীবন বিধানকে কবুল করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস, সব বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা, তাদের জীবন ও কর্মধারা এক বিশেষ ধরনের ছাঁচে গড়ে উঠে। যারা ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না বা ইসলামী জীবনধারা পালন করতে রাজী নয় তাদের বাস্তব জীবন স্বাভাবিক কারণেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁচে গড়ে উঠে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনল না তারা একই ভাষাভাষী, এমন কি একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবন যাপনেই অভ্যস্ত হয়ে রইল। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করলো তারা তাদের বংশ ও আত্মীয়-স্বজনের জীবনধারা থেকে আলাদা হয়ে গেলো। একই এলাকায়, একই ভাষাভাষী এমন কি একই গোত্রের লোকদের মধ্যে আদর্শ, নীতি ও জীবন বিধানের পার্থক্যের দরুন আরবী ভাষী মুসলমান ও আরবী ভাষী অমুসলমান পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হলো। আবার অন্য ভাষার লোকও ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আরবীভাষী মুসলমানের সাথে মিলে এক জাতি হয়ে গেল। সুতরাং মুসলমানদের জাতীয়তার ভিত্তি হলো একমাত্র ইসলাম। ভাষা, বংশ, বর্ণ ও দেশ মুসলমানদের জাতীয়তার ভিত্তি নয়।

১৯৬৮ সালে একটি ছাত্র প্রতিষ্ঠান ২১ শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে তাদের নিমন্ত্রণ পত্রে উল্লেখ করেছিল যে, "প্রয়োজন হলে আমরা মুসলমানিত্ব ত্যাগ

www.icsbook.info

করতে পারি কিন্তু বাঙ্গালীত্ব পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়।" একথাটা যে মনোভাব নিয়ে বলা হয়েছে তাতে বুঝা যায় যে, বেচারাদের ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই কথাটা বলা হোক কথাটা বাস্তবে সত্য। অর্থাৎ যারা জন্মগতভাবে বাঙ্গালী তারা বাঙ্গালীত্ব পরিত্যাগ করতে বাস্তবেই অক্ষম। বাঙ্গালী মায়ের সন্তান যদি এদেশ ছেড়ে বিলাতে চলে যায় এবং বাংলাভাষায় কথাই না বলে তবুও তার বাংগালিত্ব মুছে যাবে না এবং মাতৃভাষা বদলে যাবে না। সবসময় ইংরেজী বলার অভ্যাস করলেও ইংরেজী তার মাতৃভাষা বলে গণ্য হবে না।

অবশ্য মুসলমানিত্ব এমন এক গুণ বা পরিচয় যা ইচ্ছে হলে গ্রহণ করা যায় এবং ইচ্ছে হলে ত্যাগ করা যায়। তাই তাদের ঐ বক্তব্য ঠিকই। কিন্তু এ দ্বারা যে অর্থ তারা বুঝাতে চায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তারা বলতে চায় যে, বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দরকার হলে মুসলমানিত্ব ত্যাগ করবো। এ জাতীয় মন-মগজ যেসব মুসলিম যুবকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তাদেরকে আমি মোটেই দোষী সাব্যস্ত করি না। তারা অজ্ঞতার শিকার। তাদের চিন্তাধারা মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা নেই বলে তারা অজ্ঞ রয়ে গেছে।

মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতকে বিভক্ত করে যারা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তারা যদি ইসলামের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে মুসলিম যুবকদের মধ্যে এ জাতীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টিই হতো না।

মুসলমানরা যদি ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাস করতো তাহলে হিন্দুরা ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশকে বিভক্ত করতো না। মুসলমানরা যদি দেশ ভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী হতো তাহলে গান্ধি ও নেহেরুর অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাকেই সমর্থন করতো। তাহলে পাকিস্তানের জন্মই হতো না এবং বাংলাদেশ নামে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টিই হতে পারতো না।

যারা বাঙ্গালী জাতীয়তার কথা বলেন তারা একথাটা কি চিন্তা করে দেখেছেন? মুসলমানরা যদি আলাদা জাতি হিসেবে সংগঠিত না হতো তাহলে "বংগদেশ" বিভক্ত হতো না। বর্তমান বাংলাদেশ তখন অখন্ড ভারত রাষ্ট্রের অধীনে পশ্চিম বংগের সাথে মিলে একটি অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশে পরিণত হতো। এ অবস্থা হলে বাংগালী জাতীয়তার প্রবক্তাদের কী দশা হতো? স্বাধীন বাংগালী জাতির দাবী করার কি কোন পথ তখন তালাশ করা সম্ভব হতো?

www.icsbook.info

বাংলাদেশ যে মুসলিম জাতীয়তারই সৃষ্টি একথা ঐতিহাসিক সত্য। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত না হলে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে কোন রাষ্ট্র কোন প্রকারেই অস্তিত্ব লাভ করতে পারতো না। তাই মুসলিম জাতীয়তাবোধ খতম হয়ে গেলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আর মুসলিম জাতীয়তাকে স্বীকার করে নেবার পর আবার বাংগালী জাতীয়তা কী করে বহাল থাকতে পারে ? সুতরাং বাংগালী মুসলমান জাতি হিসেবে মুসলিম জাতি, যদিও বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে তারা বাংগালী, কিন্তু মুসলমানরা বাংগালী জাতি নয়। *(আমার দেশ বাংলাদেশ)*

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক

বাংলাদেশে বর্তমানে (১৯৮৮) প্রায় ১১ কোটি মানুষ আছে। এর মধ্যে প্রায় ১০ কোটি মুসলমান এবং অন্ততঃ এক কোটি অমুসলমান। সংখ্যায় মুসলমানদের তুলনায় কম বলেই তাদেরকে সংখ্যালঘু বলা হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হলো হিন্দু। তাদের সংখ্যা ৭৫–৮০ লাখ হতে পারে। বাকী ২০ লাখের মধ্যে খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও বিভিন্ন উপজাতি রয়েছে।

এখানকার মুসলমানদের সাথে খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় সম্প্রদায় সমূহের সম্পর্ক কোন সময়ই খারাপ ছিল না। অনুন্নত হিন্দুদের সাথেও সম্পর্ক ভালই ছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সে সম্পর্কে যে ভাটা পড়েছিল তা রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই পরিণাম। গান্ধি ও নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস অখন্ড ভারতের পতাকাবাহী হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান আন্দোলন ও ভারত বিভাগের দাবীর ঘোর বিরোধী ছিল। সে সময় ভারত বিভাগের ইস্যুতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক লড়াই চলছিল তার কারণে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে অবশ্যই ফাটল ধরেছিল। ঐ অবস্থায়ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তুলনায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাথেই সম্পর্ক বেশী খারাপ ছিল। কারণ কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বস্তরেই উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাই অধিষ্ঠিত ছিল।

১৯৪৬ সালে কোলকাতা ও বিহারে ব্যাপক মুসলিম হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে মাঝে মাঝে চলতে থাকে। কিন্তু ভারতে অদ্যাবধি মুসলিম হত্যা অবিরাম চলতে থাকা সত্ত্বেও ১৯৫০ সাল থেকে এদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের উপর কোন আক্রমণ করেনি।

বর্তমানে এদেশে বসবাসরত ৮০ লাখ হিন্দু নিশ্চয়ই অনুভব করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের এমন কোন বিরোধ নেই যার কারণে তারা এদেশ

www.icsbook.info

ছেড়ে চলে যাবার চিন্তা করতে পারেন। যাদের যাবার দরকার তারা আগেই চলে গেছেন। এখনও যারা আছেন তারা পুরুষানুক্রমে এ দেশেরই অধিবাসী। মুসলমান জনগণ কোথাও তাদেরকে অপর মনে করছে না। উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে মেলামেশা স্বাভাবিক অবস্থায়ই চলছে। কোন কালে রাজনৈতিক কারণে যে বিরোধ ছিল তা বহু আগেই বিলীন হয়ে গেছে।

এদেশের খৃস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয়দের সাথেকোন কালেই মুসলমানদের সম্পর্ক খারাপ ছিল না। সংখ্যায় তারা অনেক কম বলে তাদের সাথে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিরোধ সৃষ্টির কোন কারণও ঘটেনি। সংখ্যালঘুদের মধ্যে হিন্দুরাই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করায় তাদের সাথে যেটুকু বিরোধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল তা হিন্দু সম্প্রদায় পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এ বিরোধটুকুও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সৃষ্টিই হয়নি।

একথা জোর দিয়েই বলা চলে যে, বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন বিরোধ নেই যার ফলে কোন রকম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে পারে। এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার কোন আশংকাও দেখা যায় না। যার ফলে তারা এদেশ থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চিন্তা করতে পারে। বাংলাদেশের পাশেই আসামে গত কয়েক বছর থেকে ব্যাপক মুসলিম গণহত্যা চলা সত্ত্বেও এবং ভারতের বহু প্রদেশে ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জতের উপর এত ঘন ঘন হামলা হওয়া সত্ত্বেও এদেশের মুসলমানরা এখানকার হিন্দুদের উপর এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা না করায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশের মুসলমান জাতি অন্তত এ ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা মেনে চলতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সমস্যা বলে কোন সমস্যার অস্তিত্ব নেই। এখানে হিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান-বৌদ্ধ ও উপজাতীয়দের সবাই পরস্পরের দেশীয় ভাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের একদল সন্ত্রাসবাদী লোক বিদেশী অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা পেয়ে ওখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শান্তির নামে যে অশান্তি জিইয়ে রেখেছে তা নিতান্তই ঐ এলাকার একাংশেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হলে অচিরেই এ সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

এপার বাংলা ওপার বাংলা

এক সময়ে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল "এপার বাংলা ওপার বাংলা" শ্লোগানটিকে জনপ্রিয় করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তখন বাংলাদেশের পাসপোর্টেও নাগরিকত্বের পরিচয় ছিল বাংগালী। ১৯৭৫ এর পর এ ব্যাপারে নতুন করে চেতনা জাগ্রত হয় এবং এর ফলে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশী নাগরিকত্বই এদেশীয়দের পাসপোর্টে স্থান লাভ করে।

একথা ঠিক যে, পশ্চিম বংগের জনগণের ভাষাও বাংলা। কিন্তু একমাত্র ভাষাই যদি জাতীয়তার ভিত্তি হতো তাহলে অবিভক্ত বাংলা বিভক্ত হতো না। আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার ভাষা ইংরেজী হওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের সাথে মিলে একজাতি হয়ে যায়নি। তাদের মধ্যে ধর্মের মিল থাকা সত্ত্বেও ভাষার ভিত্তিতে একজাতি বলে তারা পরিচয় দেয় না।

পশ্চিম বঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম-সংস্কৃতি, পোশাক, ইতিহাস-ঐতিহ্য, এমন কি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের এত পার্থক্য রয়েছে যে, শুধু ভাষার ঐক্য ঐ পার্থক্য সামান্যও কমাতে সক্ষম নয়। সুতরাং ওপার বাংলার সাথে এপার বাংলার জাতিগত মিল তালাশ করে পাওয়ার উপায় নেই।

পশ্চিম বংগের নাম পরিবর্তন করে "বাংলা" নাম দেবার চেষ্টা নাকি চলছে। এটা তাদের ইচ্ছা। এতে আপত্তি করার কোন অধিকার বা প্রয়োজন আমাদের নেই। যদি এ নাম রাখার চেষ্টা সফল হয় তাহলে ওপারে বাংলা আর এপারে বাংলাদেশ থাকবে। উভয় পারে "বাংলা" আর কখনও হবে না।

পূর্ব বংগ নামে যখন কোন এলাকা নেই, তখন পশ্চিম বংগ নামটা অর্থহীনই বটে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় পূর্ব বংগ ও পশ্চিম বংগ নামে সেকালের 'বংগদেশ'কে বিভক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে পূর্ব বংগের নাম পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার পরই পশ্চিম বংগ নামটি অবান্তর হয়ে যায়। তবুও এ নাম তারা এখনও বদলাননি। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের কিছু বলার নেই।

পশ্চিম বংগের সাথে অবশ্যই আমাদের প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক রয়েছে। এপার ও ওপারের বহু মানুষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উভয় এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বিপুল সংখ্যক লোক রোজই আসা যাওয়া করে। এ যাতায়াত যতটা সহজ করা হয় মানবিক দিক দিয়ে ততই মঙ্গল।

উভয় অঞ্চলের মধ্যে সাহিত্যের মাধ্যমে সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। সার্থক সাহিত্য রাষ্ট্রীয় সীমায় আবদ্ধ থাকে না। যদি ইংরেজী ও উর্দু সাহিত্য

www.icsbook.info

এদেশের সাহিত্যামোদীদের পিপাসা মিটাতে পারে তাহলে এ উভয় এলাকার সফল বাংলা সাহিত্য-কর্ম উভয় দেশের পাঠক পাঠিকাদের নিকট আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। কোলকাতার যেসব অপ-সাহিত্য এখানে ছড়াচ্ছে এর জন্য এখানকার কুরুচি বিশিষ্ট পাঠকরাই দায়ী। এর জন্য সাহিত্য দায়ী হতে পারে না। দুগর্ন্ধময় বস্তু এক শ্রেণীর জীবনকে অবশ্যই আকৃষ্ট করে থাকে। সে সব সাহিত্য পদবাচ্য নয়। সত্যিকার সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ বই পুস্তকের আদান-প্রদান উভয়কেই সমৃদ্ধ ও উপকৃত করতে পারে।

উভয় অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হতে পারে। উভয় দেশের সীমান্তে দূর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় যে বেআইনি ব্যবসা চলছে তা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক। উভয় দেশের পণ্য নিজ নিজ দেশের চাহিদা মোতাবেক আমদানী ও রফতানীর জন্য সরকারী ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। পণ্য পাচারের জঘন্য ব্যবসার পরিবর্তে বৈধ ব্যবসা উভয়ের অর্থনীতিকে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সত্তা। প্রতিবেশী হিসেবে পশ্চিম বংগের সাথে সব রকম বৈধ সম্পর্কই থাকা উচিত। কিন্তু এপার বাংলা ওপার বাংলা শ্লোগান যে কুমতলবে দেয়া হয়েছিল তা এখন একেবারেই অর্থহীন।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের পটভূমি ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ

পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের কুশাসন, ইসলামের নামে অনৈসলামী কার্যকলাপ, গণবিরোধী নীতি ও রাজনৈতিক সমস্যার সাময়িক সমাধানের অপচেষ্টার ফলে এদেশের জনগণের মধ্যে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, সে সুযোগে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের বাহকগণ বাংলাদেশ আন্দোলনকে এমন খাতে পরিচালনার ব্যবস্থা করে যার ফলে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে দ্বীন-ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতই নিছক পূজাপাঠ জাতীয় এবং ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ ধর্মে পরিণত করার অপচেষ্টা চলে। 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উৎখাত করা হয়। পত্র-পত্রিকায় দাউদ হায়দার জাতীয় ধর্মদ্রোহীদের লেখা ও কবিতায় মুসলমানদের প্রাণাধিক প্রিয় নবী (সাঃ) সম্পর্কে চরম আপত্তিকর কথা পর্যন্ত প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান তখন এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তারা এ কঠিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এভাবেই মুসলিম চেতনাবোধ অনৈসলামী শক্তির বিরুদ্ধে দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৭৫-এর

www.icsbook.info

আগষ্ট বিপ্লব এবং ৭ই নভেম্বরের সিপাহী-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ইসলামী জাগরণ বাংলাদেশের আদর্শিক পটভূমিকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়। এরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ক্রমে ক্রমে চরম ধর্মবিরোধী শাসনতন্ত্রের ধর্মমুখী সংশোধন চলতে থাকে। বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমি যে ভাবেই রচনা করার চেষ্টা হোক না কেন, বর্তমানে ইসলামের নৈতিক শক্তি এতটা মযবুত যে, মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের মুসলিম জনতা এখন আর অবহেলার পাত্র নয়। ইসলামের ভবিষ্যত অন্য কোন মুসলিম দেশ থেকে এখানে যে কম উজ্জল নয় একথা ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট হচ্ছে। সরকারী পর্যায়ে ইসলাম যে অবস্থাতেই থাকুক, এদেশের কোটি কোটি মুসলিমের সামগ্রিক চেতনায় ইসলামের প্রভাব ক্রমেই যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

১৯৭০ সালে জনগণ যাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিলেন, তাদেরকে গণ-অধিকার আদায়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম জাতীয়তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদেরকে দেয়া হয়নি। সুতরাং যখন জনগণ দেখল যে, তাদের অধিকার আগের চেয়েও খর্ব করা হয়েছে এবং জনসাধারণকে সরকারের গোলামে পরিণত করা হচ্ছে, এমন কি মুসলিম জাতীয়তাবোধকে পর্যন্ত ধ্বংস করা হচ্ছে, তখন সবাই চরম নৈরাশ্য ও ভীষণ অস্থিরতা বোধ করলো। এরই ফলে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট দেশের প্রেসিডেন্ট হত্যার মতো ঘটনার দিনটিকে জনগণ এত উৎসাহের সাথে মুক্তির দিন হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)

www.icsbook.info

বাংলাদেশের স্বাধীনতা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা

স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার। মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের স্বার্থে বা ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রভাবে সে স্বাধীনতা থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে। মজার ব্যাপার হলো এই যে, স্বাধীনতার নামেই মানব জাতিকে পরাধীন করার চেষ্টা চলে। চিরকাল মানুষ এ স্বাধীনতার জন্য বহু কুরবানী দিয়েছে, যেহেতু স্বাধীনতাই শ্রেষ্ঠতম অধিকার, সেহেতু এ অধিকার হাসিল করার জন্য মানুষ আর সব অধিকার কুরবানী দিয়েও সংগ্রাম করা প্রয়োজন মনে করে।

স্বাধীনতার সাধারণ সংজ্ঞা ঃ বিদেশী লোকের শাসনমুক্ত হওয়াকেই সাধারণত স্বাধীনতা বলা হয়। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্তও পৃথিবীর অনেক দেশকে সামরিক শক্তিবলে দখল করে রেখেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অধীনস্ত দেশগুলো দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে এবং ত্যাগ তিতিক্ষার পরিণামে গোলামীর অক্টোপাস থেকে মুক্তি লাভ করে। এভাবে তারা সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা পায়।

স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক সংজ্ঞা ঃ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র বিদেশীদের শাসনমুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। দেশী স্বৈরাচারী শাসন কিংবা একনায়কত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার জন্য মানুষকে আবার নতুন করে সংগ্রাম চালাতে হয়। স্বাধীনতা তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে যখন জনগণ এ স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে অক্ষম হয়। আর জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে যাবতীয় অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেলেই মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারে।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির সংগ্রামের চাইতে দেশী স্বৈরাচারী শাসকের কবল থেকে মুক্তি লাভ করা কম কঠিন ও কম কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

স্বাধীনতার ইসলামী সংজ্ঞা ঃ ইসলাম মনে করে বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি কিংবা দেশী লোকের শাসন হলেই প্রকৃত স্বাধীনতা হয় না। মানুষের মনগড়া যাবতীয় বিধি-বন্ধন থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ সত্যিকারভাবে স্বাধীন হয় না।

www.icsbook.info

একমাত্র আল্লাহর বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব খতম হওয়া সম্ভব। আল্লাহর দেয়া আইন জনগণের সঠিক প্রতিনিধিদের দ্বারা জারি করাতে পারলেই সম্পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে জনগণ তাদের মৌলিক অধিকার পেতে পারে, তথা স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে।

স্বাধীনতার আন্দোলন ঃ ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতার সূর্য যে অস্তমিত হলো তা প্রায় দু'শ বছর যাবত অস্তমিতই রয়ে গেল। এর মধ্যে অগণিত স্বাধীনতাকামী মানুষ বুকের তাজা রক্ত ঢেলেছে। কত মা-বোন ইজ্জত দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অতপর ১৮৮৭ সালে জন্ম নিল নিখিল ভারত কংগ্রেস। ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদেরই অংশ হিসেবে বাংলার মুসলমানরাও মনে করেছিল যে, কংগ্রেসের সাথে মিলেই তাদের স্বাধীনতা আসবে। বাংলার মুসলমানদের এ স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই রয়ে গেল। তারা দেখল অনেক বঞ্চনার পর পূর্ব বাংলার মানুষদের কিছুটা সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালে যে প্রদেশ গঠন করা হল কংগ্রেস তা বানচাল করে ছাড়ল। কারণ এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান এবং এ সুবিধা মুসলমানরাই ভোগ করবে বেশী। সুতরাং কংগ্রেস বংগভংগের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯১১ সালে বংগ ভংগ রদ হয়ে গেল মুসলমানদের স্বপ্ন ভাংলো। মুসলমানদের স্বপ্ন ভাংগার ফলে মুসলিম লীগের মাধ্যমে শুরু হলো পৃথক আন্দোলন। সে আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালে জন্ম নিল পাকিস্তান। কিন্তু এদেশের জনগণ ইংরেজ ও কংগ্রেস থেকে স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বেও প্রকৃত আযাদী পেল না। শাসন ক্ষমতায়, অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্ব না পাওয়ায় তারা ইংরেজদের থেকে মুক্তির ২৫ বছর পর স্বাধীনতা লাভের আশায়ই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়া প্রয়োজন মনে করল।

স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ ঃ স্বাধীনতার সাধারণ সংজ্ঞানুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশ এখন এদেশবাসী দ্বারাই শাসিত।

গণতান্ত্রিক সংজ্ঞানুযায়ী স্বাধীনতা লাভের দেড় যুগ পর এখনও গণতন্ত্রের সামান্য সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে। অগণতান্ত্রিক শক্তির মোকাবেলায় গণতন্ত্রের অগ্রগতি সম্ভব হলে জনগণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

স্বাধীনতার ইসলামী সংজ্ঞা মোতাবেক স্বাধীনতা আরো বহু দূরে। দেশে গণতন্ত্র স্থিতিশীল হলে তবেই মানুষ নিজ স্বাধীন ইচ্ছায় প্রচলিত মানবরচিত

www.icsbook.info

মতাদর্শ পরিত্যাগ করতে পারে। কারণ এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম চায় এবং সত্যিকার গণতন্ত্র এলে শাসকগণ জনগণের আশা-আকাঙ্খা অগ্রাহ্য করতে পারবে না। তখন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষকে আল্লাহ কারো গোলাম হিসেবে পয়দা করেন না বরং মানুষই মানুষকে দাসে পরিণত করে। তাই আল্লাহ পাক নবীগণকে পাঠিয়েছেন সকল প্রকারের দাসত্বকে অস্বীকার করে কেবল আল্লাহর দাসত্বের দিকে মানুষকে আহবান করার জন্যে। সকল নবীর একই আহবান ছিল—"হে আমার দেশবাসী, একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী আর কেউ নেই।"

বর্তমানে আমাদের দেশের মাটি স্বাধীন হয়েছে মাত্র। দেশের মানুষ সাধারণ সংজ্ঞানুযায়ী স্বাধীন হলেও গণতান্ত্রিক সংজ্ঞায় এখন পর্যন্ত স্বাধীন হয়নি। আর ইসলামী সংজ্ঞানুযায়ী স্বাধীনতা যে কত দূরে আছে তা ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত তারাই উপলব্ধি করতে সক্ষম।

প্রকৃত স্বাধীনতা ঃ ব্যক্তিস্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা। ব্যক্তির ইজ্জত-আব্রু বজায় রাখা, তার আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় কাজের সুযোগ দেয়া ; তার পছন্দমতো পেশা গ্রহণের অধিকার দান ; তার অর্জিত সম্পদের মালিকানা স্বীকার করা; তার ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এমন মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন যা প্রত্যেক মানুষের প্রাণের দাবী। এ দাবী পূরণের জন্যেই স্বাধীনতার প্রয়োজন। পরাধীন মানুষ এসবের নিশ্চয়তা বোধ করে না। ব্যক্তির বিকাশের জন্য এসবই দরকার। দেশ স্বাধীন হবার পরও যদি এ জাতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা কপালে না জোটে তাহলে এমন স্বাধীনতা দিয়ে মানুষের কি প্রয়োজন ? পরাধীন থাকাকালে যতটুকু ব্যক্তি-স্বাধীনতা এদেশের মানুষ ভোগ করেছে সেটুকু কি এখন তারা পাচ্ছে ?

স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হয়েও কি আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি ? আমাদের দেশে যারা কাবুল ষ্টাইলে বিপ্লব ঘটাতে চান, যারা মার্কিন, ভারত কিংবা রাশিয়ার মতাদর্শ এদেশে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছেন কিংবা এদেশে ঐ সকল দেশের স্বার্থে কাজ করছেন তাঁরা কি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী কাজ করছেন না ?

যেহেতু কোন দেশের মাটি স্বাধীন হওয়াই স্বাধীনতার মূল কথা নয়, সেহেতু স্বাধীনতার দীর্ঘ ১৮ বছর পর আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে

www.icsbook.info

আমরা জনগণকে কতটুকু স্বাধীনতা দিতে পেরেছি। বয়োবৃদ্ধ প্রবীন লোকেরা যাঁরা বৃটিশের যুগে যুবক কিংবা কিশোর ছিলেন, তাঁরা বলে থাকেন ইংরেজ আমলে তাঁরা আর্থিক প্রাচুর্যে ছিলেন, সুখ-সমৃদ্ধিতে ছিলেন, এমনকি পাকিস্তান আমলেও তারা আজকের তুলনায় অনেক শান্তিতে ছিলেন। একথা তাঁরা এজন্য বলেন না যে, তাঁরা আবার বৃটিশ কিংবা পকিস্তানের শাসনে ফিরে যেতে চান বরং তাঁরা এজন্য বলেন যে, তাঁরা স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজে পেতে আগ্রহী। তাঁরা চান জীবনের নিরাপত্তা, তাঁরা চান খাদ্যাভাব ও চিকিৎসার অভাব থেকে বাঁচতে। তাঁরা চান শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে ঈমানের সাথে বাঁচতে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার সেই তাৎপর্য আছে কি ? আর যদি না থাকে তবে নিছক মাটির স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা কি সম্ভব ? আমাদের দেশে কোন প্রকার বিপদ এলেই আমরা বিদেশের প্রতি ভিক্ষার হাত বাড়াতে বাধ্য হই। আমাদের বিপদের সুযোগে বিদেশীরা আমাদের সাহায্যের নামে এলে আমরা তাদের সামনে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাজির হই। এ অবস্থায় বিদেশীরা তাদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও চরিত্র এদেশে চালুর সুযোগ পেলে এ মাটির স্বাধীনতাটুকু কি রক্ষা পাবে ? এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের স্বাধীনতা কি রক্ষা করতে সমর্থ হবো ?

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ১৯৪৭ সালে একবার এবং ১৯৭১ সালে দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দু' দু' বার স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছি না তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

দেশ শাসনের ক্ষমতা বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে কেড়ে এনে দেশী লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখাকেই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য মনে করার ফলেই আমরা আজও সত্যিকার স্বাধীনতা পাইনি। শুধু নেতিবাচক উদ্দেশ্য কোন স্থায়ী সুফল এনে দিতে পারে না। দেশকে কিভাবে গড়া হবে, দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো কিরূপ হবে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় তাদের ইতিবাচক কর্মসূচীই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দু'টো স্বাধীনতা আন্দোলনের বেলায়ই ঐ ইতিবাচক ভূমিকার অভাব ছিল। নেতৃবৃন্দ অবশ্য জনগণের মুখে কিছু ইতিবাচক শ্লোগান তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে অনুযায়ী মন-মগজ ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী গঠন করা হয়নি বলেই স্বাধীনতার আসল উদ্দেশ্য লাভ করা সম্ভব হয়নি। এরই ফলে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতাই

www.icsbook.info

আমাদের দেশে জাতীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ সংক্রমিত হয়ে পড়েছে।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের প্রতিবেশী

প্রায় সব দেশেরই আশেপাশে বিভিন্ন রাষ্ট্র রয়েছে। কোন কোন দেশের চার পাশে অনেক কয়টি দেশও আছে। বাংলাদেশের প্রায় চার পাশে ভারতই একমাত্র রাষ্ট্র। বার্মাও অবশ্য আমাদের সীমান্তে অবস্থিত। কিন্তু বার্মার সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রেখা খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু গোটা সীমান্ত জুড়ে আছে ভারত। এমনকি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও ভারতেরই অন্তরভুক্ত। সে হিসেবে বলতে গেলে ভারতই বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। প্রতিবেশী নিকটবর্তী বলে তার সাথে পণ্য বিনিময় সুলভ হওয়াই স্বাভাবিক। আমদানির ও রফতানির সঠিক পরিবেশ বহাল রাখার উদ্দেশ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ থাকা প্রয়োজন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকলে অশান্তি ও অস্থিরতা উভয় দেশের জনগণের মধ্যেই বিরাজ করে। এ অবস্থাটা কারো জন্যেই মঙ্গলজনক নয়। এ মহাসত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথেই হয়ে থাকে। সম্পর্ক থাকলেই সংঘর্ষের কারণ ঘটে। দূরবর্তী রাষ্ট্রের সাথে সংঘর্ষের সুযোগ কমই হয়।

সাধারণত দেখা যায় যে, শক্তিমান প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিবেশীর সাথে ভাল আচরণ করে না। একথা ব্যক্তি জীবনে যেমন সত্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও সমভাবে প্রচলিত কুপ্রথা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত এদেশের সাথে ভারতের আচরণ এতটা আপত্তিকর যে, স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের ব্যাপারে ভারতের সাহায্য সহায়তাকেও জনগণ বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করতে বাধ্য হয়েছে।

পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলের সাথে ভারতের যে ব্যবহার তা বন্ধু সুলভ না হওয়া কতকটা স্বাভাবিক বলা চলে। অখন্ড ভারতমাতা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হওয়া হিন্দু ভারতের পক্ষে খোলা মনে মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তাই

www.icsbook.info

ভারতমাতার ব্যবচ্ছেদকারী দেশ হিসেবে সে সময়কার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা তাদের জন্য অস্বাভাবিক ছিল না।

কিন্তু ভারতের ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী আদর্শের অনুসারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হবার পরও ভারতের নিকট কোন সম্মানজনক ব্যবহার না পাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ইন্দিরা গান্ধী আশা করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যে যে দেশটি একটি পৃথক সত্তা লাভ করল সে দেশ তাঁর আধিপত্য বিশ্বস্ততার সাথেই মেনে চলবে। যারা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের আধিপত্য মানতে রাজী ছিল না তারা হিন্দু ভারতের আধিপত্য সহ্য করবে বলে ধারণা করা যে ইন্দিরা গান্ধীর কতবড় ভুল ছিল তা অল্পদিনের মধ্যে তিনি টের পেলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টের অধিবেশনে দর্পভরে ঘোষণা করেছিলেন যে, "টু নেশান থিউরীই বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে"। একথাটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি হয়তো আশা করেছিলেন যে, তার ভারতমাতাকে যে টু নেশান থিউরী ত্রিখন্ডিত করেছে তা খতম হয়ে যাবার পর বাংলাদেশ কালক্রমে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের জনগণকে চিনতে তিনি বিরাট ভুল করেছিলেন বলেই এমন দুরাশা তিনি করতে পেরেছিলেন। টু নেশান থিউরীই যে বাংলাদেশের আসল ভিত্তি সে কথা তিনি ভুলে গেলেন কী করে ? ভারত বিভক্ত না হলে বাংলাদেশের জন্ম কী করে হতো ? বাংলাদেশের ভবিষ্যত অস্তিত্বও টু নেশান থিউরীর উপরই নির্ভরশীল।

১৯৭৫ সালের আগষ্টে টু নেশান থিউরী যেন নবজীবন লাভ করল এবং ভারতের আধিপত্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার মহাউল্লাস জনগণকে স্বাধীনতার নব চেতনা দান করল। ৭৫-এর ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতা আরও বলিষ্ঠভাবে টু নেশান থিউরীর প্রদর্শনী করল। সুতরাং পাকিস্তান আমলে এদেশের প্রতি ভারত যে মনোভাব পোষণ করতো তা এখনও যথাযথই বহাল আছে। বরং 'অকৃতজ্ঞ' বাংলাদেশের প্রতি সে বিরূপ মনোভাব আরও বিক্ষুব্ধ রূপ লাভ করেছে।

ফারাক্কা বাঁধের ফলে অর্ধেক বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ একতরফাভাবে দখলের মাধ্যমে ভারতের আগ্রাসী মনোবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটেছে। বেরুবাড়ী হস্তান্তর করে ভারতকে দিয়ে দেয়া

www.icsbook.info

সত্ত্বেও চুক্তি অনুযায়ী কয়েকটি ছিট মহল না দিয়ে ভারত চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। সামান্য তিন বিঘা করিডোর নিয়ে ভারত যে ক্ষুদ্রমনার পরিচয় দিয়েছে তা বিস্ময়কর।

গঙ্গার পানি বৃদ্ধি করে ফারাক্কার ছোবল থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য নেপাল ও বাংলাদেশের যৌথ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভারত চরম হঠকারিতার প্রদর্শনী করেছে। গঙ্গার পানি নিয়ে বছরের পর বছর উভয় সরকারের যে প্রহসনমূলক বৈঠক চলছে তা এদেশের জনগণের মনকে বিষিয়ে তুলেছে। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত ভারতের সামান্য সদিচ্ছার পরিচয়ও পাওয়া যায়নি। গঙ্গার পানি কুক্ষিগত করে এখন ব্রহ্মপুত্রের পানিরও দাবী করা হচ্ছে কায়দা করে।

বাংলাদেশ ভারতের সাথে সামান্য তিক্ততাও সৃষ্টি করতে চায় না। তাই গঙ্গার পানি ন্যায্য হিস্যা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে আদায় না হওয়ায় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ এ বিষয়টা জাতিসংঘের দরবারে পেশ করেছিল। সারা দুনিয়াকে শুনিয়ে ভারত জাতিসংঘে ওয়াদা করেছিল যে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা দ্বারাই এর মীমাংসা করা হবে। জাতিসংঘ থেকে সেদিন এ মামলা তুলে নিয়ে বাংলাদেশ সরকার দুর্বলতারই পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় বলেই তা করেছে।

এ জাতীয় চরিত্রের বিশালদেহী প্রতিবেশী দ্বারা ঘেরাও থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ কিভাবে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে তা এদেশের জন্য এক বিরাট সমস্যা। ভারতের জনগণের সাথে প্রতিবেশী সুলভ মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাংলাদেশ অত্যন্ত আগ্রহী। কিন্তু একতরফাভাবে কী করে সে ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে ? ভারতে যদি কোন দিন এমন কোন সরকার কায়েম হয় যারা 'বীগ ব্রাদার' মনোভাব ত্যাগ করবে কেবল তখনই সুসম্পর্ক কায়েম হতে পারে। *(আমার দেশ বাংলাদেশ)*

বাংলাদেশের সম্ভাব্য আক্রমণকারী

পৃথিবীর বড় রাষ্ট্রগুলোর ভয়ে আজ ছোট দেশগুলো আতংকগ্রস্ত। দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আমরা এর বাস্তব নযির দেখতে পাই। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক কালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এমন একটা রাষ্ট্র যার আযাদী এবং নিরাপত্তা যে কোন সময়ে বিপন্ন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এ হামলা কোন্ দিক থেকে আসতে পারে ?

সরাসরি (সম্ভাব্য) হামলাকারী কে হতে পারে ঃ এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমত প্রত্যেকেই একথা বলবেন যে, একমাত্র পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্র দ্বারাই এ কাজ

www.icsbook.info

সম্ভব। দূরবর্তী কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এ কাজ আদৌ সম্ভব নয়। এদিক থেকে বিচার করলে একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই এ আক্রমণ আসতে পারে। বাংলাদেশের সম্পূর্ণ পশ্চিম ও উত্তর সীমান্ত এবং পূর্বদিকে আসাম পর্যন্ত ভারত বিস্তৃত। এমনকি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও ভারতের। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশের জলপথ, স্থলপথ ও আকাশপথ ভারতের দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমরা একথা বলছি না যে, ভারত আক্রমণ করে বসবেই। কিন্তু একথা অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই যে, আমাদের দেশ যেহেতু সাড়ে তিন দিক থেকেই ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত সেহেতু ভারতের পক্ষ থেকে আক্রমণ হওয়াই স্বাভাবিক বা সম্ভব।

অন্যদিকে বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে সীমান্তে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বার্মার বর্ডার রয়েছে। এ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আক্রমণ আসতে পারে কি না এটাও প্রশ্নের বিষয়। এ আগ্রাসনটা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করবে বার্মার সাথে অন্য কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সহযোগিতা করে কিনা তার উপর। কারণ বার্মার একার পক্ষে এ কাজ সম্ভবও নয়, স্বাভাবিকও নয়। বৃহৎ কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র এ কাজ করলে তবেই বার্মা এ উদ্যোগে শরীক হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ভারতের সম্মতির প্রয়োজন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বাংলাদেশের আযাদী হরণ করার জন্য সরাসরি হামলা যদি কেউ করে তবে সে ভারত।

কোন্ বৃহৎ শক্তি হামলা করতে পারে ঃ কোন বৃহৎ শক্তি যদি বাংলাদেশের প্রতিবেশী কোন দেশের সহযোগিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় তবে তিনটি বড় বড় রাষ্ট্রই এ কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন। প্রথমে আমেরিকার কথা ধরা যাক। ভৌগলিক দিক দিয়ে সরাসরি এদেশ দখল করার সুযোগ সে দেশটির নেই। বরং যুক্তরাষ্ট্রকে এ কাজ করতে হলে তাকে এদেশের অভ্যন্তরে এমন এজেন্ট পেতে হবে যার সহযোগিতায় সে বাংলাদেশের উপর পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব করতে পারে। অতপর আসে চীনের কথা। এদেশটি সম্পর্কে এখনও এ ধারণা সৃষ্টি হয়নি যে, সে ভৌলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশকে দখল করার চেষ্টা করবে। সুতরাং বাকী থাকে রাশিয়া। রাশিয়ার অতীতের এ জাতীয় বহু কার্যকলাপ বাদ দিলেও অতি সম্প্রতি সে জোট নিরপেক্ষ একটা স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম দেশ আফগানিস্তান দখল করার হীন চেষ্টা করেছে।

রাশিয়া কর্তৃক বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে সম্ভাব্য দু'টো পথে হতে পারে। প্রথমত, ভারতের মধ্য দিয়ে, দ্বিতীয়ত, বার্মার মাধ্যমে। রাশিয়া ভারতের মধ্য দিয়ে এদেশে আক্রমণ করতে চাইলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ করতে পারবে না যতক্ষণ না ভারত এ কাজে রাযী হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের নিজের

www.icsbook.info

স্বার্থেই সে রাশিয়াকে এ সুযোগ দিতে পারে না। অন্য দিকে কমুনিষ্ট রাশিয়া যদি সমাজতান্ত্রিক বার্মার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে চায় সে ক্ষেত্রেও ভারতের সম্মতির প্রয়োজন দেখা দিবে। কারণ প্রায় সাড়ে তিন দিক ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত একটা দেশে ভারতের অসম্মতিতে আক্রমণ চালানো স্বাভাবিক নয়।

সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে সরাসরি একমাত্র ভারতের দ্বারাই হতে পারে। একথা যদি স্বীকৃত হয় তাহলে বলতে হবে আমাদের নিরাপত্তার উপর হামলা কেবল ভারতের দিক থেকেই আসতে পারে বা ভারতের সমর্থনেই হতে পারে।

ভারতীয় হামলার প্রকৃতি কি হতে পারে ঃ একথা ঠিক যে, আজকাল বিশ্বজনমত (World Opinion) বলতে একটা কথা আছে। সে কারণেই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রতি সরাসরি আক্রমণের সম্ভাবনা কম। তাই আধুনিক যুগে কোন দেশে হামলা চালাতে হলে সে দেশে এমন তাবেদার সরকার বসাতে হয়, যে অন্যের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং প্রয়োজনে আক্রমণ করবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাবে। এভাবেই বিদেশী শক্তি কোন দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে। আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসন এভাবেই হয়েছে। সে জন্যই বাংলাদেশে এমন সরকার হওয়া কোন মতেই সমীচীন নয় যার উপর জনগণের মনে সন্দেহ হয় যে, ঐ সরকারের নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে (দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নয়) ভারত ডেকে আনতে পারে। *(আমার দেশ বাংলাদেশ)*

বাংলাদেশের আযাদী রক্ষা

স্বাধীনতা প্রধানত মনোবলের উপরই নির্ভরশীল। মনের দিক দিয়ে অধীন হলে ভৌগলিক স্বাধীনতা কোনভাবেই টিকতে পারে না। সে সব লোকই প্রকৃতপক্ষে জীবন দিয়ে হলেও স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, যারা মনের দিক থেকে স্বাধীন।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, একমাত্র ভারতের পক্ষ থেকেই স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার যথার্থ রক্ষক তারাই হতে পারে যারা ভারতের প্রতি কোন প্রকার দুর্বলতা পোষণ করে না।

ঐ সকল লোকদের মধ্যে সবচাইতে পয়লা নম্বরে গণ্য হবে তারাই যারা এদেশে কুরআনের বিধান ও রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শে সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। এরাই ভারতের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মানসিকতার

www.icsbook.info

অধিকারী। কারণ তারা জানে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বহাল না থাকলে তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই তারা ভারতের প্রভাব বলয় থেকে বাইরে থাকবে. এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং স্বাধীনতার প্রথম শ্রেণীর রক্ষক তারাই। কারণ এ সকল লোকেরা দ্বীনের প্রয়োজনেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাকে ফরজ মনে করে। অন্য কথায় স্বাধীনতা রক্ষা তাদের নিকট ধর্মীয় কর্তব্য ও ঈমানী দায়িত্ব।

স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষকদের মধ্যে তারাও অবশ্য গণ্য হতে পারে যারা ঐতিহাসিক কারণেই হিন্দু প্রধান ভারতের প্রাধান্য স্বীকার করতে কোন অবস্থাতেই রাজী নয়। মুসলমানরা ছিল এদেশে শাসকের জাতি। গোটা উপমহাদেশে তারা শত শত বছর ধরে শাসন করেছে। ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অমুসলিমদের সহায়তায় দু'শ বছর মুসলামনদের গোলাম বানিয়ে রাখে। ঐতিহাসিক কারণেই মুসলমানরা হিন্দু কংগ্রেসের অধীনতা মানতে রাজী হতে না পারায় ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী গৃহীত হয়। অতপর ১৯৪৭ সালে এলো পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়েও বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন রাষ্ট্র রয়ে গেল। যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হবার সাথে সাথে বংগদেশও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল সে দ্বিজাতিতত্ত্ব বতর্মানে আরও মজবুতভাবেই এদেশে বহাল রয়েছে।

এদেশে যারা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নন তারা পশ্চিম বাংলা তথা ভারত থেকে বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা কিভাবে টিকিয়ে রাখবেন ? তাদের দ্বারা তা সম্ভব নয় বলেই মুসলিম জাতীয়তায় বিশ্বাসীরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষক।

যারা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নয়. যাদের নিকট ধর্মের কোন গুরুত্ব নেই. যারা মুসলিম অমুসলিম মিলে এক জাতিতে বিশ্বাসী যারা বাংলাদেশের বাইরের বাংগালীদের সাথে মিলে এক বাংগালী জাতি গঠনে আগ্রহী. এদেশে কোন রাজনৈতিক হাঙ্গামা হলে যারা ভারতে আশ্রয় নেয়. যারা মনে করে যে. বাংলাদেশ ছাড়াও তাদের নিরাপদ স্থান আছে. এ বাড়ীটাই যাদের একমাত্র বাড়ী নয়. তাদের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিরাপদ হতে পারে কি ?

বলিষ্ঠ সরকার চাই ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন বলিষ্ঠ সরকার ছাড়া দেশের আযাদী নিরাপদ হতে পারে না। আমাদের দেশে এমন

www.icsbook.info

মজবুত মানসিকতা সম্পন্ন সরকার হতে হবে যে প্রতিবেশী দেশের কোন প্রকারের বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দিতে রাযী নয়। প্রতিবেশী ভারতের লোক বাংলাদেশ সীমান্তের ফসল কেটে নিয়ে যায়, সীমান্তের অভ্যন্তরে ঢুকে গরু চুরি করে নিয়ে যায়, নিরীহ মানুষকে হয়রানি করে ও খুন খারাবি করে। তারা আমাদের সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা দ্বীপ দখল করে বসে। আমাদের জনগণকে এ বিষয়ে অবহিত করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়ার মতো সরকার চাই।

গঙ্গার পানি ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে আটক করার পর ভারত এখন আসামের ধুবরী থেকে মোমেনশাহী, পাবনা, রাজশাহী, ও কুষ্টিয়ার উপর দিয়ে খাল কেটে পানি নেবার দাবী জানাচ্ছে। আমাদের হাজার হাজার একর জমি ভারতের প্রয়োজনে খালের জন্য দিতে হবে। প্রতিবেশী ভারতের এহেন আবদার সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কি প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়? আসামের বিদ্রোহী আন্দোলনকে দমন করার প্রয়োজনে বিব্রত ভারত সরকার কোলকাতা থেকে অল্প সময়ে আসাম পৌছার জন্য জলপথ কিংবা স্থলপথে বাংলাদেশের উপর দিয়ে 'করিডোর' দাবী করলে যে বলিষ্ঠতার সাথে এ দাবী প্রত্যাখ্যান করা দরকার তার অভাব হলে এদেশের নিরাপত্তা কী করে টিকবে?

মুজিব আমলে ভারতের সাথে ২৫ বছরের যে গোপন চুক্তি হয়েছিল তা যদি বাংলাদেশের স্বার্থের বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে সত্ত্বর বাতিল করা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহীদেরকে ভারত সাহায্য করছে তাদের সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা কি প্রয়োজন নয়? গোটা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে। এটা বিপন্ন হলে যে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হবে তা দেশবাসীকে অবহিত করা প্রয়োজন।

শক্তিতে ভারতের সাথে পারব না, এমন দুর্বল মানসিকতা হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আত্মসম্মানবোধই স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আজকে পৃথিবীতে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ মেলে। উদাহরণ স্বরূপ ইরানের কথা তুলে ধরা যায়। শক্তিমান প্রতিবেশীর বাড়াবাড়ি থেকে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন সরকারই জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সক্ষম। আত্মসম্মানবোধে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা সরকারেরই দায়িত্ব। তাদের ডাকেই জনগণ জীবন দেয়। অসম্মানের সাথে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মান নিয়ে মরাই আত্মসম্মানবোধের দাবী। দুর্বল মানসিকতা নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার হেফাযত কখনও হবে না।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিরক্ষা ঃ ভারত এদেশের সম্ভাব্য আক্রমণকারী হলেও সশস্ত্র আক্রমণ করার চাইতে সাংস্কৃতিক আক্রমণের

www.icsbook.info

পথই সহজতর মনে করবে। বাংগালী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসীদের মন-মগজ ও চরিত্রকে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, সিনেমা, চারু-শিল্প, ললিত কলা ইত্যাদির মাধ্যমে পশ্চিম বংগের অমুসলিমদের সাথে এতটা ঘনিষ্ঠ করতে চেষ্টা করবে যাতে তারা মুসলিম জাতীয়তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। এ জাতীয় লোকদের হাতে যাতে দেশের শাসন ক্ষমতা থাকে সে উদ্দেশ্যে ভারত সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাবে।

ভারত যদি এদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের একটা বড় অংশকে মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগ করাতে সক্ষম হয় তাহলে যে সাংস্কৃতিক বিজয় তাদের লাভ হবে তাতে রাজনৈতিক ময়দানে তাদের তাবেদার শক্তির প্রাধান্য অত্যন্ত সহজ হবে।

তাই এদেশকে ভারতের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যত শিক্ষিতদের মন-মগজ ও চরিত্রকে ইসলামী জীবনাদর্শে গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা ?

বাংলাদেশ একটি পৃথক স্বাধীন দেশ হিসেবে কায়েম হবার দেড় যুগ পরেও যারা ৭১-এর ভূমিকা নিয়ে হৈ চৈ করার চেষ্টা করেন, তারা একটা কথা গভীরভাবে বিবেচনা করেননি।

৭১-এর ভূমিকার কারণে যারা এদেশে ভারতবিরোধী ও ইসলামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত, তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ হবার পর এমন কোন কাজ হয়েছে কি, যা এদেশের স্বাধীনতার সামান্য বিরোধী বলে প্রমাণ করা যায় ?

একথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, এদেশের স্বাধীনতার উপর যদি কোথাও থেকে আঘাত আসে, তা একমাত্র ভারত থেকেই আসতে পারে। দেশের চারপাশে যদি ভারত ছাড়া আরও কয়েকটি দেশ থাকত, তাহলে এ বিষয় ভিন্ন মত পোষণের সুযোগ হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের ভূমিকার কারণে যারা এ বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখতে চান, তারা জনগণ থেকে ভিন্ন চিন্তা করেন। জনগণকে বাদ দিয়ে দেশ রক্ষা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণ ভারত সরকারকে বন্ধু মনে করে না। তাদের কোন আচরণই বন্ধুসুলভ বলে প্রমাণিত নয়। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের ভূমিকাকেও এদেশের মংগলের নিয়তে পালন করা হয়েছে বলে জনগণ বিশ্বাস করে না।

www.icsbook.info

সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্যই হলো প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্স।"ডিফেন্স এগেইনস্ট হুম" বা "কার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা" প্রশ্নটি আপনিই মনে জাগে। যেহেতু একমাত্র ভারত থেকেই আক্রমণের সম্ভাবনা, সেহেতু এ প্রশ্নের জওয়াবও একটাই।

তাছাড়া শুধু সশস্ত্র বাহিনী দিয়েই দেশ রক্ষা হয় না। জনগণ যদি সশস্ত্র বাহিনীর পেছনে না দাঁড়ায়, তাহলে সে বাহিনী কিছুতেই প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। জনগণও একথা বিশ্বাস করে যে, এদেশের স্বাধীনতা তাদের হাতেই নিরাপদ, যারা ভারতকে আপন মনে করে না এবং ভারতও এদেশে যাদেরকে তার আপন মনে করে না। তাই ৭১-এর ভূমিকা দ্বারা যারা এদেশে ভারতের বন্ধু নয় বলে প্রমাণিত, তারা জনগণের আস্থাভাজনই আছে। যারা বিশেষ রাজনৈতিক গরজে তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোদগার করছেন, তারা এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে কোন সমর্থন যোগাড় করতে পারবেন না।

এদেশের জনগণ ভারত সরকারকে বন্ধু মনে করে না বলেই রাশিয়াকেও আপন মনে করে না। কারণ, রাশিয়ার নীতি সবসময়ই ভারতের পক্ষে দেখা গেছে। তাছাড়া, রুশ-দূতাবাসের কার্যকলাপ সম্পর্কে মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর প্রকাশিত হয়, তাতে তাদের সম্পর্কে সুধারণা সৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে আফগানিস্তানে রাশিয়ার নির্লজ্জ ভূমিকা জনমনে তীব্র ঘৃণাই সৃষ্টি করেছে।

এদেশে কারা রাশিয়ার আগ্রাসী ভূমিকাকে সমর্থন করে এবং কারা ভারতের নিন্দনীয় ভূমিকাকে নীরবে সমর্থন করে, তা কোন গোপনীয় ব্যাপার নয়। সুতরাং তারা যখন জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ৭১-এর ভূমিকার দোহাই দিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়, তখন তাদের নিজেদের হীন মতলবই ফাঁস হয়ে পড়ে। তাদের এ চিৎকারের অর্থ দেশপ্রেমিক জনগণের বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

এদেশের জনগণ একথা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করে যে, ৭১-এ যারা ভারত বিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে, তারা কোন অবস্থায়ই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের উপর কোন হস্তক্ষেপ বরদাশত করবে না। আর যারা এদেশে ইসলামকে বিজয়ী দেখতে চায়, তারাই দেশরক্ষার জন্য প্রাণ দেবার বেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সুতরাং ৭১-এর ভূমিকার ভিত্তিতে তাদের দেশপ্রেমকে যারা কটাক্ষ করে, তারা প্রতিবেশী দেশের সম্প্রসারণবাদী সরকারের বন্ধু বলেই জনগণের নিকট বিবেচিত হবে।

www.icsbook.info

আর একটা বাস্তবতা হলো এই যে, এদেশে কোন গৃহযুদ্ধ লাগলেও যারা ভারতের কোন আশ্রয় আশা করে না, তারাই এদেশকে রক্ষা করবে। যাদের আর কোথাও যাবার পথ নেই, তারাই মরিয়া হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে আসবে। কারণ, এছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। তাদের জীবন ও মরণ এদেশেই নির্ধারিত। যারা সবসময় ভারতের আধিপত্যবাদী ভূমিকার বিরোধী তাদেরকেই জনগণ এদেশে স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষক বলে মনে করে। দেশে কোন রকমের রাজনৈতিক সংকট দেখা দিলে যারা ভারত সরকারের মেহমান হিসেবে সে দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পান, তারা কী করে আশ্রয়দাতা দেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন ? এদেশ ছাড়াও যাদের আশ্রয় আছে, তারা কি এদেশের হিফাযত করতে পারবেন ?

(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)

ইসলামপন্থীদের ৭১ পরবর্তী ভূমিকা

৭১-এর রাজনৈতিক মতপার্থক্য জিইয়ে রাখা অবান্তর। তখন এমন এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে দেশপ্রেমিকদের মধ্যে দেশের কল্যাণ কোন পথে সে বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেল। এক পক্ষ মনে করল যে পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। অপর পক্ষ মনে করল যে পৃথক হলে ভারতের খপ্পরে পড়তে হবে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে "পাঞ্জাবের দালাল" আর "ভারতের দালাল" মনে করত। কিন্তু এসব গালি দ্বারা কোন পক্ষের দেশপ্রেমই মিথ্যা হয়ে যায় না। ঐ সময়কার দুঃখজনক মতবিরোধকে ভিত্তি করে যদি এখনও বিভেদ জারী রাখা হয় তাহলে জাতি হিসেবে আমরা ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে যেতে বাধ্য হব।

দুনিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হবার পর সব ইসলামপন্থী দল ও ব্যক্তি স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের জন্মভূমিতে সাধ্যমত ইসলামের খেদমত করার চেষ্টা করছে। ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সিপাহী-জনতার নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু আকবার ধ্বনি স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্তকে নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৭ সালে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ খতম করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও দৃঢ় আস্থা এবং সমাজতন্ত্রের ভিন্ন ব্যাখ্যা সংবিধানে সন্নিবিশীত করার পর জনগণ রেফারেন্ডামের মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানাবার ফলে ইসলামপন্থী দলগুলো বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য শাসনতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এদেশের মুসলমানদের জন্য তাদের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন।

www.icsbook.info

বাংলাদেশ ভৌগলিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা এলাকা। আর কোন মুসলিম দেশ এমন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নেই। তদুপরি আমাদের এ প্রিয় জন্মভূমিটি এমন একটি দেশ দ্বারা বেষ্টিত যাকে আপন মনে করা মুস্কিল। তাই এদেশের আযাদীর হিফাযত করা সহজ ব্যাপার নয়। জনগণ এ ক্ষেত্রে একেবারেই বন্ধুহীন। আশপাশ থেকে সামান্য সাহায্য পাওয়ারও কোন আশা করা যায় না। এ দেশবাসীকে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজেদের শক্তি নিয়েই প্রতিরক্ষার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

যে কোন জাতির আদর্শ ও বিশ্বাসই তার শক্তির উৎস। সুতরাং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনাদর্শ ইসলামই স্বাধীনতার আসল গ্যারান্টি। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামপন্থী সকলেই এ মহান উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। তাই জনগণের নিকট তাদের চেয়ে বেশী আপন আর কেউ হতে পারে না। *(পলাশী থেকে বাংলাদেশ)*

www.icsbook.info

- বাংলাদেশের আসল সমস্যা

বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বেরই অন্যতম একটি রাষ্ট্র। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের যাবতীয় সমস্যাই এখানে অত্যন্ত সজীবভাবেই বর্তমান ঃ

১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ঃ শাসনতান্ত্রিক স্থায়ী কাঠামো ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবই তৃতীয় বিশ্বের প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার কারণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হলেও সমস্যার প্রকৃত রূপ একই। শাসনতন্ত্র সেখানে একনায়কের খামখেয়ালীর খেলনা, আর সরকারী দল তার অনুগত দাস। ফলে সেখানে শাসনতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে না এবং রাজনৈতিক দল জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত অধিকারীও নয়। এরই ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব হয় এবং পরিণামে সামরিক শাসন এসে নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। কারণ সামরিক শাসন কখনও রাজনৈতিক সমাধান নয়।

একথা দেশবাসীর মন-মগজে কায়েম হতে হবে যে, ব্যক্তি যত যোগ্য বা নিঃস্বার্থই হোক, তাকে দেশের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে মেনে নেয়া মারাত্মক ভুল। ব্যক্তি চিরজীবী নয় এবং ব্যক্তি ভুলের উর্ধেও নয়। এ ধরনের দায়িত্বের অধিকারী ব্যক্তির একার ভুলে একটি দেশে বিপর্যয় হয় এবং গোটা জাতির স্বার্থ বিপন্ন হয়। অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষী। তাছাড়া সর্বক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু হলে গোটা দেশ চরম শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন হয়।

তাই কোন দেশের স্থায়ী কল্যাণের জন্য একটি স্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থাকা অপরিহার্য। দেশের সকলের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যত বংশধরদের উন্নতি এবং দেশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এরই উপর প্রধানত নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সব দেশে সব কালেই স্বীকৃত। কিন্তু জাতির ভাগ্য কোন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া আত্মহত্যার শামিল। শাসক আজ আসবে, কাল স্বাভাবিক মানবিক কারণেই চলে যাবে। কিন্তু দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে স্থায়ী বিধি-ব্যবস্থা না থাকলে যিনিই ক্ষমতায় আসবেন তিনি তার মরযী মতো শাসনতন্ত্রকে যেমন খুশী রদ-বদল করবেন। কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকদের

www.icsbook.info

জন্য এর চেয়ে অপমানকর কোন কথা আর হতে পারে না। এ অবস্থায় জাতীয় মর্যাদাবোধই বিনষ্ট হয়।

সুতরাং যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জাতীয় সংসদে আসন পান তাদের নেতৃস্থানীয়দের এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। তাদেরকে সর্বসম্মতভাবে শাসনতন্ত্রের মূল রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। যদি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে গণভোটের মাধ্যমে জাতীয় সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে।

২. নৈতিক অবক্ষয় ঃ দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা হলো নৈতিক অবক্ষয়। মানুষ নৈতিক জীব। বিবেকসম্পন্ন জীব হিসেবে ভাল-মন্দের ধারণা থেকে কোন মানুষ মুক্ত থাকতে পারে না। যে জাতির অধিকাংশ লোক মন্দ জেনেও ইচ্ছা করে তাতে লিপ্ত হয়, সে জাতির জীবনে কোন ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা থাকতে পারে না। এমন জাতির মধ্যে কোন আইনই সঠিকভাবে জারি হতে পারে না। নৈতিকতাশূন্য সরকারী কর্মচারী জাতির ডাকাত স্বরূপ। প্রতিটি আইন তাদেরকে যোগ্যতার সাথে ডাকাতি করার ক্ষমতা যোগায়।

আমাদের দেশে আইন-আদালাত, কোর্ট-কাচারী, থানা-পুলিশ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, উযীর-নাযীর, ব্যবস্যা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, ইত্যাদিকে আধুনিক যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় শক্তি-সামর্থের অনেক বেশী অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হচ্ছে। মানুষ বস্তুসর্বস্ব জীব নয় বলেই শুধু এসব দ্বারা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কাংখিত শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না। মানুষ প্রকৃতপক্ষেই বিবেকবান নৈতিক সৃষ্টি। নৈতিকতা বোধই মনুষ্যত্বে। আর চরিত্রই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। তাই নৈতিক চেতনাই মানুষের আসল সত্তা। মানুষের দেহ-যন্ত্রের পরিচালনাশক্তি যদি এ সত্তার হাতে তুলে দেয়া না হয়, তাহলে সে পশুর চেয়েও অধম হতে পারে।

প্রত্যেক জাতিই তার বংশধরকে শৈশবকাল থেকেই নীতিবোধের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল বানাবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব জাতির নীতিবোধের ভিত্তি এক নয়। প্রত্যেক জাতি কতক মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জাতীয় নীতিবোধের ধারণা লাভ করে। বাংলাদেশের শতকরা ৮৭ জনের মৌলিক বিশ্বাস হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। সুতরাং এদেশের জাতীয় নীতিবোধ যদি এর ভিত্তিতে রচিত হয়, তাহলে জাতীয় চরিত্র গঠনের কাজ ত্বরান্বিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু যদি অন্য কোন ভিত্তি তালাশ করা হয়, তাহলে প্রচলিত মৌলিক বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত সময় লেগে

www.icsbook.info

যাবে। এরপর নতুন ভিত্তি রচনা করে জাতির নৈতিক মান রচনা করার কাজে হাত দিতে হবে। এমন আত্মঘাতী পথে জেনে-শুনে কোন্ বুদ্ধিমান জাতি যেতে পারে না।

একটি কথা আমাদের শিক্ষিত সমাজকে গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সমাজে হাজারো দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত সম্বন্ধে কোন না কোন মানের বিশ্বাস মুসলিমদের মধ্যে অবশ্যই আছে। হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কে জনগণের ধারণা মোটামুটি আছে। প্রবৃত্তির তাড়নায়, আপাত মধুর প্রলোভনে বা কুসংসর্গে মানুষ বিবেকের নৈতিক অনুভূতির বিরুদ্ধে কাজ করলেও সে নীতিবোধ থেকে বঞ্চিত নয়। বিবেকের দংশনই প্রমাণ করে যে, মানুষ নৈতিক জীব। দেহের অসংগত দাবীকে অগ্রাহ্য করে বিবেকের নির্দেশ পালনের জন্য যে নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন সে শিক্ষা ব্যতীত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যোগ্য দানব সৃষ্টি করতে পারে বটে, সুশৃঙ্খল সৎমানব গঠন করতে পারে না।

জাতির নৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত অন্যান্য দিকের উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্যায় পথে ধন-সম্পদ অর্জনের মনোবৃত্তি দমন করতে না পারলে সমাজ থেকে শোষণ উৎখাত হবে কি করে? সরকারী আয়ের প্রতিটি উৎস পথে ঘুষখোর ও দুর্নীতিপরায়ণ লোক থাকলে দেশকে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা কি করে সম্ভব? সর্বস্তরে দেশে যে দুর্নীতি ব্যাপক আকারে বিরাজ করছে তা দূর করার ব্যবস্থা না হলে জনগণ কোন সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খেদমত পেতে পারে না। দুর্নীতির ফলে করদাতা জনগণ মনিব হয়েও সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা শোষিত, নির্যাতিত ও অপমানিত।

৩. অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব ঃ তৃতীয় প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব। দেশে এমন ধরনের এক অর্থব্যবস্থা চালু রয়েছে যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়েও নিকৃষ্ট। সমাজতন্ত্রের নামে কিছু শিল্প-কারখানাকে সরকারী পরিচালনাধীন করেই সুফল পাওয়া যেতে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমান অর্থব্যবস্থা কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থা নয়। 'অরাজকতা'ই এর একমাত্র পরিচয়।

কোন দেশের সুপরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার প্রথম ভিত্তিই হলো জনগণের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যবিন্দুকে অর্জনের দৃঢ়সংকল্প। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা যদি পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য না হয়, তাহলে দেশের উন্নয়নের নামে যাই করা হোক, তা শোষণের হাতিয়ারেই পরিণত হয়। প্রতিটি মানুষের এসব মৌলিক প্রয়োজন

www.icsbook.info

পূরণই প্রকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঠিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য ব্যতীত রাষ্ট্র ও সরকার মানব জীবনের জন্য অর্থহীন।

দুনিয়ার কল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এ উদ্দেশ্য হাসিল করার দু'প্রকার বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। (১) পশ্চিম ইউরোপীয় কল্যাণমূলক কয়েকটি রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক দলীয় একনায়কত্ব ছাড়াই ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায়ভিত্তিক বন্টনের মাধ্যমে এ সমস্যার মোটামুটি সমাধান করেছে। অবশ্য পুঁজিবাদী সমাজের তুলনায় সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা অধিকতর সন্তোষজনক হলেও শুধু রাজনৈতিক নিরাপত্তাই মানুষকে প্রয়োজনীয় সুখ ও শান্তি দিতে পারে না। তাই ঐ সব দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা এত বেশী। মানুষ পেটসর্বস্ব জীব নয় যে, পেটে ভাত থাকলেই তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। মানুষ বিবেক প্রধান জীব, তাই তার রুহকে অশান্ত রেখে বস্তুগত দৈহিক প্রয়োজন পূরণ হলেও সে সুখী হয়ে যায় না। তবু ঐ কয়টি রাষ্ট্র যেটুকু করেছে তা অন্যসব দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে মন্দের ভাল।

(২) অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষের সকল প্রকার আযাদী হরণ করে যে অর্থব্যবস্থা চালু করেছে, তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা বিবেচ্য। পুঁজিবাদী অর্থনীতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক গোলামী কায়েম করে, আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নামে চরম ও স্থায়ী রাজনৈতিক দাসত্বের প্রচলন করে।

আমাদের দেশে কোন্ ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে আমরা যদি রাজনৈতিক আযাদী ও অর্থনৈতিক মুক্তি এক সাথে পেতে চাই, তাহলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা গভীর অধ্যয়ন ও তুলনামূলক জ্ঞানের ভিত্তিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে দাবী করছি যে, আল্লাহর কুরআনে ও রসূলের বাস্তব শিক্ষায় আধুনিক যুগের জন্যও একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের যে মজবুত বুনিয়াদ রয়েছে তাই এদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দিতে পারে। ডেনমার্ক ও নরওয়ের মত কয়েকটি দেশের অর্থব্যবস্থা এবং জাপানের কর্মকুশলতা থেকেও আমরা অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা পেতে পারি যা ইসলামী বুনিয়াদের উপর এদেশের উপযোগী কাঠামোতে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।

শুধু থিওরী বা মতবাদ দ্বারা বাস্তব সমাধান হয় না। সত্যিকারের সমাধানের জন্য দরদী মনের প্রয়োজন। যাদের অন্তর দেশের গরীবদের অবস্থা দেখে অস্থির হয় না, বিধবা ও বিবস্ত্র নারীকে কংকালসার ছেলেমেয়েসহ শহরে-বন্দরে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে যাদের

www.icsbook.info

প্রাণ কাঁদে না, স্কুলে পড়ার বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে ইট ভাংগতে ও রাস্তায় কাগজ কুড়াতে দেখে যাদের মনে পিতৃস্নেহ জাগে না, তারা রাজনৈতিক শ্লোগান যতই দিক তাদের দ্বারা জনকল্যাণ সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে দেশের দুর্গত মানুষের জন্য যে পর্যন্ত গভীর মমত্ববোধ না জাগবে এবং ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে যে পর্যন্ত তারা যথাসাধ্য জনসেবার অভ্যাস না করবে, সে পর্যন্ত জাতির ভাগ্য উন্নয়নের পরিবেশই সৃষ্টি হবে না।

৪. **উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা ঃ** চতুর্থ বড় সমস্যা হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা। গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার স্রোত চলছে লক্ষ্যহীনভাবে। শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিবেকবান মানুষ গড়া। এরপর লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতির প্রয়োজন পূরণের জন্য সুপরিকল্পিত শিক্ষা। আমরা দীর্ঘ কোর্সের ব্যয়বহুল এম, বি, বি, এস ডাক্তার দিয়ে ৯ কোটি মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন ১৫০ বছরেও পূরণ করতে পারবো না। এর জন্য গ্রামে থাকতে রাযী স্বল্প-মেয়াদী কোর্সের বিরাট চিকিৎসক বাহিনী সৃষ্টি করতে হবে। হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে অল্প খরচে এ প্রয়েজন পূরণ হতে পারে। জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ ব্যয় করে আমরা দামী ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করছি। অথচ তাদেরকে কাজ দিতে পারি না বলে তারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

কিশোর ও যুবকদের হাতকে উৎপাদনের যোগ্য বানাবার জন্য সংক্ষিপ্ত টেকনিক্যাল শিক্ষা ব্যাপক না করায় শিক্ষা দ্বারা বেকারের মিছিলকে বৃদ্ধিই করা হচ্ছে। কি করে দেশের সব হাতে কাজ তুলে দেয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে দেশের সব নারী-পুরুষকে বিভিন্ন কুটির শিল্পের শিক্ষা দিয়ে উৎপাদনী জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। আমাদের গরীব দেশের সম্পদ কি করে বাড়ান যায়, সে শিক্ষার জন্য কলেজের মতো দালান, এমনকি হাই স্কুলের মতো ঘর না হলেও চলতে পারে। পশু পালন, হাস-মুরগী বৃদ্ধি, মাছের সস্তা চাষ, ফল-মূল, শাক-সবজি উৎপাদনের জ্ঞান নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও বিতরণ করা সম্ভব। শিক্ষা বলতে শুধু স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই বুঝায় না। একটি কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার জন্য সব নাগরিককে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাপক গণশিক্ষা প্রয়োজন। গণশিক্ষার জন্য মসজিদ মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোই ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫ **অবহেলিত মহিলা সমাজ ঃ** দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা মহিলাদের পশ্চাতে পড়ে থাকা। তাদের পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে বলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জনশক্তির অর্ধেক মহিলা—কিন্তু জাতীয়

www.icsbook.info

প্রাণশক্তির বিচারে মহিলার সমাজের বৃহত্তর সম্পদ। তাদেরকে হয় পুরুষের সেবক, না হয় ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা ইসলামের অনুসারী তারাও নারীকে ঐ মর্যাদা ও অধিকার দিচ্ছে না যা কুরআন-হাদীসে তাদের প্রাপ্য বলে ঘোষণা রয়েছে। ইসলামের নামে শুধু কর্তব্যটুকুই তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। মোহরের অধিকার, উত্তরাধিকারের অধিকার, খোলা তালাকের অধিকার, স্বামীর অবহেলা-অবিচারের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার, যৌতুকের জুলুম থেকে বাঁচার অধিকার ইত্যাদি ভোগ করার সুযোগ তাদের কোথায়? নারীর উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় মহিলা সমাজ জাতির অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে আছে। অথচ তারা জাতীয় উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে পারে।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, নারীর মর্যাদা ও অধিকারের নামে তাদেরকে পুরুষের সাথে একই কর্মক্ষেত্রে নিক্ষেপ করে সমাজের নৈতিক কাঠামো ও পারিবারিক পবিত্রতা ধ্বংস করা হচ্ছে। অথচ অবহেলিত গ্রাম্য মহিলাদেরকেও নারীদের উপযোগী প্রাথমিক চিকিৎসা, ধাত্রী-বিদ্যা, কুটির শিল্প, পশু পালন, ফল-মূল তরি-তরকারি উৎপাদন ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে জাতির উন্নতির সহায়ক বানান যায়। দেশের শিশু শিক্ষার দায়িত্ব মায়েদের হাতে তুলে দেবার জন্য তাদের উপযোগী বিশেষ শিক্ষা না দিয়ে পুরুষের সাথে বসিয়ে একই ধরনের বিদ্যা শেখাবার অপচেষ্টা চলছে। সমাজের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারীকে তার দৈহিক যোগ্যতা ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপযোগী কাজে লাগিয়ে সমাজের গাড়ী সচল করা অপরিহার্য। নারী ও পুরুষ এ গাড়ীর দু'টো চাকা। এদের অবস্থান একত্র নয়, নিজ নিজ স্থানে তাদের কাজে লাগাতে হবে। তবেই সমাজের গাড়ী সন্তোষজনকভাবে চলতে পারে।

নারীর সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মায়ের দায়িত্ব পালন। মানব শিশুর মধ্যে মানবিক মহৎ গুণাবলী প্রধানত মায়ের কাছ থেকেই অর্জন করা সম্ভব। এর জন্য মাতৃজাতিকে শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা কি দেশে আছে? পরিবার পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্বও নারীরই উপর ন্যস্ত। অথচ এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে গড়ে তুলবার ব্যবস্থাও নেই। স্বামী রোযগার করে পরিবার চালাবার জন্য উপযুক্ত স্ত্রীর হাতে টাকা তুলে দিলেই পারিবারিক ব্যবস্থা সুন্দরভাবে চলতে পারে। মা ও স্ত্রীর এ দু'টো দায়িত্বকে অবহেলা করে নারী জাতির উন্নতির নামে পুরুষের করণীয় কাজে তাদেরকে নিয়োগ করা নারীত্বের চরম অবমাননা। ঐ দু'টো দায়িত্বের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবার পরও সমাজ গঠন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে নারীর উপযোগী বহু কাজ রয়েছে যা নারীদের পক্ষেই অধিকতর যোগ্যতার সাথে করা সহজ। প্রাথমিক

www.icsbook.info

শিক্ষা, নারী চিকিৎসা, হস্তশিল্প এবং যেসব শিল্পে দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় না, সে সব ক্ষেত্রে নারীসমাজ যতটা খেদমত করতে পারে তার পূর্ণ সুযোগ অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে যাতে জাতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

পাঁচটি বড় বড় সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে চিন্তার বিশেষ একটি ধারা সৃষ্টি এখানে উদ্দেশ্য। এ সমস্যাগুলোর সমাধান একটি কথা দ্বারাই হয়ে যাবে না। আর সমস্যাগুলো একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্নও নয়। একই দেহে অনেক রোগের বিভিন্ন উপসর্গ দেখে প্রত্যেক রোগের পৃথক পৃথক চিকিৎসা যেমন অবাস্তব, তেমনি দেশের এসব সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা না করে সত্যিকারভাবে সমাধান করা অসম্ভব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নৈতিক উন্নয়ন, ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, মহিলাদেরকে জাতির উপযুক্ত খেদমতের যোগ্য বানান ইত্যাদি একই মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ হবে। কোন একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তি ব্যতীত এ ধরনের সঠিক পরিকল্পনা অসম্ভব। আমরা এ উদ্দেশ্যেই ইসলামকে আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছি।

(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)

বাংলাদেশ কি সত্যি দরিদ্র ?

হিমালয়ান উপমহাদেশের সব কয়টি দেশই এক সময় ইংরেজ শাসনের অধীন ছিল। বর্তমানে সেখানে ছোট বড় অনেক কয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম আছে। বাংলাদেশ, বার্মা, ভারত, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ নামে যে এলাকাটি এখন পরিচিত তাকে এককালে অখন্ড বৃটিশ ভারতের আমলে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলিত রাখা হয়েছিল। ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য চালু করে সেকালের পূর্ব বংগকে এর বাজারে পরিণত করা হয়। আর পূর্ব বংগের কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য এবং চাল, মাছ, দুধ, ডিম ও মুরগী দ্বারাই ঐ এলাকার পুষ্টি সাধিত হতো।

ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ফলে পূর্ব বংগের উন্নয়নের প্রয়োজনেই ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বংগ ও আসামকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করা হয়। কিন্তু কোলকাতা ভিত্তিক কায়েমী স্বার্থ অখন্ড বাংগালী জাতীয়তার শ্লোগান তুলে ১৯১১ সালে নতুন প্রদেশটি বাতিল করাতে সক্ষম হয়। ফলে কোলকাতার শোষণ আবার বহাল হয় এবং পূর্ব বংগের উন্নয়ন মুলতবী হয়ে যায়।

www.icsbook.info

১৯৪৭ সালে ঢাকায় পূর্ব বংগের রাজধানী স্থাপিত হবার পর এ এলাকার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের সাথে পূর্ব বংগ একটি প্রদেশ হিসেবে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ এলাকার উন্নয়ন মোটামুটি এগিয়ে চলছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পূর্ব বংগের নেতৃত্ব দুর্বল থাকায় এ এলাকার উন্নয়ন আশানুরূপ গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায়, সশস্ত্র বাহিনীতে পূর্ব বংগের কোন উল্লেখযোগ্য স্থান না থাকায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সামরিক শক্তির প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব বংগের নেতৃত্ব প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। এত কিছু সত্ত্বেও ২৫ বছরের মধ্যে পূর্ব বংগ শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উন্নতি করেছিল তাতে উপমহাদেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় খুব বেশী পেছনে পড়ে থাকেনি। বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে চালু হবার পর কতক অনিবার্য কারণে সাময়িকভাবে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় তার দরুন বাংলাদেশকে দুনিয়ার দরিদ্রতম দেশসমূহের মধ্যে গণ্য করার কোন সংগত যুক্তি নেই।

বাংলাদেশ একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হবার পর সরকারী ক্ষমতার অধিকারীরা যদি একটু সততার পরিচয় দিতে পারতেন এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী বিভিন্ন শক্তি যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করত তাহলে এদেশ এতটা দুরবস্থায় পতিত হতো না। স্বাধীনতা আন্দোলনে শরীক হবার অজুহাতে অনেকেই অন্যায় সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অপচেষ্টা করায় দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। বহু রকমের দেশী ও বিদেশী স্বার্থের বাহকরা এমন সব তৎপরতা চালায় যার ফলে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থাও কায়েম হতে পারেনি।

এত কিছু সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মোটামুটি ধারণা যদি কারো থাকে তাহলে কেউ এদেশকে গরীব বলে মন্তব্য করতে পারবে না। দেশের খনিজ, কৃষিজ ও বনজ সম্পদ এবং পানি ও মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে এদেশেরই অনেকের কোন ধারণা নেই। এখানে এর বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু যতটুকু জানার সুযোগ পেয়েছি তাতে বাংলাদেশকে যত গরীব মনে করা হয় প্রকৃতপক্ষে যে তত গরীব নয় তা জোর দিয়েই বলতে পারি। *(আমার দেশ বাংলাদেশ)*

বাংলাদেশের আসল অভাব*

দুনিয়ার বহুদেশ দেখার সুযোগ পাওয়ায় বিভিন্ন দেশের মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মেছে। এর ফলে বাংলাদেশীদের

* এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদের লেখা 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ' বইটি থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

www.icsbook.info

সাথে অন্যদের তুলনা করে মতামত প্রকাশ করা সম্ভব। দোষে গুণেই মানুষ। আমার দেশের মানুষের স্বভাবগত গুণগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বেশ উৎসাহ বোধ করি। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, বোধশক্তি, বাচনশক্তি, স্মরণশক্তি ইত্যাদির বিচারে এদেশের লোক কোন দেশের পেছনে মনে হয় না। উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পেলে এদেশের লোক সব কাজেই যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম।

এদেশের আয়তন ছোট হলেও বিরাট জনসংখ্যা এদেশকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে এদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। বর্তমানে এদেশের লোক মধ্যপ্রাচ্য ও ইংল্যান্ডে কর্মরত রয়েছে। অন্যান্য অনেক দেশেও এদেশের লোক জীবিকার সন্ধানে পৌছে গেছে। কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে তারা কোথাও অযোগ্য প্রমাণিত হচ্ছে না। এদেশের জনশক্তিকে প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষা দিলে দেশের জন্য বিরাট সম্পদ ও গৌরব অর্জন করে আনতে সক্ষম হবে।

এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যে পরিমাণ আছে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে এক-চতুর্থাংশ জনশক্তির কর্মসংস্থান হতে পারে। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করে বর্তমান চাষযোগ্য জমিতেই দ্বিগুণ ফসল ফলান সম্ভব।

এসব দিক বিবেচনা করলে বাংলাদেশকে দুনিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশগুলোর তালিকায় গণনা করা মোটেই ঠিক নয়। তাহলে 'তলাহীন ঝুড়ি' হিসেবে যে বাংলাদেশের দুর্ণাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেল তার আসল কারণ কী ? অভাব আমাদের অবশ্যই আছে। দক্ষ জনশক্তির অভাব, প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাব ইত্যাদি অসত্য নয়। কিন্তু এসব অভাবের আসল কারণ একটা মৌলিক জিনিসের অভাব। সে জিনিসটিই মানব সমাজের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান। এর নাম হলো 'চরিত্র'। চরিত্র এমন এক ব্যাপক অর্থবোধক মানবিক গুণ যা প্রত্যেক মানব সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। চরিত্রের মর্মকথা হলো মানব সুলভ আচরণ। ভাল ও মন্দের সার্বজনীন একটা ধারণা মানাব সমাজে চিরকাল বিরাজ করছে। ঐ ধারণা অনুযায়ী যদি কেউ মানুষের সাথে ব্যবহার করে তাহলে সবাই তাকে চরিত্রবান বলে স্বীকার করে।

টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপারে ওয়াদা রক্ষা করা যে একটি চারিত্রিক গুণ তা সবাই মানতে বাধ্য। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অন্যের সাথে ওয়াদা খেলাফী করে সেও চায় যে, কেউ যেন তার সাথে ওয়াদা ভংগ না করে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, চরিত্র ঐ সব আচরণেরই সামষ্টিক নাম যেসব

www.icsbook.info

আচরণ প্রত্যেক মানুষ অন্যের কাছ থেকে পেলে খুশী হয় এবং না পেলে ব্যথিত হয়।

একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টা আরো সহজে বুঝা যাবে। আজকাল একথা সবারই মুখে শুনা যায় যে, এদেশে ঘুষ না দিলে কোথাও কোন ন্যায্য অধিকারও পাওয়া যায় না। টাকা দিলে যে কোন অন্যায় দাবীও আদায় করা যায়। যে ঘুষ খায় সে যখন নিজের কাজের জন্য কোথাও ঘুষ দিতে বাধ্য হয় তখন তার মনেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাহলে বুঝা গেল যে, ঘুষ নেয়ার কাজটাকে সে-ও ভাল কাজ বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। সুতরাং যে ঘুষ খায় সে অবশ্যই চরিত্রহীন।

আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি। গাড়ির লাইসেন্স ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ী চালাবার উপায় নেই। যে সরকারী অফিস থেকে লাইসেন্স নিতে হয় সেখানে দিনের পর দিন ঘুরাফিরা করেও লাইসেন্স না পাওয়া গেলে মনের অবস্থাটা কিরূপ হতে পারে ? আপনি ঘুষ দিচ্ছেন না বলেই এরকম ঘুরতে হচ্ছে। লাইসেন্স ইস্যু করার দায়িত্বশীলরা কর্তব্যে অবহেলা করার ফলে আপনার কত মূল্যবান সময় নষ্ট হলো ? এ দায়িত্বশীল ব্যক্তিই নিজের কোন কাজে অন্য কোন অফিসে এ রকম ভোগান্তির শিকার হলে তিনি কি খুশী হবেন ?

এসব উদাহরণ থেকেই দেশের অবস্থাটা আঁচ করা যায় । বাংলাদেশে এখন সবাই সবাইকে ঠকাবার চেষ্টায় কর্মতৎপর। তাই আমরা সবাই কেবল ঠকেই চলেছি। সবার বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঘুষ খেয়ে যে টাকা নিচ্ছে তা অন্যদেরকে ঘুষ দিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সবাই বিবেকের নিকট দোষী হওয়া ছাড়া এবং অশান্তি কামাই করা ছাড়া আর কী পেলাম ?

কর্তব্যে অবহেলা, ইচ্ছাকৃত কাজ না করা, সেবার পরিবর্তে শোষণ করা, মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অন্যায় স্বার্থ হাসিল না হলে দায়িত্ব পালন না করা ইত্যাদি অগণিত উপায়ে আমরা চরিত্রহীনতার পরিচয় দিচ্ছি। ফলে আমাদের প্রতিভা, মেধা, বুদ্ধি ও যোগ্যতার নিজ হাতে বিনষ্ট করে দেশকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

তাই বস্তুগত সম্পদের অভাব আমাদের আসল অভাব নয়। আমাদের সব অভাবের মূল কারণই হলো চরিত্রের অভাব, নৈতিকতার অভাব, মনুষ্যত্বের অভাব। এ অভাব দূর না হলে দুনিয়ার যত সম্পদই ভিক্ষা ও ঋণ হিসেবে আমরা পাচ্ছি তা দ্বারা আমাদের দারিদ্র কখনও দূর হবে না। যে পাত্রের তলা নেই দুনিয়ার সম্পদ দিয়েও তা পূর্ণ করা সম্ভব নয় । আমরা তাই তলাহীন

www.icsbook.info

ঝুড়িতে পরিণত হয়েছি। চরিত্রের অভাব দূর করতে না পারলে আমাদের দশা আরও খারাপ হতে বাধ্য।

জাতিকে চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হলে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব চরিত্রবান লোকদের হাতে তুলে দিতে হবে। চরিত্রবান লোক আকাশ থেকে নাযিল হবে না। বিদেশ থেকেও তা আমদানী করার জিনিস নয়। সাংগঠনিক পদ্ধতিতে চরিত্র গঠনের আন্দোলনের মাধ্যমে চরিত্রবান একদল লোক জনগণের নিকট তাদের কর্মতৎপরতার দ্বারা পরিচিত হলে জনগণ তাদের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করবে। গণ সমর্থন নিয়ে এমন একদল চরিত্রবান লোক দেশের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করতে পারলেই এদেশের উজ্জল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে।

চরিত্রের কোন বিকল্প নেই। দুনিয়ায় অন্য কোন দেশের অবস্থা চরিত্রের দিক দিয়ে এতটা দুর্বল কিনা আমার জানা নেই। চরিত্রের একটা নিম্নতম মান ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না।

বাংলাদেশের অবস্থা এ দিক দিয়ে এত করুণ যে, এদেশের চরিত্রবান লোকেরা অতি সত্ত্বর সুসংগঠিত না হলে কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যে কি আছে আল্লাহই জানেন।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

বাংলাদেশ ও ইসলাম

ইসলাম প্রিয় বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে দুনিয়ার মানচিত্রে যে ভূখন্ডটি বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করেছে, সে এলাকাটিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই জনবসতি ছিল। এখানে দ্বীন ইসলামের আলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথেই প্রথম বিস্তার লাভ করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ মুসলিমদের হাতে রাজনৈতিক প্রাধান্য আসে। এ জন্যই এ এলাকায় মুসলিমদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুধু রাজনৈতিক শক্তির বলে এদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হয়নি।

দিল্লিতে শত শত বছর মুসলিম শাসকদের রাজধানী থাকা সত্ত্বেও চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা সবসময়ই কম ছিল । কিন্তু বাংলার মাটিতে মুসলিম শাসন শুরু হবার পূর্বেই বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনতা মুসলমান হয়। ইসলাম প্রচারক আরব বণিকদের প্রচেষ্টায় চাঁটগা দিয়ে এ এলাকায় ইসলামের আলো পৌছে। স্থানীয় অধিবাসীরা ব্যবসায়ে লেন-দেনের সাথে সাথে তাদের নিকট মানবিক অধিকার ও মর্যাদার সন্ধান পেয়ে মুসলিম হওয়া শুরু করেছিল। এমন উর্বর জমির খোঁজ পেয়ে ইসলামের আলো নিয়ে বহু নিঃস্বার্থ মুবাল্লিগ এদেশে আগমন করেন। এভাবে নদী-মাতৃক বাংলায় ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই বখতিয়ার খিলজি ১২০১ সালে মাত্র ১৭ জন অগ্রগামী অশ্বারোহী সেনা নিয়ে গৌড়ে আগমন করলে গৌড়ের রাজা লক্ষণ সেন বিনা যুদ্ধে পালায়ন করেন এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। বাংলার সাথে সাথে আসামের দিকেও যখন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, তখন বর্তমান সিলেট অঞ্চলের রাজা গৌর গোবিন্দের মুসলিম বিরোধী চক্রান্তকে খতম করার জন্য হযরত শাহজালাল ইয়ামনী(রঃ) ৩৬০ জন মুজাহিদ নিয়ে এদেশে আসেন।

সুতরাং ইতিহাস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, শাসকের ধর্ম হিসেবে এ এলাকায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এবং মানুষের মত ইজ্জত নিয়ে বাঁচার তাকীদেই তারা মুসলমান হয়। এ কারণেই এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এত বেশী ইসলাম পরায়ণ। ধর্মের নামে শাসকদের অধর্মের ফলে বর্তমানে যুব শ্রেণীর একাংশে যে ধর্ম-বিরোধী তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা সাময়িক এবং তার বিপরিত প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। *(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)*

www.icsbook.info

বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তি

আগেই বলা হয়েছে ইসলাম নিজস্ব গতিতে প্রথম যুগেই আরব ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সমুদ্রপথে এদেশে পৌঁছে। এরপর যুগে যুগে মুবাল্লিগ, ওলী ও দরবেশগণের আদর্শ জীবন এদেশের জনগণকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। রাজ্য বিজয়ীদের চেষ্টায় এদেশে ইসলাম আসেনি ; বরং ইসলামের প্রসারের ফলেই এখানে মুসলিম শাসনের পত্তন হয়।

একথা সত্য যে, দ্বীন ইসলামের সঠিক ও ব্যাপক জ্ঞানের অভাবে এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে তাদের অমুসলিম পূর্ব-পুরুষদের অনেক কুসংস্কার, ভন্ড পীর ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের চালু করা শির্ক-বিদায়াত, প্রতিবেশী অন্যান্য ধর্মের কতক পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বিভিন্নরূপে কম-বেশী চালু রয়েছে। কিন্তু এদেশের অশিক্ষত মুসলমানদের মধ্যেও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবীর প্রতি মুহাব্বত এবং মুসলিম হিসেবে জাতীয় চেতনাবোধ এমন প্রবল রয়েছে যে, সকল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেও কোন কালেই তা হারিয়ে যায়নি। বাংলাদেশ আন্দোলনের রাজনৈতিক তুফানে মুসলিম জাতীয়তাবোধ খতম হয়ে গেছে বলে সাময়িকভাবে ধারণা সৃষ্টি হলেও এদেশের মুসলিম জনতা এর পরপরই ঐ চেতনার বলিষ্ঠ পরিচয় দিয়েছে।

একথা যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে যে, এদেশের জনগণ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভাবপ্রবণ হবার ফলে কখনও কখনও রাজনৈতিক গোলকধাঁধায় সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে বা ভুল করতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে কখনও ইসলামী চেতনাবোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবোধকে তাদের জীবন থেকে মুছে ফেলতে দেয়নি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের মহাপ্লাবন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার সরকারী অপচেষ্টা এদেশের মুসলিম জাতীয়তাবোধের নিকট যেভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তা বাংলাদেশে ইসলামী শক্তির মযবুত ভিত্তির সুস্পষ্ট সন্ধান দেয়।

বাংলাদেশ এখন আর বাঙালী জাতীয়তাবাদী দেশ নয়। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে গৌরব বোধ করে। বাংলাদেশ ইসলামী সেক্রেটারীয়েটের মতো 'বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্র সংঘের' উল্লেখযোগ্য সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ইসলামী পররাষ্ট্র সম্মেলনে উৎসাহের সাথে যোগদান করে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের কলংক স্বরূপ রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে যে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের' উল্লেখ ছিল দেশবাসীর ইসলামী চেতনাবোধ তা বরদাশত করেনি। সুতরাং বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির ভিত্তি অত্যন্ত মযবুত। *(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)*

www.icsbook.info

বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক

আল্লাহ পাকই সমস্ত পৃথিবীর স্রষ্টা। আমরা তার দাসত্ব কবুল করে মুসলিম (অনুগত) হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি। মুসলিমের দৃষ্টিতে আল্লাহর গোটা দুনিয়াই তাঁর বাসভূমি। কিন্তু আমাদের মহান স্রষ্টা যে দেশে আমাদেরকে পয়দা করলেন, সে দেশের সাথে স্বাভাবিক কারণেই আমরা বিশেষ ধরনের এক গভীর সম্পর্ক অনুভব করি। কারণ আমরা ইচ্ছে করে এদেশে পয়দা হইনি। আমাদের দয়াময় প্রভু নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এদেশে পয়দা করেছেন। তাই আমাদের স্রষ্টা আমাদেরকে এদেশে পয়দা করাই যখন পছন্দ করেছেন, তখন এদেশের প্রতি আমাদের মহব্বত অন্য সব দেশ থেকে বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

মানুষ যে দেশের আবহাওয়ায় শৈশব থেকে যৌবন কাল পর্যন্ত গড়ে ওঠে, সে দেশের প্রকৃতির সাথে তার গভীর আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। শিশু অবচেতনভাবেই যেমন তার মাকে ভালবাসে, তেমনি জন্মভূমির ভালবাসাও মানব মনে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়। তাই জন্মভূমিতেই মানুষ Natural Citizen (জন্মসূত্রে নাগরিক) হিসেবে গণ্য হয়। জন্মগত নাগরিকের দেশপ্রেম স্বভাবজাত বলে এটা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন ছাড়াই তাকে নাগরিক বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু এক দেশের অধিবাসী অন্য দেশে গিয়ে তার দেশ প্রেমের প্রমাণ না দেয়া পর্যন্ত তাকে নাগরিক গণ্য করা হয় না।

যারা এদেশেই পয়দা হয়েছে, তাদের সবার মধ্যেই দেশপ্রেম প্রকৃতিগতভাবেই আছে। এ দেশপ্রেমকে সঠিকভাবে বিকশিত করা ও সচেতনভাবে জাগ্রত করার অভাবে মানুষে মানুষে এর গভীরতার পার্থক্য হতে পারে। তাই সব দেশেই নাগরিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চলে। দেশপ্রেমের এ চেতনা প্রকৃত মুসলিম জীবনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ তাকে যে দেশে পয়দা করেছেন, সে দেশের প্রতি গভীর কর্তব্যবোধ অন্যের চেয়ে সচেতন মুসলিমের মধ্যে বেশী হওয়াই উচিত। প্রত্যেক নবী যে দেশে পয়দা হয়েছেন, সে দেশেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। বাধ্য না হলে কোন নবীই দেশ ত্যাগ করেননি।

www.icsbook.info

এসব অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের জন্মভূমি হিসেবে বাংলাদেশের সাথে আমাদের গভীর ভালবাসার সম্পর্ক অত্যন্ত সজাগ ও সতেজ থাকতে হবে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করাই আমাদের পার্থিব প্রধান কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত যমীন হলো জন্মভূমি। জন্মভূমিতে এ কর্তব্য পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য দেশে হিযরত করাও জায়েয নয়। নবীগণও আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত হিযরত করেননি। হযরত ইউনুস (আঃ) নির্দেশের পূর্বেই হিযরত করায় আল্লাহ পাক তাঁর ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সত্যিকার মুসলিমের ভালবাসা তার জন্মভূমির ক্ষুদ্র এলাকায় এমন সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না যে, অন্যান্য দেশকে সে ঘৃণা করবে। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করাই তার পার্থিব জীবনের প্রধানতম কর্তব্য। এ কর্তব্যের তাকীদে তার জন্মভূমিতে দ্বীন কায়েম করার সাথে সাথে গোটা মানব সমাজে ইসলামের শান্তিময় জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে হবে। এ দায়িত্ববোধ তাকে শুধু দেশপ্রেমিক হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না—তাকে বিশ্বপ্রেমিক হতে বাধ্য করে। আল্লাহর রাসূলই মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিশ্বনবীর জীবনে আমরা দেশপ্রেমের যে নমুনা দেখতে পাই তা আমাদের চিরন্তন দিশারী। তিনি তার প্রিয় জন্মভূমিতে আল্লাহর রচিত জীবন বিধান কায়েমের চেষ্টা করে চরম বিরোধিতার ফলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখান থেকে দ্বীনের বিজয়কে সম্প্রসারিত করে আবার জন্মভূমিতেই তা কায়েম করেন। তিনি "ইকামাতে দ্বীনের" এ দায়িত্ববোধ সমস্ত মুসলিমের মধ্যে এমন তীব্রভাবে জাগ্রত করেন যার ফলে তাঁর অনুসারীগণ সারা দুনিয়ায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন।

(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)

বাংলাদেশের জনগণের সাথে আমাদের সম্পর্ক

এক মায়ের সন্তানদের মধ্যে যেমন একটা বিশেষ ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নেয়, তেমনি এক দেশে জন্মলাভের দরুনও দেশবাসীর মধ্যে পারস্পরিক একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে একই ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসী বিদেশে একে অপরকে ভাইয়ের মতো আপন মনে করে। ভাষার ঐক্য তাদেরকে আরও আপন করে নেয়। এর সাথে ধর্মের ঐক্য থাকলে এ সম্পর্ক আরও গভীর হয়। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি মিলে এক দেশের অধিবাসীরা অন্য দেশের মানুষ থেকে ভিন্নতর এক ঐক্যবোধ নিজেদের মধ্যে অনুভব করে। মা-কে কেন্দ্র করে যেমন পারিবারিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে, তেমনি জন্মভূমিকে

www.icsbook.info

কেন্দ্র করে দেশভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জন্মে। তাই নিজ দেশের সকল মানুষই অন্য দেশের মানুষের তুলনায় অধিকতর আপন মনে হয়।

বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় প্রায় দশ* কোটি লোক বসবাস করে। বাংলাদেশী হিসেবে সবার সাথেই আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় আমরা সমান অংশীদার। ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী আমাদের ভাই-বোন।

সবার কল্যাণের সাথেই আমাদের মঙ্গল জড়িত। এদেশে আমরা যে আদর্শ কায়েম করতে চাই এর আহবান সবার নিকটই পৌঁছাতে হবে। আমাদের সবারই স্রষ্টা আল্লাহ। তাঁর দেয়া আদর্শ অমুসলিমদের মধ্যে পৌঁছান আমাদেরই কর্তব্য। আল্লাহর সৃষ্ট সূর্য, চন্দ্র, আলো, বাতাস ইত্যাদি আমরা যেমন সমভাবে ভোগ করছি আল্লাহর দ্বীনের মহা নিয়ামতও আমাদের সবার প্রাপ্য। বংশগতভাবে মুসলিম হবার দাবীদার হওয়ার দরুন আল্লাহর দ্বীনকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পদ মনে করা উচিত নয়। অমুসলিম ভাইদেরও যে তাদের স্বার্থেই দ্বীন ইসলামকে জানা প্রয়োজন এবং গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করা কর্তব্য সে বিষয়ে আমাদের দেশীয় ভাই হিসেবে তাদেরকে মহব্বতের সাথে একথা বুঝানো আমাদের বিরাট দায়িত্ব ও দ্বীনী কর্তব্য।

আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) ও আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান হিসেবে তো সকল মানুষই সবার ভাই-বোন। গোটা মানব জাতিকেই সে হিসেবে ভালবাসা কর্তব্য। বিশ্ব নবী মানবতার ভালবাসাই বাস্তবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কিন্তু নিজের দেশের অধিবাসী হিসেবে বাংলাদেশের অমুসলিগণ বিশেষভাবে আমাদের ভালবাসার পাত্র।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে কৃত্রিম কোন বিভেদ সৃষ্টি করা মহা অন্যায়। ভাষা, বর্ণ, দেশ, পেশা, ধনী বা গরীব হওয়া ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করা আল্লাহর নিকট মহাপাপ। আল্লাহ পাক মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই দু'টো শ্রেণীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কুরআন পাকে বহুস্থানে তাদের পরিচয় পাশাপাশি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। একটি শ্রেণী হলো আল্লাহর দাস, রাসূলের অনুসারী সচ্চরিত্র, ন্যায়পরায়ণ এবং মানবীয় সৎগুণাবলীর অধিকারী, অপরটি হলো নাফস্ (প্রবৃত্তি) ও শয়তানের দাস এবং খোদাদ্রোহী ও জালিম। এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে সব ভাষা, বর্ণ, দেশ ও পেশার আদম সন্তানই রয়েছে। দুনিয়ার সব ভাল মানুষ এক শ্রেণীর আর দুষ্টরা ভিন্ন

* বর্তমানে এ সংখ্যা প্রায় বার কোটি।

www.icsbook.info

শ্রেণীর। সে হিসেবে বাংলাদেশেও সৎলোকগণ আমাদের বেশী আপন বটে, কিন্তু অন্যদেরকে ঘৃণা করাও নিষেধ। তাদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করাও আমাদের কর্তব্য।

এক হিসেবে সমস্ত মানুষই বিশ্বনবীর উম্মত। নবীর উপর যে জনপদের মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাবার দায়িত্ব অর্পিত হয়, সে এলাকার সব মানুষই নবীর উম্মত। তাই সমস্ত মানুষই বিশ্বনবীর উম্মত। কিন্তু উম্মত হলেও তারা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। যারা নবীর দাওয়াত কবুল করে তাঁর অনুসারী হয়, তারা "উম্মত বিল ইজাবাত" (যারা দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে) আর বাকী সবাই "উম্মত বিদ-দাওয়াত" (যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাতে হবে)। বাংলাদেশের অমুসলিমদের "উম্মত বিদ-দাওয়াত" বিবেচনা করে আমাদেরকে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে।

সুতরাং বাংলাদেশের সব মানুষকেই আমরা আল্লাহর মহান সৃষ্টি হিসেবে স্বাভাবিকভাবে ভালবাসবো। এ ভালবাসা শুধু তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের দিকে আনার জন্যই নয়। এদেশের মানুষ এত অভাবী যে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার উপযোগী সম্বলও অর্ধেক লোকের নেই। পুষ্টির অভাবে অর্ধেকের বেশী শিশু এবং বয়স্ক লোক দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। সুচিকিৎসার সুযোগ অধিকাংশেরই নেই। মাথা গুঁজবার মতো একটু নিজস্ব ঠাঁই শতকরা ২৫ জনেরই নেই। শিক্ষার আলো অতি সীমিত। যে দেশের অর্ধেক লোক ভাত-কাপড়ের অভাবে জীর্ণ, সে দেশের অধিবাসী হয়ে আমাদের মনে যদি তীব্র বেদনাবোধ না জাগে, তাহলে রাসূলের প্রতি আমাদের মহব্বতের দাবী অর্থহীন। এদেশের মানুষকে বস্তুগত ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই উন্নত করতে হবে। হাদীসে আছে, দারিদ্র মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। অবশ্য অর্থও অনর্থের মূল বটে, কিন্তু মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা না হলে ঈমান বাঁচবে কি করে?

ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য এ মমত্ববোধ ও দরদ না থাকলে আল্লাহর নবীর আদর্শের খেদমত কখনও সম্ভবপর নয়। জনগণের জন্য এ দরদী মনেরই দেশে সবচেয়ে বড় অভাব। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যেও যদি এ অভাব থাকে, তাহলে আর যাই হোক জনগণের খেদমত করার সত্যিকার যোগ্যতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না।

(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পর্ক

বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন, তাদের সবাইকে আমরা এ কারণেই শ্রদ্ধা করি যে, তারাও দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, দেশকে উন্নত করতে

www.icsbook.info

চান, দেশের সমস্যাগুলোর সমাধানে আগ্রহী এবং জনগণের কল্যাণকামী। তারা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নন, গোটা দেশের ভাল-মন্দ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এ ধরনের লোকদের সঠিক প্রচেষ্টায়ই একটি দেশ সত্যিকার উন্নতি লাভ করতে পারে। যারা দেশ গড়ার চিন্তাই করে না, যারা কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠায়ই ব্যস্ত, তারা দেশের সম্পদ নয়, তারা দেশের আপদ। কিন্তু যারা শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনীতি করনে, তারা দেশের কলংক। আর যারা দৈহিক শক্তি বা অস্ত্রশক্তির বলে জনগণের উপর শাসক সেজে বসতে চায়, তারা দেশের ডাকাত।

সব রকম রাজনৈতিক দলের প্রতি সম্মানবোধ সত্ত্বেও সবার সাথে আমাদের সমান সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন মানদন্ডে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

১। যেসব দল ইসলামকে দলীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকার করেন।

২। যেসব দল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী।

৩। যেসব দল সমাজতন্ত্রের আদর্শে দেশ গড়তে চায়।

আমরা যেহেতু ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, সেহেতু প্রথম শ্রেণীভুক্ত দলগুলোর সাথে আমাদের আর্দশিক সম্পর্কের দরুন তাদের সংগে আমাদের নিম্নরূপ সম্বন্ধ বজায় রাখতে হবে ঃ

(ক) ইসলাম-বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে তাদের কারো উপর হামলা হলে আমরা ন্যায়ের খাতিরে তাদের পক্ষে থাকব ও হামলা প্রতিহত করতে সাহয্য করব।

(খ) ইসলামী দল হিসেবে যারা পরিচয় দেন, তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করব। এ সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই তাদেরকে দ্বীনী ভাই হিসেবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব।

(গ) ইসলামী দলের নেতা ও কর্মীদের জন্য যেসব বিশেষ গুণ অপরিহার্য, সে বিষয়ে কোন দলের মধ্যে কোন কমতি বা ত্রুটি দেখা গেলে মহব্বতের সাথে সে বিষয়ে তাদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরিয়ে দিব। অনুরূপভাবে আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে তা কবুল করব।

(ঘ) কোন সময় যদি কোন ইসলামপন্থী দল আমাদের বিরোধিতা করেন, তবুও আমরা তাদের বিরোধিতা করব না। প্রয়োজন হলে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় জওয়াব দেব।

(ঙ) নির্বাচনের সময় তাদের সাথে দরকার হলে সমঝোতা করব।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বরে উল্লিখিত দলগুলোর সাথে আমরা নিম্নরূপ সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করব ঃ

(ক) যেসব রাজনৈতিক দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে জীবনাদর্শ মনে করে না, তাদের সাথেও আমরা কোন প্রকার শত্রুতার মনোভাব পোষণ করব না। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মত ও পথ বাছাই করার স্বাধীনতা সবারই থাকা উচিত। আমরা তাদের মত ও পথকে ভুল মনে করলে যুক্তির মাধ্যমে শালীন ভাষায় অবশ্যই সমালোচনা করব।

(খ) তাদের কেউ আমাদের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ করলেও আমরা আমাদের শালীনতার মান বজায় রেখেই জওয়াব দেব। গালির জওয়াবে আমরা কখনও গালি দেব না বা অন্যায় দোষারোপের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা ন্যায়ের সীমা লংঘন করব না।

(গ) দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণে তাদের যেসব কাজকে আমরা মঙ্গলজনক মনে করব, সে সব ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহযোগিতা করব।

দেশের স্বার্থ এবং জনগণের কল্যাণের নামে সরকার যা কিছু করেন তার সাথে সবাই একমত নাও হতে পারে। তাছাড়া সরকার ভুল করছেন বলে আন্তরিকতার সাথেই কেউ অনুভব করতে পারে। তাই সরকার তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা পরামর্শ হিসেবে যদি গ্রহণ করেন, তাহলে দেশের মঙ্গল হতে পারে। যারা অন্ধভাবে সবসময় সরকারকে সমর্থন করে , তারা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে তা করতে পারে। আর যারা সব ব্যাপারেই বিরোধিতা করে, তারা বিরোধিতার জন্যই তা করে থাকে। আমরা এর কোনটাকেই গণতন্ত্রের সহায়ক ও দেশের জন্য কল্যাণকর মনে করি না।

সত্যিকার বিরোধী দলের আদর্শ ভূমিকাই আমরা পালন করতে চাই। সরকারের ভাল কাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজের দোষ ও ভুল ধরিয়ে দেয়াই আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। সৎকাজে উৎসাহ দান ও অসৎকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা এ ভূমিকারই অঙ্গ। বিরোধী দলীয় ভূমিকাব নামে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকারকে ক্ষমাতচ্যুত করাকে আমরা জাতির সেবা মনে করি না। কিন্তু সরকার নিজেই যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ বেছে নেন বা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনসমর্থনের পরিবর্তে অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আমাদের কর্তব্য মনে করব এবং তখন দেশ ও জনগণের স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা আমরা ফরয মনে করব।

(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)

www.icsbook.info

বাংলাদেশের রাজনীতি

রাজনীতির সংজ্ঞা

একটা দেশে সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ, সরকার পরিবর্তন ও জনগণকে সংগঠিত করা ও তাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মকান্ডকে সাধারণ অর্থে রাজনীতি বলা হয়। রাষ্ট্র বা রাজ্য পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীই রাজনীতি।

বাংলাভাষায় রাষ্ট্র ও সরকার সংক্রান্ত কার্যাবলীকে রাজ্যনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বলা উচিত ছিল। কিন্তু পূর্বে যেহেতু রাজারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করতো সে কারণেই হয়তো রাজার নীতিকেই রাজনীতি বলা হতো।

ইংরেজী 'পলিটিকেল সাইন্স' এর অনুবাদ বাংলায় 'রাষ্ট্র বিজ্ঞানই' চালু হয়েছে, 'রাজনীতি বিজ্ঞান' বলা হয় না। সে হিসেবে পলিটিকস্ শব্দের বাংলা রাষ্ট্রনীতিও হতে পারতো। কিন্তু শব্দটি উচ্চারণে জনগণের জন্য সহজ নয় বলে 'রাজনীতি' শব্দই চালু হয়ে গেছে। বর্তমানে রাষ্ট্র ও সরকারে যে পার্থক্য স্বীকৃত সে পার্থক্য অনুযায়ী রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়াদি 'রাষ্ট্রনীতি' ও সরকার সম্বন্ধীয় কার্যাবলী 'রাজনীতি' হিসেবে পরিচিত।

নীতির রাজাই রাজনীতি ঃ রাজনীতি শব্দটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হলে পরিভাষা হিসেবে এর সঠিক মর্যাদা দেয়া যায়। একটা দেশের যাবতীয় ব্যাপারে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিকে যত নীতি ও বিধি রয়েছে তা রাজনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সে হিসেবে রাজনীতিই সেরা নীতি, বাকী সব নীতি তারই অধীন। তাই রাজার নীতি রাজনীতি নয় বরং নীতির রাজাই রাজনীতি। যেমন রাজার হাঁসকে রাজহাঁস বলে না বরং হাঁসের রাজাকে রাজহাঁস বলা হয়।

কদর্থে 'রাজনীতি' শব্দের ব্যবহার ঃ এক শ্রেণীর রাজনীতিকের চালবাজী ও ধোঁকাবাজী রাজনীতিকে এতটা কুলষিত করে ফেলেছে যে কূটকৌশলে অপরকে ঘায়েল করাকেও রাজনীতি বলা হয়। তাই অসৎ আচরণ, পেচানো কথা ও কুটিল চক্রান্ত দেখলে মন্তব্য করা হয় যে, 'আমার সাথে পলিটিকস্ করবেন না, আমি সরল সোজা ব্যবহার চাই'।

www.icsbook.info

এ দ্বারা একথা বুঝানো হচ্ছে যে, রাজনীতি মানেই প্রতিপক্ষকে কৌশলে পরাজিত করার জন্য নৈতিকতা, সততা, মনুষত্ব ও যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধ বির্সজন দেয়া। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে সততা ও সরলতাকে পলিসি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। নীতির খাতিরে না হলেও অন্তত পলিসি (কৌশল) হিসেবেও সততা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। Honesty is the best policy if not Virtue. সততা পুণ্য না হলেও অবশ্যই সেরা পলিসি হিসেবে গণ্য। কিন্তু রাজনীতিতে যেন পলিসিই হলো ধোঁকাবাজী। এভাবে রাজনীতি কদর্থেই বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এর জন্য অসৎ রাজনীতিকরাই দায়ী।

অগণতান্ত্রিক রাজনীতির ধরন ঃ যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তারা সকল তৎপরতা, শ্রম ও সাধনা লাগিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। কিভাবে ছলেবলে কলে কৌশলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় কেবল এটাই তাদের সার্বক্ষণিক চিন্তা। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা যে কোন কাজ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে সকল প্রকার চক্রান্ত করাও তারা তাদের জন্য জায়েজ মনে করে। তাদের নীতি হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রকার কাজই বৈধ—হোক তা জুলুম, অন্যায়, অত্যাচার বা হত্যার মত জঘন্য পথ। মোটকথা ক্ষমতাকে টারগেট বানিয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপ করাই তাদের রাজনীতি।

দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যা করা প্রয়োজন তারা সেটাকেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ মনে করে। জনগণের কিছু খেদমত করেই হোক কিংবা জনগণের মধ্য থেকে একদল কায়েমী স্বার্থবাদী লোক তৈরী করেই হোক ক্ষমতায় টিকে থাকাটাই তাদের আসল রাজনীতি।

রাজনীতির গণতান্ত্রিক সংজ্ঞা ঃ জনগণের সম্মতি নিয়ে সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুসংগঠিত প্রচেষ্টাকে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতি বলা হয়। জনগণ গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিনিধিদেরকে ক্ষমতার আসনে বসালে আন্তরিকতার সাথে তারা দেশ ও জনগণের সেবা করে। এ সেবার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সেবা হলো সরকার গঠন ও পরিবর্তনে জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকরী রাখা। যারা ক্ষমতায় গিয়ে সরকার গঠন, পরিচালনা কিংবা সরকার পরিবর্তনে জনগণের ক্ষমতা খর্ব বা ধ্বংস করতে চায় তারা আর যাই হোক গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে না। সরকার পরিচালনায়, দেশের উন্নয়নে ও জনগণের সেবার ব্যাপারে অন্য সব দলের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করাও গণতান্ত্রিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। কারণ গণতন্ত্রে বিরোধীদলও সরকারেরই অংশ হিসেবে বিবেচ্য।

www.icsbook.info

এ গণতান্ত্রিক সংজ্ঞায় বিরোধী দলের রাজনীতি হল সরকার পরিচালনা, জাতীয় উন্নয়ন ও জনসেবার ব্যাপারে সরকারী দল থেকে উন্নততর কর্মসূচী নিয়ে জনগণের সমর্থন হাসিলের চেষ্টা এবং সরকারের ভুল-ভ্রান্তিকে সংশোধন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

অবিভক্ত ভারতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন থেকেই এদেশে গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছে। ৫০ বছরের বেশী হলো গণতান্ত্রিক রাজনীতি চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, জনগণের ভোটে যারা ক্ষমতায় যান তারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজই বেশী যোগ্যতার সাথে করার চেষ্টা করে এসেছেন।

আমাদের দেশে পরিকল্পিতভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালু না হবার ফলে গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সৃষ্টি হতে পারেনি। এদেশে রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নীচ পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র দলীয় বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ দলীয় সংগঠনে গণতান্ত্রিক নীতিকে নিষ্ঠার সাথে পালন করেননি। যারা দলীয় সংগঠনে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত তারা সম্ভাবনাময় নতুন নেতা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা না করে তাদের অগ্রগতিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। ফলে দলগুলোর অভ্যন্তরে নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের বিকাশ লাভ সম্ভব হয়নি। এ ধরনের লোক নির্বাচনের মারফতে ক্ষমতায় এলেও স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্রকে বেশী ভয় করে। যারা নিজেদের দলেই অন্যায়ভাবে বিকল্প নেতৃত্বকে রুখে দাঁড়ায়, তারা ক্ষমতায় গিয়ে কিভাবে বিকল্প দলকে সুযোগ দিতে পারে? এভাবে দেশে ৫০ বছর গণতন্ত্রের নামে রাজনীতি চলা সত্ত্বেও এ দেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেনি।

ইংরেজ শাসনের অধীনে অবিভক্ত ভারতে একই ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ থাকলেও বর্তমানে খন্ডিত ভারতে যেটুকু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে সে পরিমাণও এদেশে সৃষ্টি না হওয়ার প্রধান কারণ আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শিক দুর্বলতা ও নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের অভাব। ফলে আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জননেতা যেমন সৃষ্টি হতে পারেনি, তেমনি জনগণের মধ্যেও সুস্থ গণতন্ত্রের ট্রেনিং সম্ভব হয়নি। বরং রাজনৈতিক ময়দানে এ ধরনের কার্যকলাপ চালু হয়ে গেছে যাতে ভদ্র-রুচিসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষিত ও উন্নত মানবিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের পক্ষে রাজনীতি করাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু অলক্ষেই মানুষের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, পলিটিকস্ করতে হলে ডানপিটে মেজাজের লোক

www.icsbook.info

দরকার , প্রতিপক্ষকে গায়ের জোরে দমিয়ে রাখার যোগ্য নিজস্ব ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠিত করা দরকার , অন্যদলের লোকদেরকে শাণিত ভাষায় আক্রমণ করার যোগ্য ধারালো মুখ দরকার। ক্ষমতায় থাকাকালে এক ধরনের কথা বলায় অভ্যস্ত হতে হবে, আর ক্ষমতা থেকে অপসারিত হলেই ভিন্ন ধরনের কথা বলার যোগ্য হতে হবে। বস্তুতপক্ষে এসবই যদি রাজনীতির 'নীতি' হয় তাহলে যে ধরনের নেতৃত্ব কর্মীবাহিনী ও গণশিক্ষা চালু হওয়া স্বাভাবিক, আমাদের দেশে নিঃসন্দেহে তাই চালু হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই সরকারী দল এমন ভাষায় বিরোধী দলের সমালোচনা করেন যাতে তাদের সম্পর্কে সামান্য শ্রদ্ধা বোধেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। আর এ সমালোচনায় যুক্তির চেয়ে শক্তি প্রদর্শনের মনোবৃত্তিই সুস্পষ্ট। বিরোধী দল সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে গালি-গালাজের ভাষা প্রয়োগ করার ফলে জনগণের ধারণা হয় যে, সরকারের নিকট যুক্তি না থাকার কারণেই তারা বেসামাল হয়ে পড়েছে। অন্য দিকে বিরোধীদলও এমন ভাষায় সরকারের সমালোচনা করে যা শুনলে রুচিবান লোকদের রাজনীতির প্রতি ঘৃণা ধরে যায়। তাদের আস্ফালন থেকে যে অধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আর একটা নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে এখনই কোন প্রকারে গদি হাসিল করা তাদের লক্ষ্য। এ জাতীয় সরকার ও বিরোধীদলীয় রাজনীতিই এদেশের ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অগণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিণাম ঃ উল্লেখিত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈ-হাচারী রাজনীতি চর্চার পরিণামে ঃ

(১) রাজনীতিতে যে উন্নত ও নৈতিক মানের লোকের প্রয়োজন তারা রাজনৈতিক ময়দানে আসার সাহস পায় না। (২) যারা রাজনৈতিক মায়দানে আসে তারা এমন ধরনের প্রশিক্ষণ পায় যার মাধ্যমে নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি হয় না। (৩) রাজনৈতিক পরিবেশটাকে এমন একটা যুদ্ধের ময়দান বানিয়ে রাখা হয় যেখানে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নীতিজ্ঞানবর্জিত যে কোন কাজ করাই জায়েজ বলে বিবেচিত হয়। (৪) জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের জন্য আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয় না। তারা রাজনৈতিক নেতাদেরকে ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর ও সুযোগ সন্ধানী বলে ধারণা করতে বাধ্য হয়। জনগণের নিঃস্বার্থ খাদেম হিসেবে তাদের যে শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত সেটা স্বাভাবিকভাবেই তারা পান না। (৫) রাজনৈতিক দিক দিয়ে জনগণও এমন শিক্ষা পায় না যার ফলে দেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকতে পারে। জনগণকে কৃত্রিম উপায়ে রাজনৈতিক উস্কানির মারফত সরকার বিরোধী বানাবার যে চেষ্টা চলে তাতে প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক

www.icsbook.info

আন্দোলন রাজনৈতিক বিদ্রোহের রূপ নেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বুদ্ধি ও যুক্তির লড়াই-এর স্থলে শক্তি প্রয়োগের লড়াই রাজনীতিকে সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দেয়। এতে ক্ষমতা দখলই রাজনৈতিক আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ গণতন্ত্রে বিরোধী দলে থেকেও দেশ ও জাতির বিরাট খেদমত করা যায়। সরকারী দল ও বিরোধীদল পরস্পর পরিপূরক হিসেবে জনগণের নিকট পরিচিত হলে রাজনৈতিক ময়দানে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। (৬) অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতিতেই গণতন্ত্রের দুশমনরা রাজনৈতিক ময়দানকে তাদের স্বার্থের পক্ষে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। বন্দুকের নলের মারফত বিপ্লবে যারা বিশ্বাসী, তারা গণতান্ত্রিক পরিবেশে কখনও তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে না। অথচ তারাও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকে। কারণ গণতন্ত্র এমন এক আদর্শ যার বিরুদ্ধে কথা বলে সর্মথন লাভ করা সম্ভব নয়।

গণতন্ত্র পেতে হলে যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে দাবী করেন, যারা এ ধরনের উগ্রপন্থী লোকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চান না, তাদেরকে অবশ্যই গণ উস্কানীমূলক রাজনীতি পরিহার করতে হবে। কারণ, অগণতান্ত্রিক পন্থায় কখনো গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। মুখে গণতন্ত্র বলা সত্ত্বেও যারা বাস্তব ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক কর্মপন্থা অবলম্বন করে তাদেরকে গণতন্ত্রের বন্ধু মনে করার কোনই কারণ নেই।

যারা রাজনীতি করেন একমাত্র তাদের পক্ষেই রাজনৈতিক ময়দানে অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। যারা রাজনীতি করেন না তাঁরা রাজনীতির অসুস্থ পরিবেশ দেখে উদ্বিগ্ন হতে পারেন, রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে পারেন, কিন্তু রাজনীতি হতে দূরে থেকে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ আশা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যারা অগণতান্ত্রিক রাজনীতি, উগ্র আন্দোলন ও নীতি বর্জিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দেশকে মুক্ত দেখতে চান তারা রাজনীতিতে সরাসরি অংশ গ্রহণ করলেই এ পরিবেশ বদলানো সম্ভব। রুচিবান, জ্ঞানী, ধৈর্যশীল ও শালীন ব্যক্তিগণ রাজনীতির ময়দানে না এসে ঘরে বসে বর্তমান অসুস্থ রাজনীতির বিরুদ্ধে যতই ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করুক না কেন তার কোন মূল্য নেই। এ ধরনের লোকদের রাজনীতিতে অনুপস্থিতর কারণেই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হচ্ছে না। এ ধরনের লোকেরা রাজনীতিতে অগ্রসর হলেই কেবল অবাঞ্ছিত লোকদেরকে রাজনীতি থেকে উৎখাত করা সম্ভব।

অনেক সুধিজন বলে থাকেন, 'আমি রাজনীতি করি না'। তারা শিক্ষিত সমাজ সচেতন, বুদ্ধিমান ও গুণী। ঘরোয়া পরিবেশে রাজনীতি নিয়ে বেশ

www.icsbook.info

চর্চাও করেন। অথচ তারা বলেন যে, তারা রাজনীতি করেন না। সবাই কিন্তু একই ধরনের মনোভাব নিয়ে একথা বলেন না।

কেউ এ অর্থে বলেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দলে সক্রিয় নন। কেউ রাজনীতি করা পছন্দ যে করেন না সেকথাই প্রকাশ করতে চান। কিন্তু আমি রাজনীতি করি না কথাটাও এক সূক্ষ্ম রাজনীতি। তিনি নির্বাচনে ভোট দিয়ে থাকেন। আলাপ আলোচনায় বুঝা যায় যে, কোন্ দলের রাজনৈতিক বক্তব্য তিনি পছন্দ করেন। অথচ দাবী করেন যে, তিনি রাজনীতি করেন না। তিনি অবশ্যই রাজনীতি করেন। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে যে ঝুঁকি আছে তা থেকে নিরাপদ থাকতে চান। এটা কিন্তু সুবিধাবাদী রাজনীতিরই এক বিশেষ ধরন। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির নীতিমালা

যারা রাজনীতি করেন, তাদের উপরেই ভাল-মন্দ প্রধানত নির্ভরশীল। ভ্রান্ত রাজনীতি গোটা দেশকে বিপন্ন করতে পারে। ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে জগণের দুর্গতির কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে প্রতিযোগিতার এ দুনিয়ায় বাঞ্ছিত উন্নতির দিকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকলে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষেই নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য ঃ

১। সকল রাজনৈতিক দলকেই নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে জনগণই খিলাফতের (রাজনৈতিক ক্ষমতার) অধিকারী ও সরকারী ক্ষমতার উৎস।

২। গণতন্ত্রের এই প্রথম কথাকে স্বীকার করার প্রমাণ স্বরূপ নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা হাসিলের চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩। বাংলাদেশের সম্মান রক্ষা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে এবং এর বিপরীত আচরণ সর্তকতার সাথে বর্জন করতে হবে। অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশকে সহজেই দুনিয়ায় নিন্দনীয় বানায়। তাই দেশের সম্মান রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সরকারী দলের।

৪। অভদ্র ভাষায় সমালোচনা করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করা এবং দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করাকে রাজনৈতিক গুন্ডামি ও লুটতরাজ মনে করে ঘৃণা করতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থে লুটতরাজ ও গুন্ডামী করাকে সবাই অন্যায় মনে করে। কিন্তু এক শ্রেণীর ভ্রান্ত মতবাদ রাজনৈতিক ময়দানে এসব

www.icsbook.info

জঘন্য কাজকেই বলিষ্ঠ নীতি হিসেবে ঘোষণা করে। এ ধরনের কার্যকলাপের প্রশ্রয়দাতাদেরকে গণতন্ত্রের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

৫। সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা দলকে স্বাধীনতার শত্রু, দেশদ্রোহী, বিদেশের দালাল, দেশের দুশমন ইত্যাদি গালি দেয়াকে রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। সবাই যদি আমরা একে অপরকে এ গালি দিতে থাকি, তাহলে দুনিয়াবাসীকে এ ধারণাই দেয়া হবে যে, এদেশের সবাই কারো না কারো দালাল, এমন দেশের কোন মর্যাদাই দুনিয়ায় স্বীকৃত হতে পারে না।

উপরোক্ত নীতিমালার বাস্তাবায়ন প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের আচরণের উপর নির্ভরশীল। তাদের সহনশীলতা ও নিষ্ঠাই অন্যদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে। সরকারী দল ক্ষমতায় অন্যায়ভাবে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে যদি এ নীতিমালা অমান্য করে, তাহলে তাদের পরিণাম পূর্ববর্তী শাসকদের মতই হবে একথা তাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

(বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠনকেই রাজনৈতিক দল বলে। যে দেশে গণতন্ত্র নেই এবং যেখানে সরকারী দল ছাড়া কোন দল গঠনের অধিকার দেয়া হয় না সেখানে ক্ষমতাশীনরা নিজেদেরকে রাজেনৈতিক দল হিসেবে পরিচয় দেয়ার যতই চেষ্টা করুক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এ ধরনের কোন সংগঠনকে রাজনৈতিক দলরূপে গণ্য করা হয় না। তাই রাজনৈতিক দল একমাত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই জন্ম নেয় এবং টিকে থাকে।

দলগঠনের গণতান্ত্রিক পন্থা ঃ আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি বস্তু একটা বৃক্ষের বিকাশের ন্যায় গড়ে উঠে। কার্যত স্বাভাবিকতার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। গণতন্ত্রেও দল গঠনের ব্যাপারে স্বাভাবিকতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি হচ্ছে ঃ

১। এক বা একাধিক বক্তি দেশের সমস্যাবলীর সমাধান বা দেশের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন দৃষ্টিভংগী পোষণ করলে কিংবা কোন রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হলে দল গঠনের উদ্যোগ নেয়।

২। উদ্যোগীর প্রথম কাজ হল তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করে কিছু লোককে এর সমর্থক বানানোর চেষ্টা করা।

www.icsbook.info

৩। অতপর কোন ব্যক্তি কিংবা কমিটি দল গঠনের জন্য আহবায়ক হিসেবে কাজ করে এবং সম্মত ও সমচিন্তার লোকদেরকে কোন সম্মেলনে একত্রিত করে।

৪। সম্মেলনে যারা উপস্থিত হয় তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংগঠনের স্বাভাবিক কাজ শুরু হয়।

৫। দলের গঠনতন্ত্র রচিত হলে জনগণকে সে অনুযায়ী সংগঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়।

দল গঠনের অগণতান্ত্রিক পন্থা ঃ পাকিস্তান আমল থেকে ক্ষমতাসীন এক নায়কের ইচ্ছা ও নির্দেশে অগণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক দল গঠনের কয়েকটি নমুনা এদেশেই কায়েম হয়েছে।

১। ১৯৫৭ সালে ইসকান্দার মির্জা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকা কালে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয় পরিষদ সদস্যদের দ্বারা রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি দল গঠন করা হল এবং ফিরোজ খান নুনকে এর নেতা বানিয়ে প্রধান মন্ত্রী করা হল। '৫৮ সালে আইয়ুব খান ইসকান্দার মির্জাকে বিদেশে তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করার পর রিপাবলিকান পার্টি খতম হয়ে গেল।

২। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার পর সামরিক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নেতৃত্বে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। মুসলিম লীগের কতক নেতাকে বাগিয়ে নিয়ে তার দলের নাম রাখা হল মুসলিম লীগ। তার পতনের পর সে দল আপনিই মরে গেল।

একনায়কবাদী দলের বৈশিষ্ট্য ঃ দল গঠনের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম এ দু'টো উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের দলের বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক দল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(ক) ক্ষমতাসীন একনায়ক যাদেরকে নিয়ে দল গঠন করে, তারা কোন রাজনৈতিক দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে বা দেশের সমস্যার সমাধানের তাকিদে ঐ দলে যোগ দেয় না। বরং একনায়কের অনুগ্রহ নিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল করাই তাদের উদ্দেশ্য। এটাই তাদের আদর্শ।

(খ) রাজনৈতিক দল আগে গঠিত হয় এবং দলের মাধ্যমে ক্ষমতা হাসিল হয়। আর একনায়ক আগে ক্ষমতা দখল করে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়োজনে সুবিধাবাদীদের সমন্বয়ে দল গঠন করে।

(গ) একনায়কের তৈরী দল হল তার সেবক। একনায়ক দলের নির্বাচিত নেতা নয়, এ নেতাকে বদলাবার ক্ষমতাও দলের নেই। দলের আর সব

www.icsbook.info

'নেতা' একনায়কের ব্যক্তিগত কর্মচারী। এ জাতীয় দলে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেতা হয় না। একনায়কই দলের স্বঘোষিত নেতা। তার ইচ্ছাই দলের ইচ্ছা। তার মর্জি পূরণ করাই দলের একমাত্র কর্মসূচী।

(ঘ) এ ধরনের দলের যেহেতু ক্ষমতা ভোগ করা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দর্শন থাকে না, সেহেতু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সুবিধাবাদীরা একনায়ককে ঘিরে সংঘবদ্ধ হয়। বিভিন্ন চিন্তাধারার লোক একনায়কের নেতৃত্ব মেনে এক সংগঠনভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে সত্যিকারের সাংগঠনিক ঐক্য সম্ভব হয় না। সুবিধাবাদ এবং ক্ষমতা ভোগই ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতা দলের নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত। দলের রীতি ও আদর্শের বিপরীত চললে তার নেতৃত্ব বিপন্ন হয়। নেতারা দলের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য। দলের প্রাধান্য নেতাদেরকেও মানতে হয়। রাজনৈতিক দল দলীয় নেতৃত্ব একনায়কত্ব মানতে রাজী হয় না। একনায়কবাদী দলের নেতৃত্ব একনায়কেরই কুক্ষিগত, এমন কি দলের অস্তিত্বও তারই মরজীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

বর্তমান দলগুলোর অবস্থা ঃ বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা নির্ণয় করা দস্তুরমত মুশকিলের ব্যাপার। এক নামেও একাধিক দল আছে। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও গঠন পদ্ধতি অনুযায়ী বর্তমান সরকারী দলকে কোন রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা তা অগণতান্ত্রিক একনায়কবাদী দল গঠনের যে আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে সে আলোকে বিচার করার দায়িত্ব পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

অন্যান্য দলগুলোকে শ্রেণী বিন্যাস করলে নিম্নরূপ চিত্র ফুটে উঠে ঃ

১। সমাজতন্ত্রী দল ঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(ক) রুশপন্থী

(খ) চীনপন্থী

(গ) ভারতপন্থী (এরা অবশ্য রুশপন্থীদের সহযোগী)

২। বাংলাদেশপন্থী দল ঃ যাদের রাজনীতি বাংলাদেশ ভিত্তিক, যারা অন্য কোন দেশপন্থী নয়, যারা বাঙালী জাতীয়তায় বিশ্বাসী নয় বরং বাংলাদেশী জাতীয়তায় বিশ্বাসী। তারা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(ক) ইসলামপন্থী ঃ যারা ইসলামকে দলের নামে এবং দলীয় আদর্শে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে।

www.icsbook.info

(খ) দেশীয় সমাজতন্ত্রী ঃ এদের মধ্যে কোন কোন দল দেশীয় সমাজতান্ত্রিক বলেও দাবী করে এবং কোন দেশের লেজুড় বলে স্বীকার করে না।

(গ) ভারত রুশ বিরোধী ঃ যারা ভারতের আধিপত্য বিরোধী ও সমাজতন্ত্র বিরোধী হওয়ার কারণেই স্বাভাবিকভাবে মুসলিমপন্থী—তারা ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হয়েও মুসলিম জনতার সমর্থনের প্রয়োজনে মুসলিমপন্থী হতে বাধ্য হয় এবং ইসলামের কথাও মাঝে মাঝে বলে।

৩। আমেরিকাপন্থী দল ঃ যারা সমাজতন্ত্রী নয় তাদেরকেই সমাজতন্ত্রীরা মার্কিনপন্থী বলে গালি দেয়। যেহেতু সমাজতন্ত্রীরা কোন না কোন বিদেশপন্থী তাই বাকী সবাইকে মার্কিনপন্থী মনে করে। আমেরিকার কোন আন্তর্জাতিক আদর্শ নেই। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধা দেয়াই তাদের নীতি। তাই যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম হয়নি, সেখানে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা বা দলকে ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় আসার জন্য আমেরিকা পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। অবশ্য কোন নিষ্ঠাবান ইসলামী আদর্শবাদী দলকে কোন অবস্থায়ই আমেরিকা পছন্দ করতে পারে না। কারণ প্রকৃত ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হলে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের কবর রচিত হয় এবং বস্তুবাদ খতম হয়ে যায়।

সমাজতান্ত্রিক হওয়ার দাবীদারদের মধ্যে যারা নিষ্ঠাবান নয়, তাদেরকে যেমন আমেরিকা পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে তেমনি নামসর্বস্ব ইসলাম-পন্থীদেরকেও আমেরিকা ব্যবহার করতে পারে।

উপরোক্ত কয়েক প্রকারের অগণিত দলের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সাংগঠনিক মজবুতি ও কর্মী বাহিনীর বিচারে মাত্র কয়েকটি দলকে জাতীয় মানের বলা চলে।

দেশে রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যত ঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এত বেশী হওয়াটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে অথবা নেতা হওয়ার খায়েশের কারণেই দলের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদের অনেকেই মনে করেন, যে সরকারী উদ্যোগেই সকল দলকে বিভক্ত করে প্রভাবহীন করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে দলের সংখ্যা ক্রমে সহজেই কমে যাবে ? এখন প্রশ্ন হচ্ছে তা কিভাবে কমে যাবে। তার উত্তরে বলা যায় — যারা পার্লামেন্টে সিট পাবে তারা ছাড়া বাকী দলগুলোর কোন প্রভাবই জনগণের

www.icsbook.info

মধ্যে থাকবে না। ১৯৭৯ সালে প্রায় ৩০টি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটি দু'টি সিট পেয়েছে এমন দলসহ মোট মাত্র দশটি দলই সংসদে আসন পেয়েছে। ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অনেক দলই অংশগ্রহণ করেনি। সরকারী দল ও ৮ দলীয় জোট ছাড়া ছোট বড় ১৫টি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ ১৫টি দলের মধ্যে মাত্র ২টি দল সংসদে আসনে পেয়েছে। নিয়মিত নির্বাচন চলতে থাকলে দলের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই কমতে থাকবে।

কিন্তু দল কমানোর জন্য যদি কোন কৃত্রিম পদক্ষেপ নেয়া হয় তবে এর সংখ্যা না কমে বরং আরো বেড়ে যাওয়ারই ভয় আছে। দলের সংখ্যা কমাবার আরো একটা কারণ ঘটতে পারে। এদেশের জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আদর্শ হিসেবে ইসলামী রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করলে ভিন্ন আদর্শের দলের সংখ্যা কমে যাবে। কোন আদর্শবাদী দল জনগণের উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়ে গেলে নাম সর্বস্ব ইসলামী দলের সংখ্যাও আপনিই কমে আসবে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবার প্রধান কারণই হলো গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। একনায়কের শাসনামলে সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিকদের চাহিদা বেড়ে যায়। এক নায়ক নিজের দল গঠনের জন্য চালু রাজনৈতিক দলগুলোতে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নেতৃত্বের কোন্দল বাঁধিয়ে এক একটি দলকে নেতৃত্বের ভিত্তিতে একাধিক দলে পরিণত করে। তাছাড়া একনায়কের নিকট ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির আশায় অনেক পাতি নেতাও ভিন্ন ভিন্ন নামে রাজনৈতিক দল গঠন করে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বহাল হলে এ জাতীয় দল আপনিই মরে যায়।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

www.icsbook.info

গণতন্ত্র বনাম বিপ্লব

বিপ্লব বনাম গণতন্ত্র

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও সরকার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে যত মতপার্থক্যই থাকুক গণতন্ত্রের দোহাই সবাই দিচ্ছে। জনগণকে রাজনৈতিক শক্তির উৎস বলে স্বীকার করতে কেউ কার্পণ্য করে না। সামরিক অভ্যুত্থানের নায়করাও "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য" নিয়েই সশস্ত্র বিপ্লব করে থাকেন। কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের গন্ধ না থাকলেও সমাজতন্ত্রী ভাইরা কি গণতন্ত্রের দোহাই কারো চেয়ে কম দেন ?

গণতন্ত্রের যত প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যাই দেয়া হোক এর একটা বিশ্বজনীন সংজ্ঞা আছে। প্রধানতঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই গণতান্ত্রিক বলা চলে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঃ

১। জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী সরকারী ক্ষমতা হাসিল করতে হয়।

২। প্রতিষ্ঠিত সরকারের দোষত্রুটি প্রকাশ করার অবাধ সুযোগ জনগণের হাতে অবশ্যই থাকে।

৩। সরকার পরিবর্তনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথে চেষ্টা করার সুযোগ ও আযাদী থাকে।

গণতন্ত্রের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার বহাল থাকতে পারে না। কিন্তু এ কাংখিত ব্যবস্থাটির প্রশংসা সবাই করলেও এর প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা সবচেয়ে কঠিন বলে দুনিয়ায় প্রমাণিত হয়েছে। "সত্য কথা বলাই কর্তব্য" একথা কোন মিথ্যাবাদীও অস্বীকার করে না। কিন্তু সত্য বলা কি সবচেয়ে দুঃসাধ্য নয় ?

"বিপ্লব বনাম গণতন্ত্র" শিরোনাম থেকেই নিশ্চয়ই এটাই প্রতিপাদ্য বলে মনে হবে যে, বিপ্লব গণতন্ত্রের বিপরীত পদ্ধতি। আসলে বিপ্লব শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। ব্যাপক পরিবর্তন বা মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) চরিত্রহীন সমাজে উন্নত নৈতিক চরিত্রের লোক তৈরী করে তাদের জীবনে সত্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। তিনি মদীনায় বিনা রক্তপাতে সরকারী ক্ষমতা গণ-সমর্থনের মাধ্যমে লাভ করে প্রচলিত

www.icsbook.info

গোটা সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবতর্ন সাধন করেন। এ জাতীয় মৌলিক পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যায়। অবশ্য 'দার্শনিক বিপ্লব'ই এ জাতীয় পরিবর্তনের সঠিক সংজ্ঞা।

বিপ্লব শব্দের ব্যবহার ঃ সাধারণভাবে "বিপ্লব" বললে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সামরিক অভ্যুত্থান, শক্তি বলে সরকারকে উৎখাত ইত্যাদি বুঝায়। এভাবে ক্ষমতা দখলকারী সরকারকে গৌরবের সাথে "বিপ্লবী সরকার" নামে পরিচয় দেয়। এই কারণেই যখন কেউ বিপ্লবের আওয়াজ তোলে তখনই মানুষ শক্তির ব্যবহার হবে বলে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করে।

অবশ্য আজকাল "বিপ্লব" শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার অনেকেই করছেন। আন্দোলন করার অর্থেই তারা বিপ্লব শব্দ ব্যবহার করছেন। নিরক্ষরতা দূর করার ব্যাপক প্রচেষ্টাকে আন্দোলন বা অভিযান বলাই যুক্তিযুক্ত। এ কাজটি এত শ্রমসাধ্য ও সাধনা সাপেক্ষ যে, কয়েক বছরেও যদি কোন দেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে সক্ষম হয় তাহলে জাতীয় জীবনে এটা অবশ্যই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু এ পরিবর্তন গায়ের জোরে হবে না। স্বাক্ষরতা আন্দোলন সফল হলেই তা সম্ভব। সেচ ব্যবস্থাকে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে এবং বন্যার পানিকে ধারণ করার প্রয়োজনে খালখননের গণ আন্দোলনকে "বিপ্লব" নাম দেয়া হচ্ছে। এক একটি শব্দের বিশেষ একটা ওজন আছে। যেখানে সেখানে কোন শব্দের প্রয়োগ সাহিত্যরস বা হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

"বিপ্লব" শব্দটি কোথায় ব্যবহার করা উচিত বা অনুচিত এ বিষয়ে মতভেদ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আওয়াজ এমনকি কাবুল ষ্টাইলের বিপ্লবের শ্লোগান পর্যন্ত জনগণ শুনতে পাচ্ছে সেখানে বিপ্লবের সস্তা ব্যবহার চলতে থাকলে মানুষের মধ্যে অবাঞ্ছিত বিপ্লবের প্রতিরোধ স্পৃহা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কঠিন পরিস্থিতিতেও বিপ্লবের আওয়াজকে "খাল কাটা বিপ্লবের" মতই জনগণ নিরাপদ মনে করে অবহেলা করতে পারে। তাই "বিপ্লব" সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজনেই হালকাভাবে এর ব্যবহার অনুচিত।

যা হোক বিপ্লব শব্দের ব্যবহার আলোচ্য বিষয় নয়। ভাববার বিষয় হলো যে আমরা বিপ্লবী সরকার চাই, না গণতান্ত্রিক সরকার কামনা করি। দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারকে পরিবর্তন চাই, না গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাই। জনগণকেও এ বিষয়ে সজাগ হতে হবে যে, কাদেরকে সমর্থন করা উচিত। যাঁরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই সর্বদিক দিয়ে কল্যাণকর মনে করেন

www.icsbook.info

তাঁদের কর্মপদ্ধতি এক ধরনের হবে। আর যারা শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী তাদের কর্মনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হওয়াই স্বাভাবিক।

গণতান্ত্রিক মনোভাব ঃ যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের আচরণ গণতন্ত্র সম্মত হতে হবে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলনকে অশালীন ভাষায় গালি দেয়া চলে না। গণতন্ত্রমনা লোকের ভাষাই জানিয়ে দেয় যে, তিনি অধৈর্য নন। সরকারী ক্ষমতা থেকে কোন বিরোধী দলকে অন্য দেশের দালাল বলে গালি দেয়া অর্থহীন। দালাল হয়ে থাকলে আইনের মাধ্যমে বিচার করুন। সরকারের হাতেই আইন রয়েছে। সে আইনের প্রয়োগ না করে অসহায়ের মত গালি দেয়া দুর্বলতারই পরিচায়ক। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এদেশে যে হারে একে অপরকে বিদেশী দালাল বলছে, তাতে দুনিয়ার মানুষ আমাদের সবাইকে শুধু দালালই মনে করবে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে রাজনীতিবিদদের পরম ধৈর্যশীল হতে হবে। দুঃখের বিষয়, এ ধৈর্যেরই অভাব সবচেয়ে বেশী। সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সমালোচনার ভাষা যে নিম্নমানের লক্ষণ প্রকাশ করে তা গোটা জাতির জন্য লজ্জাজনক। এ বিষয়ে সরকারী দলের দায়িত্বই বেশী। তাঁরা ক্ষমতায় থেকে যদি আদর্শ স্থাপনের চেষ্টা না করেন, তাহলে বিরোধীরা শিখবে কি করে ? যাঁরা ক্ষমতায় আছেন তাঁদের অধৈর্য হবার কোন প্রয়োজনই নেই। বিরোধীরা ক্ষমতায় যাবার জন্য যদি অধৈর্য হয় তাহলে কিছুটা এলাউন্স তাদেরকে দিলে তারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধন হতে পারে।

বিরোধী দলের অবশ্যই ক্ষমতা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু কিভাবে তারা ক্ষমতায় যেতে চান ? একটা নির্বাচন হয়ে গেল। তাঁরা নির্বাচনে অংশও নিলেন। আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁদেরকে কাজ করে যেতে হবে। বর্তমান শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। সরকার পরিচালকের হাতে এত ক্ষমতা থাকা অবস্থায় নির্বাচনে গণতান্ত্রিক নীতি চালু থাকতে পারে না। এসব কথা যেমন সত্য তেমনি অগণতান্ত্রিক পন্থায় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হতে পারে না সে কথাও সত্য। তাই যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের নিজেদের কার্যাবলী প্রথমে গণতন্ত্র সম্মত হতে হবে।

যারা বিরোধী দলে আছে তারাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা গণতান্ত্রিক পন্থায় আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পেতে চাইলে তাদের কার্যক্রম এক ধরনের হবে। কিন্তু যদি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কর্মধারাই তারা অনুসরণ করবে। তাদের কর্মনীতি ও কর্মপন্থা থেকে নিজেদের প্রকৃত চেহারা সবার সামনে স্পষ্ট হতে বাধ্য।

www.icsbook.info

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে জনগণকে তাদের কার্যাবলী দ্বারা এতটুকু রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা তথাকথিত বিপ্লব ও গণতন্ত্রের পার্থক্য বুঝতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যে সবার জন্যই নিরাপদ এ বিষয়ে রাজনৈতিক কর্মীদেরকে সজাগ করে তুলতে হবে।

বিপ্লবের অনিশ্চিত পথ ঃ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করে যারা বিপ্লবের পথে গদিতে যেতে চান তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তা কি নিশ্চিত ? তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিপ্লব যেখানেই এসেছে সেখানে গণতন্ত্র কোথাও দানা বাঁধতে পারেনি। বিপ্লবের পর বিপ্লব লাইন ধরে এসেছে। এটা কি নিরাপদ পথ ? শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় গেলে শক্তির উপর নির্ভর করেই শাসন চলে। এ ধরনের সরকার জনগণের সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে না বলে যখন জনসমর্থন হারায় তখন সুযোগ বুঝে পাল্টা বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করে। তাই এ পথ একেবারেই অনিশ্চিত।

বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে যারা বিপ্লব করে তাদের অবস্থা আরও করুণ। আফগানিস্তানে নূর মুহাম্মদ তারাকী, হাফিজুল্লাহ আমীন ও কারমাল এ বিপ্লব দ্বারা কি পেলেন ? যারা কাবুল স্টাইলে স্বপ্ন দেখেন তারা এটাকে নিরাপদ পথ মনে করেন কোন্ যুক্তিতে ? তথাকথিত বিপ্লবের পথে দেশকে একবার ঠেলে দিলে ফিরিয়ে আনার উপায় থাকে না। এ বিপ্লব জনগণের পারস্পরিক আস্থা খতম করে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে দেশ গৃহযুদ্ধের আগুনে ছারখার হতে থাকে।

তাই বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরই সবার আস্থা স্থাপন করা উচিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশে চালু করার প্রধান দায়িত্ব ক্ষমতাসীনদের। তারা যদি নিজেদের গদী ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে তাদের রেশন করা মাপে গণতন্ত্র দেন তাহলে ময়দান বিপ্লবীদেরই পক্ষে যাবে। যদি আন্তরিকতার সাথে গণতন্ত্রকে বিকাশ লাভের সুযোগ দেন তাহলে গণতান্ত্রিক শক্তিই ময়দানে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে বিপ্লবীদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। ক্ষমতাসীনরা ১৯৪৭ সাল থেকে একই ধারায় গণতন্ত্রকে কোন ঠাসা করে বিপ্লবী মনোবৃত্তিকে সুযোগ করে দিয়েছে। এর কুফল ক্ষমতাসীনরাই বেশী ভোগ করেছে। কারণ ক্ষমতায় চিরদিন থাকা যায় না। গদী একদিন ছাড়তে হয়-ই। এমন নিরাপদ পদ্ধতি চালু থাকা দরকার যাতে গদী থেকে নামার পরও আবার উঠার সিঁড়িটা বহাল থাকে। একবার কোন প্রকারে কেউ ক্ষমতা পেলে অন্য কেউ যাতে সেখানে যাবার পথ না পায় সে উদ্দেশ্যে

www.icsbook.info

সিঁড়িটাই নষ্ট করে দেয়। ফলে নিরাপদে তারা নামার পথও পায় না। গদীতে উঠা-নামার পথটা পরিষ্কার রাখাই গণতন্ত্রের পরিচায়ক।

পাক-ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদেরকে সুস্পষ্ট শিক্ষা দেয়। কিন্তু মানুষ ইতিহাস থেকে কমই শিক্ষা গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক পথে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা থেকে বিদায় হলেন। অনেকে মনে করেছিল যে, তিনি চিরবিদায় নিলেন। কিন্তু ঐ গণতান্ত্রিক পথেই আবার ফিরে আসার সুযোগ পেলেন। গণতন্ত্রের ওপর আস্থা হারানো বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। শেখ মুজিব ও ভুট্টো জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেও গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারালেন। ফলে এমন পথে তাদেরকে যেতে হলো, যে পথে গিয়ে আর ফিরে আসবার উপায় থাকল না। ক্ষমতাসীনরা যদি এটা বুঝতে পারতো তাহলে ইতিহাসের অনেক করুণ ঘটনাই হয়তো ঘটতো না।

সরকারী ও বিরোধী সব দলকে অত্যন্ত স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার যে, দেশের জন্য, তাদের দলের জন্য, এমন কি নেতাদের জন্যও কোন্ পথটা মঙ্গলজনক ও নিরাপদ। নির্ভেজাল গণতন্ত্র দিলে সরকারী দলের গদীচ্যুত হবার আশংকা থাকলেও আবার জনসমর্থন নিয়ে গদী ফিরে পাওয়ার আশা থাকবে। বিরোধী দল এক নির্বাচনে ক্ষমতা না পেলেও আবার সে সুযোগ আসতে পারে। তাই গণতন্ত্রের এমন নিরাপদ পথই সবার কাম্য হওয়া উচিত।

গণতন্ত্র হলো যুক্তি, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতিযোগিতা। আর বিপ্লব হলো বন্দুকের লড়াই। মনুষ্যত্বের উন্নয়ন বন্দুকের হাতে অসম্ভব। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ত্রুটি আছে। তবে প্রচলিত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে তা কম মন্দ। গণতন্ত্রকে প্রকৃতরূপে কল্যাণকর ব্যবস্থা রূপে দেখতে চাইলে ইসলামের কতক মৌলিক শিক্ষাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় কাজ হলো আমাদের যুব শক্তিকে তথাকথিত বিপ্লবের রোমান্টিক শ্লোগানের মোহ থেকে ফিরিয়ে রাখা। এ জন্যই ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান উঠছে। বিপ্লবই যদি চাও তাহলে আস ইসলামের ছায়াতলে। আল্লাহর রাসূল মক্কা বিজয় করলেন বিনা রক্তপাতে। গোটা আরবে তিনি মনুষ্যত্বের মহাবিপ্লব আনলেন গায়ের জোরে নয়, চরিত্রের বলে। এরই নাম গণতন্ত্র।

ইরানের বিপ্লব ঃ এ প্রসংগে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইরানে ইসলামের নামে যে বিপ্লব হলো তা গণতন্ত্রিক মাপকাঠিতে কতটা সমর্থনযোগ্য। ইরানে ডঃ মুসাদ্দেকের স্বল্পকালীন শাসনের সময় দেশকে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে

www.icsbook.info

দেবার প্রচেষ্টা চলে। আমেরিকার সাহায্যে শাহ পুনরায় ক্ষমতা পেয়ে দীর্ঘকাল ইসলামী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে যেরূপ নৃশংসভাবে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় গোটা ইরানবাসী বিদ্রোহী হয়ে উঠে। জনাব খোমেনী রক্তপাতের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেননি। শাহর রক্তপাতের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন ব্যর্থ হবার ফলে খোমেনীর দীর্ঘ আন্দোলন বিজয় লাভ করে।

ইরানের দীর্ঘ ইতিহাসে গণতন্ত্র না থাকা সত্ত্বেও চরম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে জনাব খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করারই চেষ্টা চলছে। শাপুর বখতিয়ার যদি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা খোমেনীর হাতে তুলে দিত তাহলে পরিস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য আরও উপযোগী হতো। আয়াতুল্লাহ খোমেনীর দীর্ঘ সাধনা ও আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ শক্তির ফলেই বামপন্থীদের ব্যাপক অস্ত্র লুট সত্ত্বেও ইসলামী শক্তি শেষ পর্যন্ত ময়দান দখল রাখতে সক্ষম হলো। সুতরাং ইরানে ১৯৭৯ এর বিপ্লব হঠাৎ কতক লোকের সশস্ত্র ক্ষমতা দখল জাতীয় কোন ব্যাপার নয়। বরং ব্যাপক জনসমর্থনের মাধ্যমেই ইরানী বিপ্লব সফল হয়েছে। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

সামরিক বিপ্লব

বিপ্লবের নামে শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা দখলের যত ধরন হতে পারে তার মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে সামরিক বিপ্লব হলো সবচেয়ে বেশী জঘন্য। অন্যান্য ধরনের বিপ্লবে জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় এবং তাদের একাংশের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সামরিক বিপ্লবে জনগণকে জড়িত করার কোন দরকার হয় না। এমনকি জনসমর্থন ছাড়াই অস্ত্রবলে সামরিক শাসন চালু করা যায়।

সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও জওয়ানগণ দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী হিসেবেই গণ্য। তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় ব্যারাকে রেখে পেশাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয়। দেশের স্বাধীনতার হেফাযতের জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত বলে বাজেটের সবচেয়ে বড় অংশ তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। বেসামরিক সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় তাদেরকে জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় উপকরণ বেশী পরিমাণে দেয়া হয় যাতে তারা নিশ্চিন্তে দেশরক্ষার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন।

আইনগতভাবে যাদের হাতে বেসামরিক সরকারের দায়িত্ব অর্পিত হয় তারাই সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এটা দুনিয়ার সব দেশে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত বৈধ নীতি। দেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত বেসামরিক

www.icsbook.info

সরকারের নির্দেশ পালন করাই সশস্ত্র বাহিনীর আইনগত কর্তব্য। এমন কি কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার বৈধ দায়িত্বও বেসামরিক সরকারের হাতেই ন্যস্ত থাকে। সামরিক, বিমান ও নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। বেসামরিক কর্মচারীগণ যেমন সরকারের আনুগত্য করতে বাধ্য তেমনি সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্যও তাই।

সামরিক সরকার অবৈধ ঃ প্রত্যেক দেশেই সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। কোন দেশেই সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার কোন আইনগত বিধান থাকে না। অথচ বিভিন্ন দেশে সশস্ত্র বাহিনীকে সরকারী ক্ষমতা দখল করতে দেখা যায়। এ জাতীয় ক্ষমতা দখল কোথাও বৈধ বলে স্বীকৃত নয়। সরকারী কর্মচারী হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর এভাবে ক্ষমতা দখল কোন অধিকারই নেই। "জোর যার মুলুক তার" যদি বৈধ নীতি বলে আইনে গণ্য হতো তাহলেও সামরিক বিপ্লবকে কোন রকমে জায়েজ বলা যেতো। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সামরিক আইন বৈধ কোন বিধানই নয়। সুতরাং সামরিক বিপ্লব নিঃসন্দেহে চরম দুর্নীতি ও জাতীয় পর্যায়ের ডাকাতি।

বেসামরিক সরকারী কর্মচারীরা শক্তিবলে কোন সরকারকে বেদখল করে সরকারী ক্ষমতা জবরদখল করতে পারে না। কারণ তাদের হাতে অস্ত্র নেই এবং তারা পৃথকভাবে সুসংগঠিত কোন শক্তিও নয়। সশস্ত্র বাহিনী জনগণ থেকে আলাদাভাবে সুসংগঠিত ও সুশৃংখল শক্তি হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তারা উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ অন্ধভাবে পালনে অভ্যস্ত। তাই যখন এসব বাহিনীর দায়িত্বশীলগণ তাদের অধীনস্থ অফিসার ও জওয়ানদেরকে অস্ত্র ধারণ করার নির্দেশ দেন তখন অধীনস্থ সবাই বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করেন। সশস্ত্র বাহিনীর এ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেই উচ্চাভিলাসী অফিসাররা সামরিক আইন জারি করার সুযোগ গ্রহণ করেন।

কিন্তু যে অস্ত্র বলে তারা বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেন তা জনগণের টাকায় যোগাড় করা হয় এবং তা একমাত্র বেসামরিক সরকারের মরজী মতোই ব্যবহার করা কর্তব্য। এ অস্ত্র দ্বারা সরকারী ক্ষমতা দখল করা শুধু অবৈধই নয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা। বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করে জনগণকে পরাধীনতার অভিশাপ থেকে হেফাযত করার উদ্দেশ্যেই তাদের হাতে এ অস্ত্র তুলে দেয়া হয়। অথচ সে অস্ত্র দিয়েই জনগণকে গোলাম বানানো হয়—এর চেয়ে বড় বেঈমানী আর

www.icsbook.info

কী হতে পারে ? জনগণের কর্মচারী (Public Servant) হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিপরিত আচরণই হলো সশস্ত্র বিপ্লব। অস্ত্রবলে জনগণকে গোলাম বানিয়ে দেশ শাসনের অপর নামই হলো সামরিক আইন প্রশাসন।

সামরিক শাসনের অভিশাপ ঃ যে দেশে একবার সামরিক শাসনের অভিশাপ নেমে আসে সে দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন চালু করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশী শক্তির অধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে দেশী সামরিক শাসন থেকে উদ্ধার পাওয়া কম কঠিন নয়।

সামরিক শাসকরা গণতন্ত্রের দোহাই কম দেন না। তারা সত্যিকার গণতন্ত্র কায়েমের মহান উদ্দেশ্যেই নাকি সামরিক আইন জারি করে থাকেন। সামরিক শাসন যে অবৈধ সে কথা অন্তরে তারা উপলব্ধি করেন বলেই গণতন্ত্রের জপমালা হাতে নিতে তারা বাধ্য হন। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে তারা এমন ধরনের বেসামরিক সরকার গঠন করেন যা সামরিক সরকারেরই বেসামরিক চেহারা মাত্র। তাদের হাতেই মূল ক্ষমতা থাকে—শুধু সামরিক উর্দি গায়ে থাকে না।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন চালু করার পর বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সত্ত্বেও জনগণের নির্বাচিত সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। এ থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, সামরিক শাসনের কুপ্রথা একবার চালু হলে তা থেকে নিস্তার পাওয়া স্বাধীনতা অর্জনের চেয়েও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৮২ সালের সামরিক শাসন ঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যার পর ১৯৮১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে জনগণ বিপুল উৎসাহে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে কারচুপির তেমন অভিযোগ শুনা যায়নি। বিপুল ভোটাধিক্যে বিচারপতি আবদুস সত্তার নির্বাচিত হন। চার মাস পর সেনাপতি এরশাদ কোন্ যুক্তিতে সামরিক শাসন চাপিয়ে দিলেন তা জনগণের নিকট অস্পষ্ট। বৃদ্ধ বিচারপতি যে বাধ্য হয়েই বন্দুকের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন সে কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি।

সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা ১৯৫৮ সাল থেকেই দেশবাসীর যথেষ্ট হয়েছে। কোন সামরিক শাসনই সঠিকভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু জেনারেল এরশাদ যে যোগ্যতার সাথে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন এর কোন তুলনা নেই।

এ সামরিক শাসন রাজনীতিকে যে পরিমাণ কলুষিত করেছে, জনগণকে যেভাবে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, গদী রক্ষার প্রয়োজনে সন্ত্রাসী

www.icsbook.info

কার্যকলাপকে যে পরিমাণ বাড়ার সুযোগ দিয়েছে এবং সুবিধাবাদী, নীতিহীন ও দলছুট ব্যক্তিদের দ্বারা যে ধরনের দুর্নীতিপরায়ণ শাসন ব্যবস্থা চালু করেছে এর কুফল থেকে এদেশ কতদিনে উদ্ধার পাবে তা আল্লাহই জানেন।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনীতি

সশস্ত্র বাহিনীর সঠিক মর্যাদা বহাল রাখার প্রধান দায়িত্ব তাদেরই। সামরিক শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই তারা উপলব্ধি করছেন যে যারা তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করেন তারা কোন কল্যাণ করেননি। সশস্ত্র বাহিনী রাজনীতিতে জড়িত থাকলে তারা কিছুতেই জনগণের আস্থাভাজন থাকতে পারবেন না। রাজনীতির ময়দানে দলাদলী ও মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। সশস্ত্র বাহিনী কোন এক দলের পক্ষে কাজ করলে অন্যসব দল কেমন করে তাদের প্রতি আস্থা রাখবে ? সকল দলই যাতে সমভাবে সশস্ত্র বাহিনীকে আপন মনে করে সে পরিবেশ অবশ্যই বহাল রাখতে হবে।

জনগণের পক্ষ থেকে এ আস্থা বহাল করার যত আগ্রহই থাকুক সশস্ত্র বাহিনীর আচরণ এর প্রমাণ না দিলে এ আশা অন্য কোন পন্থায় পূরণ হতে পারে না। সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বশীলগণ এ বিষয়ে সচেতন থাকলে পূর্বের ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস; জনগণকে একথা বুঝানো সম্ভব যে সরকারের নির্দেশেই সশস্ত্র বাহিনী কাজ করে থাকে। তাই সরকার যদি অন্যায় নির্দেশ না দেয় তাহলে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে জনগণের অধিকার হরণ করার মতো কোন অন্যায় কাজ কখনো করে না। সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িত করার ভ্রান্ত মতবাদ দেশের জন্য যে কত মারাত্মক সে কথা সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যেককে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

ক্ষমতা দখলের পূর্বে জেনারেল এরশাদ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের সম্মেলন ডেকে ঐ ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মতো একটি সুশৃংখল শক্তিকে দেশ শাসনে যোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে।

এ দাবীর ধুয়া তুলে হয়তো তিনি তার ক্ষমতা দখলের পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ চিন্তাধারা চালু থাকলে সশস্ত্র বাহিনী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রাজনৈতিক স্বার্থের বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত হতে বাধ্য। তাদের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি করতে হলে এ কুচিন্তা থেকে সংশ্লিষ্ট সবার মন মগজকে সম্পূর্ণ পবিত্র রাখতে হবে।

www.icsbook.info

এ অন্যায় দাবীর পক্ষে সামান্য যুক্তিও তালাশ করে পাওয়া যায় না। দেশ শাসন ও পরিচালনায় সশস্ত্র বাহিনীকে কেন বিশেষ ক্ষমতা দিতে হবে ? দেশের যারা মেধা ও প্রতিভার অধিকারী তারা সবাই কি সশস্ত্র বাহিনীতেই যোগদান করে ? প্রথম বিভাগে পাশ করাও সেখানে ভর্তি হবার জন্য কোন শর্ত নয়। অথচ প্রথম বিভাগে পাশ না হলে মডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সুযোগই পাওয়া যায় না।

আজ পর্যন্ত দেশেরই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারগণ, কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ, ব্যারিস্টার ও উকিলগণ, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ শ্রেণীগতভাবে এ উদ্ভট দাবী পেশ করেননি যে, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদার করতে হবে। অথচ মেধা ও প্রতিভার বিচারে তাদের মান কি সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের থেকে নিম্ন ?

সুতরাং একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, অস্ত্র বলই ক্ষমতার দাবীর পেছনে আসল কারণ। কিন্তু এ অস্ত্র কি তাদের নিজস্ব ? জনগণের রক্ত পানি করা শ্রমের প্রধান অংশই কি তাদেরকে সুসংগঠিত ও সশস্ত্র হবার যোগ্য বানায় নি ? কী উদ্দেশ্যে এ গরীব দেশের বিরাট বাজেট তাদের জন্য বরাদ্ধ করা হচ্ছে ? দেশরক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই জাতি এতবড় ত্যাগ করছে। এ কুরবানী করতে হচ্ছে বলে জনগণ মোটেই অসন্তুষ্ট নয়। বরং হাসিমুখে আরও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। কারণ সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের দেশের আযাদী রক্ষার জন্য জীবন দিতে হবে। যারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের জন্য জাতি সম্পদ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবে কেন ?

সশস্ত্র বাহিনীর সবার বিবেক ও সদিচ্ছার নিকট আকুল আবেদন জানাই যে, ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের যে ভ্রান্ত মতবাদ তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার আশংকা রয়েছে সে কুচিন্তা ত্যাগ করে জনগণের প্রাণপ্রিয় হতে হবে।

রাজনীতি ও অস্ত্র ঃ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, দেশের রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। পেশী ও অস্ত্রকেই যদি রাজনৈতিক ময়দান ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে দেশের আযাদী অবশ্যই খোয়াতে হবে। বিদেশের বলিষ্ঠতর পেশী ও শক্তিশালী অস্ত্র দেশী সশস্ত্র রাজনীতি সহজেই দখল করে নেবে।

রাজনীতিকে অস্ত্রমুক্ত করাতে হলে সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই রাজনীতি মুক্ত করতে হবে। একথা যদি সশস্ত্র বাহিনী অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে দেশকে-গৃহযুদ্ধ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কারণ ১৯৮৬ সালে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে এর তিক্ত অভিজ্ঞতা

www.icsbook.info

জনগণকে তাদের ভোটাধিকার হেফাযত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করবে। যেমন পুলিশ ডাকাত দমনে অবহেলা করলে জনগণ আইন তাদের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয় এবং নিজেরাই ডাকাতকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়।

এরশাদ সাহেব দেশে যে রাজনীতি চালু করেছেন অবিলম্বে এর অবসান প্রয়োজন। তা না হলে এ রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়েই অস্ত্রের চর্চা সীমাবদ্ধ রাখবে না।

অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ না হলে আইন শৃংখলায় আরও অবনতি অবশ্যই হবে। যে লোকদের হাতে ব্যালট ডাকাতির জন্য অস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছে তাদেরকে দমন করার ক্ষমতা পুলিশ কোথায় পাবে ? এরশাদ সাহেবের রাজনীতি চালু করার জন্য যে ছাত্র ও যুবকদেরকে অস্ত্র দেয়া হয়েছে তারা তো আইনশৃংখলা ভংগ করার সরকারী লাইসেন্সই পেয়ে গেছে।

এ দুরবস্থা থেকে নিস্তার পেতে হলে সর্বপ্রথম সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতির ময়দান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার বক্তব্য দেশ দরদী সকল মহলের প্রাণের কথা। এমন কি সশস্ত্র বাহিনীর ভায়েরাও এসব কথা যুক্তি ও বিবেক-সম্মত বলে মনে করবেন। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণ

বাংলাদেশ আকারে ক্ষুদ্র একটি দেশ হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিরাট দেশ হিসেবেই গণ্য হবার যোগ্য। দশকোটি মানুষের একটি দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশ মোটেই নগণ্য নয়। এ দেশের মানুষ ১৯৪৭ সালে ইংরেজ থেকে আযাদ হয়ে পাকিস্তানে যেটুকু অধিকার ভোগ করছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না বলেই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের আশায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে একটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। স্বাধীনতার এ চেতনাবোধই দেশের আসল পুঁজি। এ পুঁজিই দেশের আসল রক্ষাকবচ।

একটি বিরাট দেশ বাংলাদেশকে প্রায় চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে আছে। ঐ দেশের জনগণের সাথে সবসময়ই এদেশের পক্ষ থেকে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ দেশের কোন সরকারের আচরণেই বাংলাদেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি।

বাংলাদেশের মতো আর কোন দেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে এমন বেকায়দায় নেই। এদেশের চার পাশে যদি কয়েকটি দেশ থাকতো তাহলে দেশ রক্ষা সমস্যা এত কঠিন হতো না। চারপাশে একটি মাত্র দেশ থাকায়

www.icsbook.info

এবং সে দেশটি বিরাট হওয়ায় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা অবশ্য দুঃসাধ্য। প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সাথে ঐ দেশের আচরণের গত ৪০ বছরের ইতিহাস বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই দেশ রক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থার গুরুত্ববোধ জনগণের মনে অত্যন্ত প্রবল।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ঃ প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থারই দাবী রাখে। কোন কোন মহল এদেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে এমন অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে যা দেশরক্ষার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক। তারা বলে যে, "একমাত্র ভারতই এদেশ আক্রমণ করতে পারে। ভারতের বিরাট সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিহত করার মত শক্তিশালী দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা বাংলাদেশের সাধ্যের বাইরে। তাই এ গরীব দেশে এত বড় বাহিনী পোষার প্রয়োজনই নেই। আধুনিক বিশ্বের এক দেশের পক্ষে প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্র দখল করে রাখা সম্ভব নয়। বিশ্ব জনমত এ জাতীয় অন্যায় দখল মেনে নেবে না। জাতিসংঘ ও দেশের জনগণই দেশ রক্ষার জন্য যথেষ্ট।

প্যালেষ্টাইন, লেবানন, আফগানিস্তান ও বিশ্বের আরও অনেক উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও যারা এমন উদ্ভট ধারণা পোষণ করেন তাদেরকে ভারতীয় লবীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এ লবীর প্রভাবেই হয়তো মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি এতটা গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন মনে করেননি। সম্ভবত ভারতের পক্ষ থেকে আক্রমণের তেমন কোন আশংকা তিনি করেননি। তাই দেশ রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে হয়তো তাঁর সরকারের প্রতিরক্ষার জন্যই রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা তিনি বেশী দরকার মনে করেছিলেন।

সশস্ত্র বহিনী এ পলিসি কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। প্রধানত এরই মারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় শেখ সাহেবকে জীবন দিতে হলো। রাষ্ট্র প্রধানকে এমন নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করার মত করুণ ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও দেশের আপামর জনসাধারণের ঐ সময়কার আচরণ একথাই প্রমাণ করে যে, জনগণ শেখ সাহেবের নীতি সমর্থন করতে পারেনি।

যদিও দেশরক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীই যথেষ্ট নয় এবং স্বাধীনচেতা জনগণের আবেগপূর্ণ সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া প্রতিরক্ষা কিছুতেই সম্ভব নয়, তবুও সুসংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া দেশরক্ষার চিন্তাও করা যায় না। জনগণের মনোবলের প্রধান ভিত্তিই সুশিক্ষিত ও সুশৃংখল দেশরক্ষা বাহিনী। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের এলাকায় জনগণের মহব্বত, আবেগ ও

www.icsbook.info

সহযোগিতা সশস্ত্র বাহিনীকে দেশ রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তা আমি নিজের চোখে না দেখলে এ বিষয়ে এতটা দৃঢ় অভিমত পোষণ করতে পারতাম কি না সন্দেহ। বাংলাদেশকে বিদেশী হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসজ্জিত করতে হবে। এরই পাশাপাশি জনগণকে বিশেষ করে যুবকদেরকে এতটা সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে যাতে দেশবাসী যোগ্যতার সাথে সশস্ত্র বাহিনীর সহায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ সশস্ত্র বাহিনীর উপর দেশ রক্ষার যে মহান দায়িত্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করতে হলে তাদের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা থাকা প্রয়োজন। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা যদি অনুভব করে যে, জনগণ তাদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তবেই তারা দেশের জন্য অকাতরে জীবন বির্সজন দেবার প্রেরণা পাবে। জনগণ জানে যে, তাদের স্বাধীনতার হেফাজত করার পবিত্র দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনীর উপর রয়েছে। এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের ব্যবস্থা না হলে বিদেশের গোলামে পরিণত হতে হবে। তাই সশস্ত্র বাহিনীকে যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতেই হবে। জনগণের মধ্যে এ অনুভূতি থাকলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দেশের সবাই সব রকম ত্যাগ ও কুরবানী দিতে প্রস্তুত থাকবে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি এ জাতীয় আস্থা ও ভালবাসা যাতে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে সেদিকে বিশেষ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্বও ঐ বাহিনীর দায়িত্বশীলদেরই। কারণ জনগণের আস্থা অর্জন করা ছাড়া তাদের পেশাগত সাফল্য কিছুতে সম্ভব নয়। এ আস্থা আপনা আপনিই সৃষ্টি হয় না। সশস্ত্র বাহিনীর কার্যকলাপ ও আচরণ যে রকম হয় জনগণের মনে তাদের সম্পর্কে ধারণাও সে রকমই সৃষ্টি হয়।

সাধারণত সশস্ত্র বহিনীর লোকেরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাক এলাকায়ই থাকে। জনসাধারণের সাথে তাদের ঘনিষ্ট কোন যোগাযোগের সুযোগ হয় না। বেসামরিক ক্রিয়াকান্ডে তাদেরকে ব্যবহার করা হয় না। দেশ শাসনের কোন দায়িত্বও তাদের উপর থাকে না। তারা সেনানিবাস এলাকায় দেশের প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পেশাগত ট্রেনিং নিয়েই নিয়মিত ব্যস্ত থাকেন। এটাই দুনিয়ার সব দেশে সাধারণ নিয়ম হিসেবে স্বীকৃত।

www.icsbook.info

এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে জনগণের মনে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হবার কারণ ঘটে না। বরং মাঝে মাঝে জাতীয় কোন দুর্যোগে যখন বেসামরিক সরকারের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর লোকদেরকে জনগণের খেদমতের জন্য সাময়িকভাবে নিয়োগ করা হয় তখন তাদের নিঃস্বার্থ সেবায় সর্ব সাধারণ মুগ্ধ হয় এবং তাদের প্রতি ভালবাসা আরও বেড়ে যায়।

এভাবেই সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পারস্পরিক আস্থা গড়ে উঠে। যেসব দেশে সামরিক শাসন চালু নেই সেখানে এ আস্থা বিনষ্ট হবার কোন কারণ ঘটে না। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা দেশ শাসন ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করলে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জনগণের স্বার্থের কোন সংঘাতই সৃষ্টি হতে পারে না।

সামরিক শাসনের প্রধান কুফল ঃ আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন দেশেই সামরিক শাসনের কোন সুফল দেখা যায়নি। একবার কোন দেশে সামরিক শাসন চালু হলে এ থেকে আর সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না। বহু দেশেই এখনও সামরিক শাসন চালু আছে। প্রতিটি দেশেই দেখা যায় যে, যেসব সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে সামরিক শাসন জারী করা হয় সে সব সমস্যা তো সেখানে আরও বেড়েই চলে, তদুপরি অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এখানে সামরিক শাসনের যাবতীয় কুফল ও ঐ সব কুফল দেখা দেবার কারণ আলোচনা করার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বড় কুফলটি আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসার সম্পর্কের যে গুরুত্ব ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি সামরিক শাসনে সেটাই বিনষ্ট হয়ে থাকে।

১৯৮২ সালে জনগণের নির্বাচিত একটি সরকারই এ দেশ শাসন করছিল। ভাল হোক মন্দ হোক জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী ও এম, পিদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছিল। জনগণ তাদের কাছে পৌছতে পারত, তাদেরকেও জনগণের কাছে যেতে হতো। হঠাৎ করে ২৪শে মার্চ সকালে জনগণ জানতে পারল যে, সামরিক আইন জারী হয়েছে। তারা দেখল তাদের নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে সামরিক লোকেরা তাদের শাসক সেজে বসেছে। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী ও এম, পি এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত অগণিত লোকের ভালবাসা থেকে সশস্ত্র বাহিনী বঞ্চিত হলো। দেশ শাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন সামরিক অফিসারগণ সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে বেসামরিক অভিজ্ঞ অফিসারদের কর্তা হয়ে বসল। এতে বেসামরিক সকল সরকারী কর্মচারীর মনে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি মহব্বত

www.icsbook.info

বৃদ্ধির কাম্য পরিবেশ আশা করা যায় না। এভাবেই সামরিক শাসন মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপর থেকে অস্ত্রবলে চাপিয়ে দেবার ফলে সশস্ত্র বাহিনীর ক্রমেই জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। যতই দিন যায় ততই সামরিক লোকদেরকে বেসামরিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জনগণের নিকট অপ্রিয় হতে হয়। কারণ শাসনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাসিতদের নিকট জনপ্রিয় থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। এভাবেই সামরিক শাসনের পরিণামে সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের মধ্যে যে পারস্পরিক ভালবাসা থাকা স্বাভাবিক তা বিনষ্ট হতে থাকে। আর দেশ রক্ষার জন্য এ অবস্থাটা অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

গণতন্ত্রের নামে সামরিক শাসকদের কর্তৃত্ব ঃ যদি কোন দেশে বিশেষ পরিস্থিতিতে সামরিক শাসন সাময়িকভাবে কায়েম করার পর গণতন্ত্রের নামে স্থায়ীভাবে সামরিক শাসকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না চলে তাহেল সশস্ত্র বাহিনীর জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হয় না। যেমন কিছুদিন পূর্বে সুদানে জেনারেল সুয়ারুয্যাহাব জেনারেল নুমেরীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে সামরিক আইন জারি করার এক বছরের মধ্যেই নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। নির্বাচনে তিনি কোন দলের পক্ষ অবলম্বন না করায় জনগণ স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করতে পেরেছে। ফলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি জেনারেল আবদুর রহমান সুয়ারায্যাহার গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে প্রহসনমূলক নির্বাচনের অনুষ্ঠান করতেন তাহলে সুদানে অশান্তি আরও বেড়ে যেতো এবং সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি হতো।

জেনারেল এরশাদ যদি তেমনিভাবে দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণকে তাদের মর্জি মতো সরকার গঠনের সুযোগ দিতেন তাহলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা আরও বেড়ে যেতো। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এরশাদ সাহেব সম্পূর্ণ বিপরীত নীতিই অবলম্বন করেছেন।

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে তিনি সামরিক শাসন দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন। দেশে এমন কোন পরিস্থিতিই ছিল না যাতে তখন সামরিক আইন জারি করার সামান্য কোন অজুহাতও দেখানো চলে। প্রেসিডেন্ট আবদুস সত্তার সরকারকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেই তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন। অথচ ক্ষমতা দখল করাটাই ছিল চরম

www.icsbook.info

দুর্নীতির পরিচায়ক। এ জন্যই গত চার বছরের শাসনে দুর্নীতি যে কত বেড়েছে তা কারোরই অজানা নয়।

গণতন্ত্র হত্যা করে ক্ষমতা দখলের পর জনগণের সরকার কায়েমের দোহাই দিয়ে তিনি চরম অগণতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসী পন্থায় পার্লামেন্ট নির্বাচন করে তার দলকে ক্ষমতাসীন করলেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় উল্লেখযোগ্য সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাই ১৯৮৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জন করে। ফলে এক প্রহসন মূলক নির্বাচনে তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষিত হন। এ দ্বারা তিনি সশস্ত্র বহিনীর জন্য কোন সুনাম বয়ে আনেননি। তবে সামরিক আইন উঠে যাওয়ায় সশস্ত্র বহিনীর সাথে জনগণের সম্পর্ক পুনর্বহালের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

গণতন্ত্রের দুর্গতি কেন ?

দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালে এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। আশা করা গিয়েছিল যে, ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসে দেশ শাসনের দায়িত্ব পেলেন তারা জনগণের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই চালু রাখবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও শাসকগণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতে থাকলেন। ফলে ক্রমেই তারা জনপ্রিয়তা হারাতে লাগলেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা আমলাদেরকে এমনভাবে ব্যবহার করতে থাকলেন যে, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা বুঝতে পারলেন শাসকদল জনগণের সমর্থনের চেয়ে তাদের সাহায্যেই গদীতে বহাল থাকতে চান। তখন তারা নিজেরাই ক্ষমতা দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এমনি এক পরিস্থিতিতে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইস্‌কান্দার মির্জার সাথে যোগসাজশে সেনাপতি আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারী করে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দেন। জনগণ নিজেদেরই বেতনভুক্ত কর্মচারীদের হাতে বন্দী হয়ে ইংরেজ আমলের চেয়েও কঠোর রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

১৯৬০ সাল থেকে নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়েও গণতান্ত্রিক আন্দোলন কঠিনতর সংগ্রামে পরিণত হলো। দীর্ঘ ৯ বছর আন্দোলনের পর ১৯৬৯ সালে যে গোলটেবিল বৈঠক হয় তা যদি সফল হতো তাহলে গণতন্ত্র হয়তো বহাল হতো।

www.icsbook.info

কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে দলটি নিরংকুশ বিজয় লাভ করলো তাদের হাতে ১৯৭২ সালে ক্ষমতা আসার পরও গণতন্ত্র কেন টিকে থাকলো না সে প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে বড় হয়েই দেখা দেবার কথা।

দু'টো বিষয়ের বিশ্লেষণ ঃ আজও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাদেরকে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করতে হবে যে, দু-দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করেও গণতন্ত্রের পথে আমরা সামান্য অগ্রগতিও কেন লাভ করতে পারলাম না। এ প্রসঙ্গে দু'টো বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। প্রথমত আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব যে, স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ কেন হলো না। দ্বিতীয়ত আমরা হিসেব নিয়ে দেখব যে, গণতন্ত্রের পথে আমাদের দেশে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। রোগের কারণ না জানলে সঠিক চিকিৎসা হতেই পারে না। আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে যদি কোন প্রকারে একটি নির্বাচিত সরকার কায়েম করতে সক্ষমও হই, তবু আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বহাল রাখতে পারব না যদি ঐসব দোষ-ত্রুটি ও প্রতিবন্ধকতা রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলোর মধ্যে থেকে যায়। গণতন্ত্রের পরিপন্থী বিষয়গুলো যদি আমাদের থেকে দূর করা না যায় তাহলে নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করতে হবে। তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়েই উপরোক্ত দু'টো বিষয়ে আলোচনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

আমি আশা করি সকল রাজনৈতিক মহলই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমার বিশ্লেষণকে বিচার করবেন। গণতন্ত্রের প্রতি যাদের নিষ্ঠা আছে তারা এ আলোচনার মাধ্যমে আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ পাবেন। আসুন আমরা সবাই গণতন্ত্রের স্বার্থে আত্মবিশ্লেষণ করে দেখি।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র কেন বহাল রইল না ঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যে দলটি এককভাবে মহাবিজয় লাভ করে সে দলটিই বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত একটি দল বিপুল জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন চালু রাখতে পারলো না তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার।

উদার দৃষ্টিতে এবং সত্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে বিচার-বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্টভাবেই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতি গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে না যাওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ

www.icsbook.info

(১) একটি সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে এ নতুন রাষ্ট্রটি কায়েম হওয়ার দরুন স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিতে অস্ত্রের প্রভাব ও প্রাধান্য অনেকদিন পর্যন্ত বহাল থেকে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সুযোগে এমন বহু সুসংগঠিত গ্রুপ ও উপদলের হাতে অস্ত্রশস্ত্র এসে যায় যারা "বন্দুকের বুলেট দ্বারা বিপ্লব সাধনের নীতিতে" আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। ৭২ সালে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার কায়েম হওয়া সত্ত্বেও ঐ সব উপদল অস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ করেনি। তাদের উৎপাত বন্ধ করার জন্য সরকারকেও রক্ষীবাহিনী ব্যবহার করতে হয়েছে। এমন কি বেসামরিক পর্যায়েও সরকার সমর্থক এবং সরকার বিরোধীদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বহু জায়গায় অস্ত্র প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে যেভাবে রাজনৈতিক গোপন হত্যা চলেছে তাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

(২) গণতন্ত্রের সঠিক পরিবেশের পূর্বশর্ত হলো জাতীয় আদর্শের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে বৃহত্তম ঐক্য থাকা। শাসনতন্ত্রের এমন সব মতবাদকে জাতীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছিল যা দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান আকিদার বিরোধী ছিল। ফলে গণমনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং সরকার বিরোধী যে কোন আওয়াজই জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। সরকারী দলেরই একাংশ নতুন দল সৃষ্টি করে চরম সরকার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা এমন আক্রমণাত্মক ভাষায় সরকারের সমালোচনা করতে থাকে যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট হতে থাকে। কোন কোন সশস্ত্র উপদল এমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে যে, গণতান্ত্রিক শাসন স্বাভাবিক গতিতে চলতে ব্যর্থ হয়।

(৩) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন মারাত্মক রূপ ধারণ করে যে, স্বাধীনতা লাভ করার দু'বছরের মধ্যেই মানুষ চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। এ অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ভারতই দায়ী বলে জনগণের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হয় এবং সরকারকে ভারতপন্থী বলে বিবেচনা করার কারণে সরকারের জনপ্রিয়তা দ্রুত বিলীন হয়ে যেতে থাকে। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা তখন ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে গণমনের এ তীব্র বিদ্বেষ সরকারকে চরম বেকায়দায় ফেলে দেয়।

(৪) এক শ্রেণীর অতি উৎসাহী ধর্ম নিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রীর আচরণ ও কার্যকলাপ এবং সরকারের কতক সিদ্ধান্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে এমন আঘাত হানে যে, দেশের ছোট-বড় ওয়ায়েজগণ জনগণের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাকে সজাগ রাখার উদ্দেশ্যে যে আবেগময় বক্তব্য রাখেন তা-ও পরোক্ষভাবে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করতে থাকে।

www.icsbook.info

(৫) উপরোক্ত কারণসমূহ সরকারের জন্য এমন কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, গণতান্ত্রিক পন্থায় এর মোকাবিলা করা অসম্ভব বলে সরকার মনে করে। শেষ পর্যন্ত সরকারী দল তাদের নেতার জনপ্রিয়তাকে সম্বল করে পূর্ণ একনায়কত্ব কায়েমের মাধ্যমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। তারা এমন এক শাসন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় যা প্রতিষ্ঠিত হলে দেশে গণতন্ত্রের সকল পথই বন্ধ হবার আশংকা দেখা দেয়। এ ব্যবস্থা চালু হবার প্রাক্কালেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের দুর্ঘটনা ঘটে।

(৬) উপরে বর্ণিত কারণসমূহ ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, শেখ মুজিবের মতো জনপ্রিয় নেতা এবং তার ব্যাপক গণসমর্থন পুষ্ট দল জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেও দেশকে গণতান্ত্রিক পথে এগিয়ে নেবার বদলে একনায়কত্ত্বের ভ্রান্ত পথে কেন পা বাড়ালেন ? শেখ মুজিব আজীবন গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি কেন জনগণের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন এবং তাঁর বিপুল জনপ্রিযতাকে কাজে লাগিয়ে কেন তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে এগিয়ে নিতে পারলেন না ?

পরলোকগত শেখ মুজিব সাহেবের প্রতি কোন প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। তিনি এদেশের ইতিহাসে চিরদিনই উল্লেখযোগ্য হয়েই থাকবেন। তাই এদেশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে তাঁর উল্লেখ না হয়েই পারে না। যারা আন্তরিকভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ চান এবং যারা সাধ্যমতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করেন। তাদের নিকট আমার আলোচনা নিষ্ঠাপূর্ণ বিবেচিত হবে মনে করেই এ বিষয়ে আমার বিনীত অভিমত প্রকাশ করা কর্তব্য মনে করছি। গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ বিষয়ে আলোচনা করা আমি অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি।

(ক) ইংরেজ শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান আমলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলতে না দেবার ফলে রাজনৈতিক ময়দানে যারা সক্রিয় ছিলেন তাদেরকে বাধ্য হয়ে অগণতান্ত্রিক শাসকদের বিরুদ্ধে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে। ফলে বিরোধী দলীয় রাজনীতি গঠনমূলক কর্মকান্ডের বদলে Agitational Politics (বিক্ষোভের রাজনীতি)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা গঠনমূলক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। এরই ফলে শেখ মুজিব সরকার

www.icsbook.info

বিরোধী আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেও দেশ শাসনের জন্য যে ধরনের সুস্থির নেতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী গড়ে তুলবার প্রয়োজন ছিল তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তাই দেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি জাতিকে গড়ে তুলতে সক্ষম হননি।

(খ) প্রায় আজীবন রাজনীতির ময়দানে সংগ্রামরত থাকার ফলে এবং বার বার কারাভোগ করার দরুন তাঁর মধ্যে আবেগ প্রবণতা এতটা প্রবল হয়ে পড়েছিল যে, জাতীয় পর্যায়ে বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তিনি আবেগ দ্বারাই বেশী পরিচালিত হয়েছেন বলে আমার ধারণা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে ঘনিষ্টভাবে জানার আমার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একসাথে কাজ করা ও মত বিনিময় করার মাধ্যমে আমি তাঁকে যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের যতগুলো গুণ দিয়েছিলেন যদি প্রজ্ঞার সাথে তিনি তা ব্যবহার করতে পারতেন তাহলে এদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো।

আমার ধারণায় নেতার মধ্যে প্রজ্ঞার চাইতে আবেগ বেশী থাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। কর্মীদের মধ্যে আবেগই প্রবল থাকা দরকার যাতে তারা নেতার নির্দেশে জীবন দিতে দ্বিধা না করে। কিন্তু নেতার মধ্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার চেয়ে আবেগ প্রবল হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ আবেগচালিত সিদ্ধান্তের মধ্যে ভ্রান্তির আশংকা প্রবল।

(গ) তাঁর সংগ্রামী জীবনে রাজনৈতিক নেতিবাচক কর্মকান্ডের প্রাধান্য থাকার দরুন তাঁর সংগঠনে বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদের লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাই দেশ গড়ার লক্ষ্যে আদর্শ কর্মনীতি ও কর্মসূচীর যে ঐক্য তার সংগঠনে থাকা প্রয়োজন ছিলো তার অভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত যেন অনেকটা অসহায় হয়েই একদলীয় শাসন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

(ঘ) তাঁর দলে যারা কট্টর সমাজতন্ত্রী ছিলেন তারা বুঝতে পারলেন যে, গণতান্ত্রিক উপায়ে এদেশে তাদের কাঙ্খীত সমাজ ব্যবস্থা চালু করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই তারা বিভিন্নভাবে তাঁর উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। অপরদিকে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক দল যেভাবে তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল তাতে হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এক দলীয় সরকার কায়েম করা হলে তাদের সমর্থনও পাওয়া যাবে।

গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা ঃ আমাদের দেশে গণতন্ত্রের পথে নিম্নরূপ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা দূর করা ছাড়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফল হতে পারে না ঃ

www.icsbook.info

১। আইয়ুব খানের আমল থেকেই এ কুপ্রথা চলে এসেছে যে, সামরিক একনায়কগণ ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতায় দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দল গঠন করার অপচেষ্টার মাধ্যমে রাজনীতিতে চরম দুর্নীতি চালু করে। তারা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো থেকেই স্বার্থের বিনিময়ে নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে কিনে নেবার চেষ্টা করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিপন্ন হয়।

২। সামরিক একনায়ক যেসব নেতাকে কিনতে সক্ষম হয় না সে সব দলের নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে যাতে কোন দল তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা পালনের যোগ্যতাই না রাখে।

৩। রাজনৈতিক ময়দানে এভাবেই সুবিধবাদী ও ক্ষমতালিপ্সুদের ভীড় বাড়তে থাকে এবং এ জাতীয় লোকেরাই নেতা হবার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন দলের সৃষ্টি করে। এ জাতীয় লোকদের কারণেই রাজনীতি করাকে অনেক সুধী, জ্ঞানী ও চরিত্রবান লোক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে না এবং তারা রাজনৈতকি অঙ্গনে আসতে চায় না। ফলে রাজনৈতিক ময়দানে নৈতিক ও আদর্শিক মান হ্রাস পেতে থাকে।

৪। আমাদের দেশে ১০০টিরও বেশী রাজনৈতিক দল আছে বলে জানা যায়। এটা মোটেই সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়। গুটিকয়েক লোক মিলে দল গঠনের এ হিড়িকের পেছনে অগণতান্ত্রিক মনোভাবই প্রধানত দায়ী। যেসব মনোবৃত্তির দরুন কথায় কথায় দল সৃষ্টি হচ্ছে সে সবই গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধক। অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ধরন কয়েক রকমের দেখা যায় ঃ

(ক) দলের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব যার হাতে থাকে তিনি দলীয় সংবিধান, আদর্শ ও নীতি অগ্রাহ্য করে নিজ খেয়ালখুশী মতো সিদ্ধান্ত নিলে সংগত কারণেই দল ভেঙ্গে যায়।

(খ) দলের সাংগঠনিক পদ্ধতিতে নেতৃবৃন্দের সমালোচনা ও সংশোধনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে উপদল সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমে দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

(গ) দলীয় আদর্শ ও নীতির চেয়ে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা প্রবল হবার ফলে নেতৃত্বের কোন্দল সৃষ্টি হওয়ার কারণেও এক দল ভেঙ্গে কয়েক দলে পরিণত হয়।

(ঘ) দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় অধিকাংশ সদস্যের রায়ের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই গণতান্ত্রিক রীতি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ

www.icsbook.info

যদি সংগঠনের সংবিধানের চেয়ে নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে অধিকাংশের মতকে মেনে না নেয় তাহলেও দল ভেঙ্গে যায়।

(ঙ) এদেশে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় যে, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ কোন ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলে সে ব্যক্তিও পাল্টা দল গঠনের ঘোষণা দিতে একটুও লজ্জাবোধ করে না।

উপরোক্ত প্রতিটি মনোভাব সুস্পষ্টরূপে গণতান্ত্রিক চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ জাতীয় মনোভাবের দরুনই এদেশে একই নামে প্রায় আধা ডজন দলের অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়।

৫। কোন সময় আদর্শের ঐক্য সত্ত্বেও কর্মনীতি ও কর্মসূচীতে মতের পার্থক্য হতে পারে এবং এর ফলে এক সংগঠনে কাজ করা অসম্ভব হয়ে যেতে পারে। গণতান্ত্রিক নিয়মে এ অবস্থায় অধিকাংশ লোকের মত অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। যারা ভিন্ন মত পোষণ করে তারা নিজস্ব কর্মনীতি ও কর্মসূচী নিয়ে ভিন্ন নামে দল গঠন করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশের মতকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা যদি মূল দলের নামটিকে ব্যবহার করে তাহলে নিঃসন্দেহে তা গণতন্ত্র বিরোধী।

৬। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে যে ভাষায় পারস্পরিক আক্রমণ চলে, বিশেষভাবে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সমালোচনার যে নিম্নমান কখনও কখনও দেখা যায় তা-ও গণতন্ত্রের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৭। গণতন্ত্রের রূপায়ণের পথে সব চাইতে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হলো দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরোধিতা করা। এ মারাত্মক রোগ যে দলে আছে সে দলে নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হলেও তারা শক্তির দাপটেই মীমাংসা করতে চেষ্টা করে।

এ জঘন্য মনোবৃত্তিটি যাদের মধ্যে আছে তারা চিন্তার ক্ষেত্রে আসলেই দুর্বল। তারা যুক্তির বলে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অক্ষম বলেই শক্তির আশ্রয় নেয়। রাজনৈতিক ময়দানে শক্তি প্রয়োগের এ কুপ্রথা এদেশে সরকারী দলেরই অবদান। পাকিস্তান আমল থেকেই তা চলে এসেছে। সরকারী দল বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার জন্য গুন্ডাদল পোষার এ জঘন্য প্রথা আজও পুরা দস্তুর চালু আছে।

মানব জাতির দুর্ভাগ্য যে, রাজনৈতিক ময়দানে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করা একটি আধুনিক মতবাদের কর্মনীতি হিসেবে স্বীকৃত। তারা আফগানিস্তানে

www.icsbook.info

রাশিয়ার অমানবিক হামলায় লজ্জাবোধ করেননি। এদেশেও কাবুল স্টাইলের বিপ্লব করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে তাদের গণতন্ত্রে কোন দূষণীয় কাজ মনে হয় না।

আমারা যদি সত্যি গণতন্ত্র চাই এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে শান্তি, উন্নতি ও প্রগতি কামনা করি তাহলে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

ক্ষমতার রাজনীতি বনাম আদর্শিক রাজনীতি ঃ আমাদের দেশে রাজনৈতিক ময়দানে উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো থাকার আসল কারণ হলো ক্ষমতার রাজনীতি। যে কোন উপায়ে সরকারী ক্ষমতা দখল করাই যদি রাজনৈতিক লক্ষ্য হয়, তাহলে যা হওয়া স্বাভাবিক আমাদের দেশে তাই ঘটছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের যোগ্যভূমিকার মাধ্যমেও যে দেশের যথেষ্ট সেবা ও কল্যাণ করা সম্ভব সে কথা যদি আমাদের বুঝে আসে তাহলে ক্ষমতা দখলের জন্য গণতান্ত্রিক ও অরাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করার কুপ্রথা এদেশে এতটা চালু থাকতে পারবে না।

আইয়ুব খানের কর্মচারীর মর্যাদা নিয়ে যেসব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মন্ত্রী ও গর্ভণর হয়েছিলেন তাদের যদি কোন রাজনৈতিক আদর্শ থাকতো তাহলে কিছুতেই এমন অরাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন না। যে ব্যক্তি জনগণের প্রতিনিধিদের রচিত শাসনতন্ত্র বাতিল করে এবং জাতীয় নির্বাচন বন্ধ করে দেশ রক্ষার মহান দায়িত্ব ফেলে রেখে দেশ শাসনের বোঝা অন্যায়ভাবে নিজের কাঁধে তুলে নিল তার এ জঘন্য কাজে যদি রাজনৈতিক নেতারা সহযোগী না হতেন তাহলে পরবর্তীকালে এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো না।

যারা নিজকে কায়েম করার জন্য রাজনীতি করে তারা যে কোনভাবেই ক্ষমতায় যাবার পথ তালাশ করে। আর যারা দেশ ও জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে রাজনীতি করে তারা ক্ষমতা লাভকে আসল লক্ষ্য মনে করে না। দেশ-সেবার আদর্শ যাদের আসল লক্ষ্য তারা কোন একনায়কের কাছে মন্ত্রীত্ব ভিক্ষা চাইতে পারে না। রাজনৈতিক ময়দানে এ জাতীয় ভিক্ষুকরাই সামরিক শাসনের জন্য আসল দায়ী। এ জাতীয় লোক বাজারে পাওয়া না গেলে সামরিক শাসন বার বার জাতির উপর চেপে বসতে পারতো না।

ব্যক্তি ভিত্তিক রাজনীতি ঃ রাজনৈতিক দল আদর্শ, মত ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত হওয়াই উচিত। কিন্তু কোন দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর যখন দলীয় নেতাকে সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর নেতারা একনায়কের

www.icsbook.info

মর্যাদা দিয়ে বসে তখনই দলটি ব্যক্তিভিত্তিক হয়ে পড়ে। "এক নেতা এক দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ" শ্লোগান দিয়ে শেখ মুজিবকে যখন অতি মানব বানিয়ে দেয়া হল তখন সে ব্যক্তির নামটাই দলের আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়ে গেল।

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী তার সমর্থকদেরকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নামে আলাদা দল গঠন করার পরও তিনি "বঙ্গবন্ধুর" আদর্শের নামই নিলেন। ফলে মূল আওয়ামী লীগের সাথে পাল্লা দিতে তিনি ব্যর্থ হলেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা যখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখন চৌধুরী সাহেব দলের নামই ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

তেমনি অবস্থা বি এন পির মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জেনারেল জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্বই যখন দলের আদর্শে পরিণত হল তখন এ দলের নাম নিয়ে বেগম জিয়ার নেতৃত্বের সাথে প্রতিযোগিতা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তিভিত্তিক দলের নেতৃত্ব ঐ বংশের হাতে থাকাই স্বাভাবিক। পাকিস্তানের মিঃ ভুট্টোর পি পি পি দলের মধ্যে এ অবস্থাই বিরাজ করছে। এমনকি ভারতে গণতন্ত্র মোটামুটি চালু থাকা সত্ত্বেও পন্ডিত নেহেরুর বংশেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব এ পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে আছে। এটা গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়। রাজতন্ত্রেরই পরিচায়ক। এতে বুঝা যায় যে, সত্যিকার গণতন্ত্র এখনও ভারতে কায়েম হয়নি।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

www.icsbook.info

আদর্শিক রাজনীতি

ডুগডুগি বনাম আদর্শের রাজনীতি

সম্মানিত পাঠকবর্গ মাফ করবেন। ডুগডুগির চেয়ে কোন শালীন উদাহরণ যোগাড় করতে পারলাম না। রাজনীতির ময়দানে এদেশে দলের সংখ্যার হিসেব নেই। অনেকেই আদর্শের নাম নেয়। তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আদর্শভিত্তিক রাজনীতি এদেশে অতি দুর্বল। এর আসল কারণ বিশ্লেষণ করতে হলেই ডুগডুগির উদাহরণ দিতে হয়। বানর বা ভল্লুক নাচে এখনো ডুগডুগির ব্যবহার চালু আছে। আমি যে উদাহরণের জন্য "ডুগডুগি" শব্দ ব্যবহার করছি সে ময়দানে কিঞ্চিত উন্নতি হয়েছে। আজকাল সেখানে ম্যাগাফোন বা মাইক ব্যবহার করা হয়। ময়দানটা হলো হাতুড়ে চিকিৎসার।

দেশে জনসংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। চিকিৎসার অভাব থাকায় রোগ বেড়েই চলেছে। যেটুকু চিকিৎসা আছে তাও পয়সার অভাবে অনেকেই পায় না। জনগণের মধ্যে শিক্ষার অভাব। তাই হাতুড়ে চিকিৎসার ময়দান এখনো প্রশস্ত। শহরে বন্দরে বাজারে আজকাল ম্যাগাফোন, মাইক লাগিয়ে হাতুড়ে ডাক্তার বা তার এজেন্ট চিকিৎসা চালায়। আগে এ ক্ষেত্রেই ডুগডুগি ব্যবহার করা হতো।

ডুগডুগি ও মাইক দিয়ে লোকজন জড়ো করার জন্য কোন খেলা বা যাদুর নামেও ডাকা হয়। লোক জড়ো হয়ে গেলে বেশ কায়দার সাথে কথা বলা হয়। মানব দেহে যত রোগ আছে যোগ্যতার সাথে এক নিঃশ্বাসে সব বলার পর একটি মাত্র তাবিজ, গাছের শিকড় বা স্বপ্নে পাওয়া ঔষধ দ্বারা রোগমুক্ত হওয়ার এমন আশার আলো দেখানো হয় যে, শ্রোতা নিজের কিংবা পরিবারস্থ রোগীর চিকিৎসা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে এ হাতুড়ে চিকিৎসাই সম্বল মনে করে।

হাতুড়ে রাজনীতি ঃ যেসব কারণে মানুষ হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় সে ধরনের পরিবেশেই জনগণ হাতুড়ে রাজনীতিবিদদের পাল্লায় পড়ে। রাজনৈতিক ডুগডুগি বাজিয়ে বিরাট হৈ চৈ সৃষ্টি করে জনসভায় লোক জমায়েত করা হয়। যোগ্য হাতুড়ে ডাক্তার মঞ্চে অতি নিপুণতার সাথে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে দেশে যত সমস্যা আছে সব একনাগাড়ে শুনিয়ে

www.icsbook.info

দিয়ে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে। সমস্যা জর্জরিত মানুষ সে দরদী আওয়াজ কান লাগিয়ে শুনে। সমাধান তারা জানে না। কিন্তু সমাধান পেতে চায়। সমস্যার সুচিকিৎসক কারা তা চিনবার ক্ষমতাও তাদের নেই। যারা তার রোগ নিয়ে এত দরদ দেখাচ্ছে তাদের কাছ থেকেই চিকিৎসা আশা করছে। হাতুড়ে রাজনীতিবিদ তখন "তার দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় দিলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে" সে কথা জানিয়ে দিয়ে জনগণের প্রতি 'পবিত্র' দায়িত্ব পালন করে।

হাতুড়ে ডাক্তারের তাবিজ বা ঔষধে যে রোগ সারে না বরং রোগ বাড়ায় এ অভিজ্ঞতা যদি কারো চোখ খুলে দেয় তাহলে সে পাস করা আসল ডাক্তার তালাশ করে। তেমনি হাতুড়ে রাজনীতির কুফল ভোগ করার পর যদি জনগণের বুঝবার যোগ্যতা হয় কিংবা সুচিকিৎসকগণ যদি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয় তাহলে হাতুড়ে রাজনীতিবিদদের হাত থেকে বাঁচার উপায় হতে পারে।

ডুগডুগি রাজনীতির আরো একটি বড় লক্ষণ আছে। রাজনৈতিক ময়দানে সুস্থ পরিবেশ ও মুক্তবুদ্ধি তাদের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। তারা মানুষের মধ্যে এমন এক ভাব প্রবণতার সৃষ্টি করে যাতে জনগণ জোশের বশবর্তী হয়ে হুশ হারিয়ে তাদের ডুগডুগির তালে নাচতে থাকে। আবেগময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে, ঘোলা পানিতে মাছ শিকারই তাদের রাজনীতি।

গণতান্ত্রিক রাজনীতি ঃ সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে দেশের, সমস্যাবলীর সত্যিকার সমাধান দিতে হলে এবং জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি আন্তরিকভাবে চাইলে এ জাতীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সমাজতন্ত্র নামক আদর্শের নাম নিয়েও ডুগডুগি রাজনীতি করতে দেখা যায়। সমাজতন্ত্র যদি কল্যাণের আদর্শই হয় তাহলে মানুষকে ধীরভাবে বুঝানো যাবে না কেন? মানুষের মনে শ্রেণী বিদ্বেষ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ময়দানে হিংসার আগুন জ্বালাবার দরকার কি? শোষকের সংখ্যা সামান্য—শোষিতই প্রায় সবাই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণকে তাদের স্বার্থের কথা বুঝাতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তারা এ পথ পছন্দ করেন না। বন্দুকের নল ছাড়া মানুষকে নাকি বুঝানো যায় না। তাই তাদেরকেও ডুগডুগির আশ্রয় নিতে হয়।

এ বিষয়টাকে সুস্পষ্ট করার জন্য আরো একটু বিশ্লেষণ করা দরকার। মানুষ রাজনীতি করে কেন? উদ্দেশ্যেহীনভাবে কেউ কাজ করে না। রাজনৈতিক ময়দানে কে কোন্ উদ্দেশ্যে নেমেছেন তার ভিত্তিতেই একের

www.icsbook.info

রাজনীতি অন্য থেকে পৃথক হয়। মুখে নীতি কথা যাই বলুক, একটি দলের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি থেকেই তার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বুঝা যায়। জনগণ যে পর্যন্ত এসব কথা বুঝবার যোগ্য না হবে ততদিন তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে না। এসব কথা বুঝবার জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জরুরী নয়। ছাত্র সমাজের একাংশ কি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ডুগডুগি রাজনীতির হাতিয়ার নয়? আসল হল রাজনৈতিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলে অশিক্ষিত জনগণও এ শিক্ষা পেতে পারে।

রাজনীতির উদ্দেশ্য ঃ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকলে রাজনীতিও থাকবে। প্রশ্ন হচ্ছে রাজনীতির উদ্দেশ্য কি? রাজনীতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সরকারী ক্ষমতার্জন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা সরকারী ক্ষমতা চাইবারই বা উদ্দেশ্য কি? সরকারী ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যও একাধিক হতে পারে ঃ

১। ক্ষমতার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ঃ ক্ষমতার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা চাওয়া জঘন্যতম কাজ। এটাকে বলা যায় জাতীয় ডাকাতি এবং জনগণের বিরুদ্ধে এক মহা ষড়যন্ত্র। জনগণের সেবার দোহাই দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে শক্তির বাহার দেখানো, জনগণের মতামতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গোষ্ঠী বিশেষের মর্জি ও স্বার্থ মোতাবেক কাজ করাকে জাতীয় ডাকাত না বলে আর কিইবা বলা যেতে পারে? ক্ষমতা হাতে পেয়ে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা, স্বজনপ্রীতি, ভোগবিলাসের মাধ্যমে সরকারী সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার, জনগণের অর্থের অপচয় এবং তাদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টা যারা করে তাদের এ সমস্ত কার্যাবলী নিঃসন্দেহে জনগণের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতা। প্রকৃতপক্ষে এটা ক্ষমতালোভীদের স্বভাব। এটাই হলো ক্ষমতার রাজনীতি।

২। জনসেবার উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ঃ জনসেবার দায়িত্ব কঠিন ও ত্যাগ সাপেক্ষ। বিনা স্বার্থে ব্যক্তিগত গরজে মানুষ এ দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নেয় না। কেননা এ দায়িত্বের কামনা করা নিঃস্বার্থ লোকদের জন্য অস্বাভাবিক।

শুধু জনসেবার দোহাই দিলেও এটাই ক্ষমতার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে না। জনসেবার নামে ক্ষমতা দখল করে পার্থিব যাবতীয় স্বার্থেই কাজ করা হয়। অবশ্য 'বুদ্ধিমান'রা এ ক্ষেত্রে জনসেবা এতটুকুই করে যতটুকু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়। এক কথায় এখানেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাই রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৩। আদর্শের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা ঃ আদর্শের দোহাই দিয়েও অনেকে ক্ষমতা লাভ করে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে এটা প্রায়শঃই ঘটে থাকে। কিন্তু মুখে

www.icsbook.info

আদর্শের কথা আওড়ালেও তাদের কাজে কিংবা চরিত্রে সে আদর্শের প্রতিফলন না ঘটলে তাদের কুমতলব ধরা পড়ে যায়। এ ধরনের লোক আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাই করে থাকে। সুতরাং কোন জনপ্রিয় আদর্শের দোহাই দিলেই কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

পর্যবেক্ষণ করে দেখা দরকার যে, যে আদর্শের দোহাই দেয়া হচ্ছে বাস্তব কার্যকলাপে তার নিদর্শন পাওয়া যায় কি না।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দোহাই ঃ (ক) গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে অনেকে ক্ষমতা পায়। কিন্তু গণতন্ত্রের দোহাই দিলেই গণতন্ত্রী হয়ে যায় না। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র আছে কি না; দলের কর্মীদের সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবহার করা হয় কি না ; দলের রাজনৈতিক কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলা হচ্ছে কি না তার উপরই নির্ভর করে ঐ দলের গণতন্ত্রের প্রকৃতি। যে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নেই সে দল ক্ষমতায় গিয়ে গণতন্ত্রকে খতম করাই প্রধান কর্তব্য মনে করে।

গণতান্ত্রিক নেতার বক্তৃতার ভাষা ও ভঙ্গী থেকেই তাকে এবং তার দলকে চেনা যায়। যুক্তির বদলে যারা শক্তির হুমকি দেয়, হৃদয়ের আবেদন বাদ দিয়ে যারা হাত ও পায়ের দাপট দেখিয়ে বক্তৃতা করে, প্রতিপক্ষকে যারা গায়ের জোরে দমাতে চেষ্টা করে, গ্রেনেড ও হাতবোমা দিয়ে যারা "রাজনৈতিক শত্রুর" মোকাবিলা করে তাদের পরিচয় স্পষ্ট।

(খ) সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী হয়ে যারা গণতন্ত্রের দোহাই দেয় তারা অশিক্ষিত লোকদেরকে কিছুদিনের জন্য বোকা বানাতে সক্ষম হলেও রাজনীতি সচেতন লোকদেরকে ধোঁকা দিতে অক্ষম। কারণ সচেতন লোকেরা জানে সমাজতন্ত্রীরা একবার কোথাও ক্ষমতায় আসতে পারলে সে দেশে চিরদিনের জন্য গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয় সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহীগণ গণতন্ত্রের মাধ্যমে একবার কোন প্রকারে ক্ষমতায় যেতে পারলে গণতন্ত্র হত্যা করাকেই তারা নিজেদের পয়লা নম্বর কাজ বলে মনে করে।

ইসলামের নামে রাজনীতি ঃ (গ) ইসলামী আদর্শবাদী না হয়েও ইসলামের নাম নিয়ে কেউ কেউ রাজনীতি করে থাকেন। তাই ইসলামের নাম নিয়ে ক্ষমতা পেলেই ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে না। এ উপমহাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস একথার সাক্ষী। ইসলামের নামে মুসলিম জনতাকে পাগল করে, অসংখ্য মুসলমানের রক্তের উপর ভিত্তি করে, হাজার হাজার মা-বোনের ইজ্জত আবরু বিকিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের ধন-সম্পদ

www.icsbook.info

বাড়ী ঘর ধ্বংস করে তাদেরকে পথের ভিখারী বানিয়ে যারা ক্ষমতায় বসলেন তাদের হাতেই ইসলামের দুর্দশা ঘটল।

যারা ইসলামের জ্ঞান রাখে না, ইসলামকে জানার চেষ্টা করে না, যেটুকু জানে তাও বাস্তবে মেনে চলে না, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কেবল মুখে ইসলামের গুণকীর্তন করে, তাদের দ্বারা সমাজে কিভাবে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে? যারা নিজেদের সাড়ে তিন হাত দেহে, কয়েক ইঞ্চি জিহ্বায় এবং দেড় ইঞ্চি চোখে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম, তাদের দ্বারা একটা দেশে কিভাবে ইসলামী আদর্শ কায়েম হতে পারে? কক্ষণো হতে পারে না। যারা নিজেদেরকে ইসলামী নীতিতে চালাতে পারে না। তারা গোটা জাতিকে কি করে এ আদর্শের পথে পরিচালিত করতে পারে? তাদের এ অধিকার ও যোগ্যতা কোনটাই নেই। এ জাতীয় লোকদের দ্বারা ইসলামের নামে ধোঁকাবাজী কিংবা প্রতারণা বৈ আর কিছুই হতে পারে না।

ইসলামের নামে যে দল ক্ষমতা চাইবে তাকে সমর্থন করার পূর্বে দেখা দরকার যে সে দলের নেতারা ইসলামের জ্ঞান রাখে কি না। তাদের সে ইলম যদি বাস্তবিকই থেকে থাকে তবে সে জ্ঞানানুযায়ী তারা আমল করছে কিনা। তাদের কর্মীবাহিনীর মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে কিনা। ইসলামকে প্রচার এবং প্রসার করার যে মৌলিক দায়িত্ব তাদের উপর রয়েছে তা তারা আমানতদারীর সাথে পালন করছে কি না। উল্লেখিত কার্যাবলী যদি নিষ্ঠার সাথে তারা করে থাকে কেবল তখনই সে দলকে ইসলামী দল হিসেবে গণ্য করা যায়। শুধু তাই নয় এমতাবস্থায় তাদের সহযোগিতা করা সমগ্র মুসলিম উম্মার উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আদর্শের রাজনীতি ঃ দক্ষিণ এশিয়ার ৫৬ হাজার বর্গমাইলের দেশ বাংলাদেশ। ভৌগলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এ দেশটি এমন একটা অবস্থানে আছে যার অস্তিত্ব নির্ভর করে সুস্থ রাজনীতির উপর। আর সুস্থ রাজনীতি আদর্শের উপরই নির্ভরশীল। কোন রাজনৈতিক দর্শন ব্যতীত রাজনীতি করা যেমনি অসততা, তেমনি আসল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে কোন আদর্শের দোহাই দেয়া চরম ধোঁকাবাজী।

যিনি যে আদর্শই কায়েম করতে চান তা জনগণের নিকট পরিষ্কার করে তুলে ধরতে হবে। এখানে চোরাকারবারীর কোন অবকাশই থাকতে পারে না। রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শনের প্রতি যাদের নিষ্ঠা আছে তাদের প্রতিপক্ষের অন্তরেও তাদের জন্য শ্রদ্ধোবোধ থাকে এবং আদর্শের লড়াই সত্ত্বেও দেশে

www.icsbook.info

সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় থাকে। যদি প্রকৃতই আদের্শের রাজনীতি দেশে আন্তরিকতার সাথে চালু করা হয় তবেই জাতি ও দেশ হিসেবে আমাদের টিকে থাকা সম্ভব।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

রাজনীতি ও নৈতিকতা

যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরা যে দলেই থাকুন, অবশ্যই নিজেদের হাতে সরকারী ক্ষমতা চান। তাঁরা দেশের সেবা যেভাবে করতে চান তা ক্ষমতা হাতে পেলেই সম্ভব হতে পারে। ক্ষমতা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচী বাস্তবে রূপলাভ করতে পারে না। আবার নৈতিকতা জাতির সেবার জন্য একটা অপরিহার্য গুণ। নৈতিকতা ব্যতীত ক্ষমতার ন্যায়ভিত্তিক ব্যবহার সম্ভব নয়। ক্ষমতার অপব্যবহার হলে জাতি সেবার পরিবর্তে জুলুমই ভোগ করে। পক্ষান্তরে ক্ষমতা না পেলেও নীতিবান রাজনীতিক দ্বারা দেশ ও জাতির কিছু না কিছু খেদমত অবশ্যই হয়।

সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদের নৈতিক মানের উপরই দেশ ও জাতির প্রকৃত উন্নতি নির্ভর করে। সমাজে নৈতিক অবনতি বাড়তে থাকলে নিঃসন্দেহে এর জন্য ক্ষমতাসীনদেরকে দায়ী করা যায়। কারণ ক্ষমতাসীনরা হচ্ছেন চলন্ত গাড়ীর ড্রাইভারের মতো—যার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং নৈতিকতার উপর নির্ভর করে অসংখ্য যাত্রীর জীবন। দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যাদের হাতে থাকে তাদের নৈতিকমান, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পলিসি স্বাভাবিকভাবে সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। জনগণের চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, তাদের কর্মতৎপরতা এমনকি জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নতি-অবনতি, বর্হিবিশ্বে তার সম্মান ও মর্যাদা এসব কিছুই ক্ষমতাসীনদের নৈতিক মানের উপর নির্ভর করে। এ কারণেই আরবীতে বলা হয়েছে, "আন্‌নাসু আলা দ্বীনি মুলুকিহীম" অর্থাৎ জনগণ শাসকদের জীবন ধারাই অনুসরণ করে।

চরিত্রের গুরুত্ব ঃ মানব জীবনের চরিত্রের গুরুত্ব কোন কালেই অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। উন্নত চরিত্রের নেতৃত্ব ব্যতীত কোন দেশই সত্যিকার উন্নতি করতে পারে না। মানুষ বিবেকবান জীব হিসেবে ভালমন্দের একটা সার্বজনীন ধারণা পোষণ করে। এরই নাম মনুষ্যত্ব। এটাই মানুষকে পশু থেকে পৃথক মর্যাদা দিয়েছে। দেশ ও সমাজের নেতৃত্বের অধিকারী যারা তাদের চরিত্রের মান উন্নত না হলে জনগণের চারিত্রিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। কতক ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান উন্নত মানের চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করে তা স্বল্পসংখ্যক লোকের

www.icsbook.info

মধ্যেই সাফল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে তারা চরিত্রহীন হলে রাষ্ট্রীয় উপায়-উপকরণের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ লোককে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। পক্ষান্তরে উন্নত চরিত্রের লোকেরা ক্ষমতাসীন হলে সমগ্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহার করে জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে আদর্শ চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

তাই রাজনৈতিক ময়দানেই উন্নত চরিত্রের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। চরিত্রহীন লোক যদি রাজনীতিতে প্রাধান্য পেতে থাকে তবে জাতীয় চরিত্রের অবক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। জাতীয় এ অবক্ষয়ের কারণেই দেশে খুন খরাবী, হাত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি, ব্যাভিচার, ঘুষ, দুর্নীতি, শোষণ, বঞ্চনা, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং জন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে।

পলিটিক্স মানে ধোঁকাবাজী ঃ আমাদের দেশে এমন অনেক নীতিবিদ ও চরিত্রবান লোক রয়েছেন যারা রাজনীতি করাকে রুচিবিরুদ্ধ মনে করেন। কারণ অধুনা রাজনৈতিক কার্যকলাপে চরিত্রের যে রূপ দেখা যাচ্ছে তা নীতিজ্ঞান সম্পন্ন লোকের নিকট ঘৃণার বিষয় ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। রাজনীতিটা আমাদের সমাজের চরিত্রবান লোকদের নিকট এমনই ঘৃণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সাধারণভাবে অনেক ভদ্রলোকই বলে থাকেন "আমি ভাই পলিটিক্স করি না।" আবার কেউ যদি কোন বিষয়ে স্পষ্ট ব্যক্তব্য গোপন করে কায়দা করে কথা ফাকি দিয়ে সেরে যেতে চায় তাহলে বলা হয় "দেখুন আমার সাথে পলিটিক্স করবেন না।" এরদ্বারা পলিটিক্স করা মানে ধোঁকাবাজি করাকেই বুঝানো হয়।

নৈতিকতাবর্জিত রাজনীতির পরিণাম ঃ ১। যে নেতারা মুখে নীতিবাক্য আওড়ান আর বাস্তবে কর্মীদেরকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ শেখান তারা পরবর্তী সময়ে কর্মীদের হাতেই অপদস্থ হন। কর্মীরা এ ধরনের দলে বিভেদ সৃষ্টি করে পাল্টা দল গঠন করে। এভাবেই এদেশে একটি দল স্বার্থের জন্য ও নেতৃত্বের কোন্দলে বহু দলে বিভক্ত হয়। একই নামে বহু দল এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

২। নীতিহীন দল ও নেতৃত্ব ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে এমন সব অবাস্তব ওয়াদা করে যা ক্ষমতায় গিয়ে তারা পূরণ করতে পারে না। ফলে জনগণ হতাশ হয়। কর্মীরা নেতাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়। নেতাদের ছলে বলে কলে কৌশলে ক্ষমতায় যাওয়ার পদ্ধতি দেখে জনগণ মনে করা শুরু করে যে, রাজনীতি করা মোনাফেকী ও অসভ্য স্বভাবের কাজ। উন্নয়নশীল বিশ্বে এসব নীতিহীন দল ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে গণঅসন্তোষ গণবিক্ষোভে

www.icsbook.info

পরিণত হয়। দেশের অর্থনীতি পর্যন্ত রাজনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে নিপতিত হয়। ফলে সামরিক শাসন জারি হয় এবং দেশের সঙ্কট জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করে।

৩। অসৎ দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর লোকদের হাতে শাসনক্ষমতা এলে তারা সরকারী কর্মচারীদেরকে দলীয় স্বার্থে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে। সরকরী দলের পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগে কর্মচারীরা জনগণকে শোষণ করার লাইসেন্স পেয়ে যায়। যে কোন অন্যায় করেও তারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ফলে দুর্নীতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, জনজীবন একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

৪। সরকারী দল নৈতিকতাবর্জিত হলে তারা ক্ষমতার প্রভাবে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা আদায় করে। মোটা অংকের টাকা ছাড়া মন্ত্রীরাও যেখানে কাজ করতে চায় না সেখানে অফিসাররা আরো সুযোগ নেয়। এর ফলে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যাবতীয় ঘুষের মোটা অংক কারখানা ও ব্যবসায়ের খরচে শামিল করে জিনিসের দাম বাড়ায়। তাই সরকার এ দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে কিছুই বলে না। নির্বাচনের সময় একজাতীয় রাজনীতিকরা যে মোটা অংকের টাকা ব্যয় করে তাও এ পদ্ধতিতেই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে নেয়। আর ব্যবসায়ীরা শেষ পর্যন্ত তা দ্রব্য মূল্যের আকারে জনগণের ঘাড়ে চাপায়। এভাবেই জনজীবন হয়ে পড়ে কঠিন থেকে কঠিনতর।

৫। নীতিজ্ঞান বর্জিত রাজনীতির ফলে দুষ্ট লোকদের সকল প্রকার অপ-কর্ম বৃদ্ধি পায়। "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" শাসকদের কর্তব্য বলে চিরদিন স্বীকৃত হলেও চরিত্রহীন রাজনীতিকরা এর উল্টোটাই চালু করে থাকে। বিচারের বাণী সেখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদে। ফলে সমাজে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিই প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক ডাকাতি ঃ যদি কেউ জাতির উন্নতির লক্ষ্যে রাজনীতি করতে চান তাহলে তাঁর হাতে অবশ্যই জাতীয় চরিত্রের মানোন্নয়নের কর্মসূচী থাকা উচিত। চরিত্রবান কর্মীবাহিনী সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া যাঁরা রাজনীতি করেন শুধু ডানপিটে কর্মীদল নিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখলের যাঁরা চেষ্টা করেন, যুক্তির বদলে শক্তির ব্যবহারের দ্বারা যারা প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে চান তারা আর যাই হোক দেশ গঠনের কোন পরিকল্পনা রাখেন না। মনোবৃত্তির দিক দিয়ে তারা ডাকাত। সাধারণ ডাকাত আইন ও প্রশাসনের বাধা এবং জেল ও গণ-পিটুনির ঝুঁকি নিয়ে ডাকাতি করে। কিন্তু যারা

www.icsbook.info

রাজনৈতিক ডাকাত তারা সরকারী ক্ষমতা হাতে নিয়ে গোটা দেশের উপর ডাকাতি করে। তাতে আইন ও প্রশাসনকে ডাকাতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই এরা জাতীয় ডাকাত।

রাজনৈতিক ময়দানে নৈতিকতার প্রাধান্য না হওয়া পর্যন্ত দেশবাসী সরকারের কাছ থেকে সত্যিকার খেদমত বা সেবা কিছুতেই পাবে না। জনগণ যদি সত্যই শান্তি পেতে চায় তাহলে চরিত্রহীন নেতা ও রাজনৈতিক দলকে জাতীয় ডাকাত মনে করতে হবে। চরিত্রহীন লোকদের হাতে নেতৃত্ব দিয়ে যারা খেদমত পাওয়ার আশা করে তারা প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যাই করে। আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের (সাঃ) হাদীসে এ জন্যই সৎ, খোদাভীরু ও চরিত্রবান লোকদের হাতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এত তাকিদ দেয়া হয়েছে।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

সুস্থ রাজনীতির ভিত্তি

একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার বিশ্বাস, রাজনীতিকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, তাদের কোন স্থায়ী আসন জনগণ ও কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। যারা দেশ ও জাতির খেদমতকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন, এ ময়দান তাদেরই উপযোগী। পেশাদার রাজনীতিবিদরা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন, তারা সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সংগ্রাম ও ত্যাগের পথে এগিয়ে যেতে পারেন না। রাজনীতি যাদের নেশা, তারাই সংগ্রামী হয়। তারা কোন মতবাদ বা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এর জন্যে যে কোন কুরবানী স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এরাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্মী ও নেতা হয়।

তাই এ ময়দানে যারাই অবতীর্ণ হবেন তাদের পয়লা কর্তব্য হবে কোন আদর্শ ও মতবাদকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা। নিজকে কায়েম করাই যাদের লক্ষ্য তাদের এ ময়দানে অবতীর্ণ না হওয়াই উচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে কোন আদর্শ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যেখানে বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শের লড়াই ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে এসেছে, সেখানে সুবিধাবাদী ধরনের রাজনীতির কোন স্থান নেই। কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় পেশাদার রাজনীতিবিদের স্থায়ী আসন হাসিল করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এদেশের পরিবেশ সাময়িকভাবে নেতা হিসেবে স্বীকৃত হলেও কারো পক্ষে স্থায়ী নেতৃত্ব অর্জন অসম্ভব।

সুতরাং যারাই এদেশের সত্যিকার খেদমত করতে চান এবং যারা রাজনীতির কঠিন ও অনিশ্চিত ময়দানে মূল্যবান জীবন ও সময় নিয়োজিত করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো রাজনৈতিক মতাদর্শ।

www.icsbook.info

সবদিক বিবেচনা করে যে আদর্শকেই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করুন, তার প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন। সুস্থ রাজনীতির এটাই প্রথম ভিত্তি।

আদর্শের বাছাই—প্রথম ভিত্তি ঃ দেশে যারাই রাজনীতি করতে চান, তাদেরকে তিনটি বিকল্প আদর্শের মধ্যে একটিকে বাছাই করতে হবে। আদর্শ বাছাই করার মানদন্ড নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু যে আদর্শই বাছাই করুন, ধীরভাবে বিবেচনা করে এবং দেশের সার্বিক কল্যাণকে সামনে রেখেই বাছাই করতে হবে। এ তিনটি আদর্শের মধ্যে পয়লা হলো ঃ

১। ইসলাম ঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা ও সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টনের নীতি সহ একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে ভালভাবে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। শুধু তাই নয়, যারা ইসলামের নৈতিক বিধানকে পালন করে চলার মত চারিত্রিক সবলতা অনুভব করেন না, তাদের পক্ষে ইসলামী আদর্শকে পসন্দ করা সত্ত্বেও এর জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

এদেশের শতকরা আশিজন নাগিরিকের ঐতিহ্য ও মানসিক প্রস্তুতি বিবেচনা করলে এবং সর্বোপরি মুসলিম হিসেবে চিন্তা করলে ইসলামী আদর্শকেই রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

২। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ যে কোন কারণেই হোক যারা ইসলামকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে অক্ষম কিন্তু জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা 'গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমূলক' রাষ্ট্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। জনগণের আস্থাভাজন সরকার কায়েম করে পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'বৃহত্তর সংখ্যক নাগরিক সর্বাধিক কল্যাণ সাধনকে' ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। দেশকে অশান্তি ও বিশৃংখলা থেকে বাঁচাবার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে 'গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র' একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হাতে পারে। অবশ্য কোন নিষ্ঠাবান মুসলমানের পক্ষে এটুকু আদর্শ মোটেই যথেষ্ট হতে পারে না। তবুও মন্দের ভাল হিসেবে ইসলামের পর এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ।

৩। ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন হোক বা বর্তমান যুগে সমাজতন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের ফলেই হোক, যারা সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন তাদেরকেও এ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া প্রয়োজন। তারা

www.icsbook.info

যদি 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' বা 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' ন্যায় উদ্ভট নাম দিয়ে এদেশের মাটিতে দখলী স্বত্ব কায়েম করতে চান, তাহলে মানুষের সামনে ধোঁকাবাজ হিসেবে পরিচিত হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। অবশ্য ধোঁকা দেয়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কোন নীতি বিরুদ্ধ কাজ নয়। কিন্তু সমাজে ধোঁকাবাজ হিসেবে পরিচয় লাভ করাটা নিশ্চয় সে আদর্শের পক্ষেও লাভজনক নয়।

সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে যারা নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করবেন, তাদের কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, এদেশে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া সমাজতন্ত্র কায়েম হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই সমাজতন্ত্রীরা চীনপন্থী বা রুশপন্থী হতে বাধ্য। জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী কিছু লোক থাকলেও বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে তাদের কোন সংগঠন এখনো দানা বাঁধতে পারেনি।

দ্বিতীয় ভিত্তি ঃ যারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে চান এবং আন্তরিকভাবে দেশের মংগল কামনা করেন তাদের দ্বিতীয় প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো 'রাজনৈতিক কর্মপন্থার ধরন'। জনগণের সমর্থনে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা দখল করাই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়, তাহলে গণতন্ত্রের দোহাই না দিয়ে সরাসরি ফ্যাসিতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের নামেই রাজনীতি করা উচিত।

রাজনৈতিক কর্মপন্থার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বিষয়ের মীমাংসা যদি যুক্তির বদলে শক্তি দ্বারা করারই প্রচেষ্টা চলে, তাহলে কোনদিনই জনগণের সরকার কায়েম হতে পারে না। শক্তি প্রয়োগের নীতি চালু হলে গুন্ডামীর প্রতিযোগিতায় যারা শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত তারাই রাষ্ট্র পরিচালক হবে। এরপর রাজনৈতিক ময়দান গুন্ডাদের আখড়ায় পরিণত হবে। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যেখানেই শক্তিবলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা হয়েছে, সেখানেই যুক্তির অপমৃত্যু ঘটেছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে এবং ক্ষমতাসীনদের দুষ্কৃতির সমালোচনার পথ বন্ধ হয়েছে। মানব সমাজের জন্যে এর চেয়ে জঘন্যতম পরিস্থিতি কল্পনাও করা যায় না। তাই মনুষত্বের বিকাশের প্রয়োজনে শক্তি বলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রীতি অবশ্যই বর্জনীয়।

তাই এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে আন্তরিকতার সাথে আমাদের সবাইকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান করার স্বাভাবিক রীতিই দেশে চালু করবোএবং একমাত্র গণতান্ত্রিক পন্থায়ই রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করবো। গণতান্ত্রিক

www.icsbook.info

রীতিনীতি দেশে চালু থাকলে ক্ষমতাসীন না হয়েও সরকারকে বহু জনকল্যাণমূলক কাজে বাধ্য করা যায়। শক্তির পরিবর্তে যুক্তি প্রতিযোগিতা মানবতার দিক দিয়ে সমাজকে ক্রমেই উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়। এ পরিবেশে সব দল ও নেতাই জনগণের মনে উন্নততম আদর্শ ও কর্মসূচী পেশ করার প্রতিযোগিতায় লেগে যায়। একবার যারা ক্ষমতাসীন হয়, তাদেরকে কয়েক বছর আবার নির্বাচনের সম্মুখীন হবার ভয়ে জনকল্যাণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। বিরোধী দল তার চেয়েও অধিক কল্যাণব্রতী কর্মসূচী পেশ করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সমাজ মংগল ও কল্যাণকর নীতির দিকে এগিয়ে চলে।

বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোন সরকারই এরূপ কল্যাণকর নীতি চালু করবার চেষ্টা করেননি। বরং অধিকাংশ এর বিপরিত পন্থায়ই কাজ করেছেন। এর ফলেই বিরোধী মহলেও শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ সৃষ্টির রেওয়াজ চালু হয়েছে। এ জঘন্য পদ্ধতির প্রবর্তনের স্বাভাবিক পরিণাম এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেছে। একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দলগুলোর মধ্যেই কোন কোন দল অপর গণতন্ত্রকামী দলের উপর বিভিন্ন-ভাবে বল প্রয়োগ করে এবং যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে শক্তি দ্বারা ফয়সালা করার চেষ্টা করেছে। এমনকি কোন কোন নেতা অন্যান্য দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনতাকে শুধু এ জন্য ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন যে, তারা উক্ত নেতার অযৌক্তিক মত গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এরই ফলে কারো কারো ওপর দৈহিক আক্রমণও হয়েছে। যারা সরকারী ক্ষমতায় পৌছবার পূর্বেই এমনি শক্তির দাপট দেখাবার চেষ্টা করেন তারা ক্ষমতাসীন হলে আরো যে কি কি করতে পারেন, তা ধারণা করা কঠিন নয়।

এ ব্যাপারে সমাজতন্ত্রী মহলের উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক। কারণ বলপ্রয়োগ দ্বারা ক্ষমতা দখল করাই তাদের একমাত্র নীতি। এ কারণে 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' 'সংগ্রাম শুধু সংগ্রাম' 'ধরো মারো দখল করো' ইত্যাদি মন্ত্র তাদের পক্ষেই শোভন। কাজেই যারা গণতন্ত্রের দোহাই দেয় তাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সমাজতন্ত্রের কর্মপন্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। একমাত্র গণতান্ত্রিক কর্মনীতির মাধ্যমেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মনীতি বাছাই করার সাথে সাথে একথাও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, দেশের জন্য অকল্যাণকর মতবাদ ও অগণতান্ত্রিক কর্মপন্থার মোকাবিলা করার জন্যে গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসীদেরকেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেত হবে। আপনার পক্ষে

www.icsbook.info

কারো সভা পন্ড করতে চেষ্টা করা নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু আপনার সভায় যারা গুন্ডামী করতে আসবে তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। শক্তির বলে আপনার মতামত অপরের উপর চাপাবার অপপ্রয়াস যেমন অন্যায়, আপনার ওপর অপরের মতামত চাপাবার হীন প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেয়াও তেমনি দোষ। যে সত্য মিথ্যা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে না সে সত্য সত্যের মর্যাদা পেতে পারে না। তাই সঠিক আদর্শ ও কর্মনীতি গ্রহণের পর মজবুত সংগঠন অপরিহার্য। সৎপন্থীরা আজ সুসংগঠিত নয় বলেই অন্যায়ের দাপট এতটা প্রবল। অভদ্রতাকে প্রশ্রয় দেয়া কোন দিক দিয়েই ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। মজবুত সংগঠনের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদের বলিষ্ঠ প্রতিরোধ ব্যতীত সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি অসম্ভব।

ইসলামী দলের কর্মপন্থা ঃ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার ব্যাপারে ইসলামী দলের পক্ষে ইসলাম বিরোধীদের মত নীতিহীন ও মানবতা বিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তারা যখন ইসলামী দলের সভা সমাবেশ বা মিছিলে হামলা করে তখন প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হামলাকারীদের সাথে প্রয়োজনীয় "মেহমানদারী" করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু তারা যে সন্ত্রাসী কায়দায় চোরাগুপ্তা হামলা করে এবং রিকশা বা বাস থেকে নামিয়ে, রেলষ্টেশনে একা পেয়ে, অফিসে, বাড়িতে, হোষ্টেলে ও হলের কামরায় নিরস্ত্র লোকদের উপর কাপুরুষের মত অতর্কিতে হামলা চালায় এর প্রতিরোধ ইসলামী দলের জন্য বড়ই কঠিন। কারণ এমন অমানবিক পন্থা কোন মুসলিমের পক্ষে অবলম্বন করা সম্ভব নয়। তাদের এ জাতীয় পাষন্ডসূলভ তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করে সমাজে এদেরকে অপাংতেয় করে দিতে হবে এবং ইসলামী দলকে গণসংগঠনে পরিণত করতে হবে যাতে সন্ত্রাসীরা অপকর্ম করে পালাবার সুযোগ না পায়।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

রাজনীতি ও সমাজ সেবা

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই সমাজ সেবা। সমাজকে সেবা করার মহান ব্রত নিয়েই রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতরণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে একটি গণতান্ত্রিক দেশে সর্বসাধারণের খেদমত ব্যতীত রাজনীতি চর্চার অপর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। রাজনৈতিক আন্দোলন বাহ্যত ক্ষমতা দখলেরই প্রচেষ্টা, কিন্তু ক্ষমতা অর্জনই এর চরম লক্ষ্য নয়। দেশের জনগণের খেদমত করতে হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য। কিন্তু যে

www.icsbook.info

রাজনীতির পরম কাম্য ও প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করা, তা দ্বারা স্বার্থপর রাজনীতিকদের কিছু খেদমত হলেও জনসেবার কোন সম্ভবনাই সেখানে নেই।

আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে রাজনীতিকের অভাব নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনের দাপটে নাগরিক জীবন অস্থির। ক্ষমতার রদবদলও কম হয়নি। অথচ জনসেবা যে কতটুকু হয়েছে তার আর বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের রাজনীতিকগণ সাধারণত ব্যক্তি, স্বজন ও দলকেই জনগণের স্থলাভিষিক্ত মনে করে জনসেবার কর্তব্য পালন করেন। ফলে সমাধানের পরিবর্তে দেশের সমস্যা আরও জটিল হয়েছে এবং এ মন সব নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যা কিছুদিন পূর্বে ধারণারও অতীত বলে মনে হতো।

রাজনৈতিক আন্দোলন যেভাবে জনসেবার পরিবর্তে পাইকারী জুলুম ও সুপরিকল্পিত অত্যাচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে তাতে প্রত্যেক নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক কর্মী ও চিন্তাশীল সমাজ কর্মীদের হুঁশিয়ার হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিছু সংখ্যক নিঃস্বার্থ কর্মীদল ব্যতীত কোন রাজনৈতিক আন্দোলনই সফল হতে পারে না। সুতরাং যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভ করেও জনসেবার পরিবর্তে গণ জুলুম করেছে সেসব দলও কিছু সংখ্যক নিঃস্বার্থ কর্মী ব্যতীত ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি। এসব নিঃস্বার্থ কর্মীদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, তাদের অক্লান্ত শ্রম ও কঠোর ত্যাগের ফলে যারা জনসেবার ওয়াদা করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন, তারা কেন এরূপ স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করে চরম বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় প্রদান করেন। ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ কর্মীদের মধ্যে এই তিক্ত অভিজ্ঞতা গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করেছে।

একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এ লজ্জাকর পরিণাম এক স্বাভাবিক প্রতিফল ব্যতীত আর কিছুই নয়। এতে নিরাশ হবারও যেমন কোন কারণ নেই, এ পরিণাম রোধ করার পন্থা আবিস্কার করাও তেমনি অসাধ্য নয়। আসল ব্যাপার হলো এই যে, বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় থেকেই আমাদের রাজনীতি হুজুগ প্রধান হয়ে পড়ে। সকল দিকেই কেবল ভাংগ-ভাংগ রব উঠতেই থাকে। কিন্তু ভেংগে গড়ার কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করায় আমরা এখনও অভ্যস্ত হইনি। বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতিবাচক কর্মপন্থাই এর জন্য প্রাধানত দায়ী।

www.icsbook.info

গদী দখল করলে সেবা করব বলে যেসব রাজনৈতিক দল ওয়াদা করে, তারা নিঃস্বার্থ কর্মীদেরকেও ধোঁকা দেয়, জনগণকেও বেওকুফ বানায়। জনগণের খেদমত করাই যে রাজনীতির উদ্দেশ্য তার কর্মসূচীতে 'জনসেবা' এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করা উচিত। কারণ, অভিজ্ঞতা ব্যতীত কোন কাজই মানুষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আর নিঃস্বার্থ জনসেবার ন্যায় কঠিন দায়িত্ব বিনা অভিজ্ঞতায় পালন করার চিন্তা করাও অজ্ঞতার পরিচায়ক। "সাতদিনের মধ্যেই ডাল-ভাতের ব্যবস্থা" করার ওয়াদা এবং "পনর দিনের মধ্যেই খাদ্য সমস্যার সমাধান" করার আশ্বাস যারা দেন তাদের ধূর্ততা, অসাধুতা ও ভন্ডামী যেমন ক্ষমার অযোগ্য তাদের কথায় যারা বিশ্বাস করেন তারাও তেমনই খেদমত পাওয়ার অনুপযুক্ত।

প্রকৃতপক্ষে সংগঠনের কর্মসূচী থেকেই রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। যদি সত্যই কোন দল জাতির, দেশের ও মানুষের খেদমত করার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ রাখে তাহলে কর্মী সংগ্রহ ও নেতৃত্ব গঠনের পর্যায়েই এর সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে। যে দল কর্মীদেরকে দেশের খাদেম হিসেবে গড়ে তুলবার কার্যসূচী গ্রহণ করেনি সে দল ক্ষমতা দখল করলে নিজেদের সেবা ব্যতীত আর সকলের উপরই জুলুম করবে।

কর্মীদের জন্য জনসেবামূলক কর্মসূচী থাকলে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে যে অভিজ্ঞতা লাভ হবে, ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৃহৎ আকারে ঐ অভিজ্ঞতা বাস্তবে কাজে লাগবে। যে দল রাজনৈতিক কর্মী বাহিনীকে জনগণের সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে সে দল ক্ষমতায় গেলে জনগণ অবশ্যই তাদের নিকট সত্যিকার সেবাই পাবে।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

চরিত্রবান লোকদের শাসন

দেশের শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা চরিত্রবান না হলে জনগণের চরিত্রের উন্নতি অসম্ভব। ক্ষমতাসীনরা যে মানের চরিত্রের অধিকারী হয় সে মানই দেশে প্রচলিত হয়।

তাই রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের আন্দোলন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংগঠনে যদি চরিত্র সৃষ্টির কর্মসূচী থাকে তবেই কেবল চরিত্রবান লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা আনবার সম্ভাবনা থাকে।

এদেশে অতীতে যারা ক্ষমতায় ছিলেন এবং এখনও যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের চরিত্রের মান জনগণের নিকট উন্নত বলে কতটুকু স্বীকৃত তা যে কোন সাধারণ লোকের মতামত নিলেই সহজে বুঝা যায়।

www.icsbook.info

আমরা যদি দুনিয়ায় উন্নত জাতি হিসেবে দাঁড়াতে চাই তাহলে যেসব রাজনৈতিক দলে ব্যক্তিচরিত্র উন্নত করার কর্মসূচী রয়েছে তাদের সাফল্যের উপরই নির্ভর করতে হবে। যে কোন প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে যারা রাজনৈতিক দল গঠন করেন তাদের হাতে চরিত্র বিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং চরিত্রের অভাব দূর করতে হলে চরিত্রবান নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনীর হাতেই ক্ষমতা তুলে দিতে হবে।

(আমার দেশ বাংলাদেশ)

www.icsbook.info

গণতন্ত্র ও ইসলাম

বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবনে রাজনীতির স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা আজ নানা কারণে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ পরাধীনতার পরিণামে ধার্মিকদের মধ্যেও আজ এমন লোক সৃষ্টি হয়েছেন যারা দ্বীনদার ও পরহেজগার বলে সমাজে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও 'রাজনীতি' করাকে নিন্দনীয় মনে করেন, অথবা অন্ততঃপক্ষে অপছন্দ করেন। তাঁরা দেশের রাজনীতি থেকে পরহেজ করাকে (নিজেদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখাকে) দ্বীনদারী ও তাকওয়ার জন্য জরুরী মনে করেন। আবার আর এক শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন দর্শনের অনুসারী হওয়ার ফলে ইসলামকেও খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় এক অনুষ্ঠান সর্বস্ব পূজা পার্বন বিশিষ্ট ধর্মমত বলে মনে করেন। তাঁদের ঈমান মোতাবেক ধর্ম ও রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক। খৃষ্ট ধর্মযাজকদের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধকদের আড়াই শত বছরের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ইউরোপ ধর্মনিরপেক্ষবাদকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করে। ইউরোপের পদানত থাকা অবস্থায় প্রায় সকল মুসলিম দেশেই সে মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকা অবস্থায় যেসব মুসলিম পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও জীবন দর্শনের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন প্রধানত তারাই আজ স্বাধীন মুসলিম দেশগুলোর পরিচালক। ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে যে ক'টি ইসলামী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে এর প্রত্যেকটিই ধর্মনিরপেক্ষবাদী শাসক গোষ্ঠীর গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছে। তারা ইসলামকে খৃষ্ট ধর্মের মতই শুধু ব্যক্তিগত জীবনে পালনযোগ্য একটি ধর্মে পরিণত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং রাজনীতির বিশাল ক্ষেত্রটিকে ধর্মের আওতা থেকে পৃথক করার পরিকল্পনায় মেতেছেন।

এভাবে কতক ধার্মিক রাসূলের সংগ্রামী জীবনের দিকে লক্ষ্য না করে তাঁকে এমন ভাবে চিত্রিত করেন যেন আল্লাহর নবী সংসারত্যাগী কোন বৈরাগী ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ)। ওদিকে মুসলিম নামধারী শাসকেরাও রাসূলকে শুধু ধর্মীয় নেতা হিসেবেই স্বীকার (গ্রহণ নয়) করতে

www.icsbook.info

প্রস্তুত। মহানবীর সামগ্রিক জীবনকে একক ও পূর্ণাংগ সত্তা হিসেবে গ্রহণ না করার মনোভাবটি উদ্দেশ্যমূলক হলেও সরল মুসলমান এদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে।

বিশেষ করে ধর্মীয় ও সমাজ সেবামূলক বহু প্রতিষ্ঠান রাজনীতি থেকে দূরে থেকে ইসলামের নামে আন্তরিকতার সাথে খেদমত করেছেন বলে উপরোক্ত স্বার্থপর লোকেরা ইসলামকে নিয়ে রাজনীতি না করার পক্ষে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের নজীর পেশ করেন। তাদের মতে দুনিয়ার সব মত ও পথ নিয়ে রাজনীতি করা জায়েজ হলেও ইসলামী আদর্শকে নিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই অন্যায়। এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে 'বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি' ছিল কি না এবং ইসলামে রাজনীতি জরুরী কি না তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ ঃ সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তাদেরকে সংশোধন করা, তাদের কার্যাবলীর সমালোচনা করা, সরকারী নীতির ভ্রান্তি প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করা এবং এ জাতীয় যাবতীয় কাজকেই রাজনৈতিক কার্যাবলী হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই হলো সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কার্য, ভ্রান্ত নীতি ও আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে দেখে সরকারী কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করে সঠিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করাই প্রধান রাজনৈতিক কার্যকলাপ।

বিশ্ব নবীর দায়িত্ব ঃ এখন দেখা যাক, আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যে বিরাট দায়িত্বসহ পাঠিয়েছিলেন তা পালন করতে গিয়ে তাঁকে রাজনৈতিক কাজ করতে হয়েছিল কি না। যদি তিনি নবী হিসেবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায় তা হলে রাজনীতি করা ইসলামের তাগিদই মনে করতে হবে। নবী বলে ঘোষিত হবার পর থেকে তাঁর গোটা জীবনই যদি আমাদের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয় তা হলে তাঁর রাজনৈতিক কাজগুলো অনুসরণের অযোগ্য হবার কি কারণ থাকতে পারে? হযরতের উপর কি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি কিভাবে তা পালন করেছিলেন তা আলোচনা করলেই বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি কতটা ছিল সে কথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে।

আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে কোন্ কর্তব্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, কুরআন মজীদের বহুস্থানে বিভিন্নভাবে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

www.icsbook.info

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ط الفتح - ٢٨

"তিনিই ঐ সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব দ্বীনের উপর এক (দ্বীনে হককে) বিজয়ী করে তুলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।"

এ আয়াতের শেষ অংশটুকু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে প্রধানত কোন কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন সে সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশী কারো পক্ষে জানবার উপায় নেই। সুতরাং সে বিষয়ে অন্য কারো সাক্ষ্যই গ্রাহ্য নয়—আল্লাহর সাক্ষ্যই সেখানে যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে কোন একটি দিক বা বিভাগকে নিজেদের রুচিমত প্রধান দিক বলে সাব্যস্ত করতে গিয়ে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। সাত অন্ধের হাতী দেখার ন্যায় কেউ তাঁর বিশাল জীবনের এক অংশ থেকে শুধু হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন দিকটিকেই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। কেউ তাঁর নামায-রোযা, তাসবীহ তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদের দিকটাই প্রধান বলে গ্রহণ করেছেন। কেউ তাঁকে একজন 'আরব জাতীয়তাবাদী' নেতা হিসেবেই দেখেছেন। আর কেউবা শুধু সর্বহারাদের নেতা হিসেবে চিত্রিত করে নিজ নিজ মত ও পথের সমর্থনে রাসূলকে দলীল হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

এ জাতীয় সবাই রাসূলের গোটা জীবনধারাকে এক সাথে বিবেচনা করে রাসূলের জীবনের মূল লক্ষ্যটুকুকে বুঝতে সক্ষম হননি। তাঁরা অন্ধের মতোই হাতড়িয়ে যেটুকু দেখতে পেয়েছেন সেটুকুই রাসূলের গোটা জীবন বলে ধারণা করেছেন। এদের অনেকেই হয়ত সাত অন্ধের ন্যায় আন্তরিকতার সাথেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং রাসূলকে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন তার সাথে এঁদের ধারণার কোন মিল নেই।

হেরাগুহায় হযরতের ধ্যানমগ্ন থাকা, নামায-রোযায় মশগুল হওয়া, শেষ রাতে তাহাজ্জুদে নিমগ্ন হওয়া এবং সর্বহারাদের দুর্গতি দূর করার চেষ্টা চালান—এসবই তাঁর জীবনে লক্ষ্য করা যায় সত্য। এগুলো তার কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনা হলেও এর কোনটাই বিচ্ছিন্ন নয়। এসবই হযরতের জীবনের মূল দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর মূল লক্ষ্যে পৌঁছার উপযোগী। কিন্তু ঐ সব কাজের কোনটাই রাসূলকে পাঠাবার প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

www.icsbook.info

রাসূলের প্রধান দায়িত্ব ঃ পূর্বোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তার রাসূলকে পাঠাবার যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন সেটাই নবী জীবনের প্রধান দায়িত্ব। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলকে একমাত্র দ্বীনে হক দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং মানব রচিত যাবতীয় দ্বীনের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে দেবার উদ্দেশ্যে তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রাসূলকে শুধু একজন প্রচারক অথবা ধর্ম নেতার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। দ্বীন ইসলাম রূপ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানটিকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই হযরতের প্রধান দায়িত্ব ছিল। দ্বীন ইসলামকে মানব সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করাই নবী জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি যখন যা করেছেন একমাত্র সে লক্ষ্যে পৌছার জন্যেই করেছেন এবং সে চরম লক্ষ্যে পৌছাবার উদ্দেশ্যেই একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

রাসূলের বিপ্লবী আন্দোলন ঃ মানব সমাজে কোন না কোন ব্যবস্থা কায়েম থাকেই। সামাজিক রীতি-নীতি আইন, শাসন, বিচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রথা ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত থাকে। যে সমাজ ব্যবস্থা পূর্বে থেকেই প্রতিষ্ঠিত থাকে তা যেমন আপনিই কায়েম থাকে না তেমনি তা আপনা আপনিই উৎখাত হয় না। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখে। যখন কেউ এ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার আওয়াজ তোলে তখনই সর্ব শ্রেণীর নেতৃত্ব এক জোট হয়ে এর বিরোধিতা করে। কারণ এসব নেতৃত্বের স্বার্থ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায়ই কায়েম থাকা সম্ভব। এগুলোই প্রচলিত সমাজের কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য যখনই কোন প্রচেষ্টা চলে তখনই কায়েমী নেতৃত্বের সাথে সংঘর্ষ বাধে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, আইন ও শাসন এবং অর্থনৈতিক কাঠামো মিলে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে নতুন ধরনের নীতি ও আদর্শে সমাজকে গঠন করার আওয়াজ উঠবার সংগে সংগেই কায়েমী নেতৃত্ব চঞ্চল হয়ে উঠে এবং এ আওয়াজকে বন্ধ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। সমাজে এ ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করাকে বিপ্লব বলে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত সরকারের উত্থান পতন বা দল বিশেষের নাটকীয় ক্ষমতা দখলকে বিপ্লব নাম দিলেও তাকে প্রকৃত বিপ্লব বলা চলে না। গোটা সমাজে মৌলিক ও ব্যাপক পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলে। এ ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য যে আন্দোলন প্রয়োজন তারই নাম বিপ্লবী আন্দোলন।

www.icsbook.info

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরব ভূমিতে যে ব্যাপক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন তা হঠাৎ সংঘটিত হয়নি। আরবের প্রচলিত সমাজকে সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলকে কালেমায়ে তাইয়্যেবার ভিত্তিতে এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করতে হয় এবং দীর্ঘ ২৩ বছরের অবিরাম চেষ্টায় সে বিপ্লব সফল হয়।

দুনিয়ার ইতিহাসে এরূপ কোন নযীর পাওয়া যায় না যে, কায়েমী নেতৃত্ব কোন বিপ্লবী আওয়াজ শুনেই নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়বার জন্য খুশী হয়ে নেতৃত্বের আসন ত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়েছে। বরং সব সমাজে সবকালেই দেখা গিয়েছে যে, কায়েমী নেতৃত্বের অধিকারীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকারই চেষ্টা করেছে এবং বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করে তাদেরকে উৎখাত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলবার যে দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, তা পালন করার প্রথম পদক্ষেপেই মক্কার নেতৃত্ব অস্থির হয়ে উঠলো। পয়লা পয়লা লোভ দেখিয়ে তাঁকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলো। কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপ্লবী দাওয়াত থেকেই সমাজের কায়েমী স্বার্থের অধিকারীরা বুঝতে পারলো যে, এ আওয়াজ তাদের বিরুদ্ধেই স্পষ্ট বিদ্রোহ। নেতৃত্বের লোভ, অর্থ-সম্পদ ও নারীর লালসা ইত্যাদির (যা তাদের জীবনের চরম লক্ষ্য) বিনিময় তারা হযরতকে এ পথ থেকে ফিরাবার চেষ্টা করলো। হযরত সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলে তাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকেও মেনে নিতে বাধ্য হতেন।

কিন্তু আদর্শভিত্তিক আন্দোলন যারা করেন তাদের পক্ষে এ ধরনের প্রস্তাবে রাজী হওয়া সম্ভবই নয়। তাই এ ধরনের আন্দোলনের সাথে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের সংঘর্ষ অনিবার্য। দীর্ঘ ও কাঠোর সংগ্রামের পর নবী করীম (সাঃ) বিজয়ী হন এবং ইসলামী আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনীতি ঃ অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নবী যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাই হলো আদর্শ ইসলামী আন্দোলন। এ ধরনের আন্দোলন রাজনৈতিক কার্যকলাপ ব্যতীত কি করে সম্ভব হতে পারে ? সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আদর্শবাদী আন্দোলনের ইতিহাস যারা কিছুটা চর্চা করেন এবং মানব সমাজের সমস্যা নিয়ে যারা একটু চিন্তা-ভাবনা করেন তাদের পক্ষে একথা বুঝা অত্যন্ত সহজ। যারা স্থূল

www.icsbook.info

দৃষ্টিতে ইসলামকে দেখেন তারা এটাকে একটা ধর্ম মাত্র মনে করে রাজনীতিকে ইসলাম থেকে আলাদা করতে চান। তারা হয় আন্দোলনের অর্থই বুঝেন না, আর না হয় আন্দোলনের সংগ্রামী পথে চলার সাহস রাখেন না। ইসলামকে একটা জীবন বিধান হিসেবে বুঝেও যারা রাজনীতি করা পছন্দ করেন না, তারা নিশ্চয়ই পার্থিব কোন স্বার্থের খাতিরে অথবা কায়েমী নেতৃত্বের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এরূপ নিষ্ক্রীয় পন্থা অবলম্বন করেন।

নবী করীম (সাঃ) যে আন্দোলন চালিয়েছেন তাতে প্রকৃতপক্ষে চরম রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপরিহার্য ছিল। দেশের নেতৃত্ব যদি অনৈসলামীক লোকদের হাতে থাকে তা হলে ইসলাম একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেতে পারে না। তাই ইসলামী আদর্শের বিজয় মানেই নেতেত্বের পরিবর্তন এবং নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রচেষ্টাই চরম রাজনীতি। রাজনীতি করাকে যারা দ্বীনদারীর খেলাফ মনে করেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ চরম রাজনীতিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ? যারা এ নীতি অবলম্বন করেন তারা কি নিজেদেরকে রাসূলের চেয়েও দ্বীনদার বলে মনে করেন ? তা নিশ্চয়ই তাঁরা করেন না। প্রকৃতপক্ষে তারা রাজনীতির অর্থই বুঝেন না এবং দ্বীনের দাবী সম্পর্কেও পূর্ণ চেতনা রাখেন না।

রাসূলের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য ঃ আজকাল রাজনীতি করাকে যে কারণে নেক লোকেরা ঘৃণা করেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অনুকরণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে রাজনীতির প্রচলন হয়েছে তা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই পছন্দ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষমতা দখলের জঘন্য কোন্দলই এক শ্রেণীর লোকের নিকট রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ টাকার জোরে, কেউ ভোটের বলে, আর কেউ অস্ত্রের দাপটে ক্ষমতা দখল করতে সর্বপ্রকার অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করে থাকেন। এসব লোকেরা জঘন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে গদী দখল করার পর তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার অধিকারটুকুও হরণ করে থাকে। নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে জাতিগঠনের প্রচেষ্টাকেও এরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে দমন করতে চান।

শেষ নবীর ইসলামী আন্দোলনকেও এ মনোভাব নিয়েই দমন করার চেষ্টা চলেছিল। শুধু শেষ নবীই নয়, হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীর আন্দোলনের সাথেও একই ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা নবীদের আন্দোলনের পরিণতি যে নেতৃত্বের পরিবর্তন সে কথা ক্ষমতাসীনদের বুঝতে বাকী ছিল না।

www.icsbook.info

কিন্তু নবীদের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁদের চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি। বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করার পূর্বে নবীদের নিষ্কলংক দীর্ঘ জীবন যে নিঃস্বার্থতার পরিচয় বহন করে তা ইসলাম ব্যতীত আর কোন আদর্শবাদী আন্দোলনে সমপরিমাণে পাওয়া যায় না। সমাজে এ নৈতিক প্রতিষ্ঠাই তাঁদের আন্দোলনের প্রধান মূলধন। শেষ নবীর রাজনীতিতে এ নিঃস্বার্থতা ও নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য সমুজ্জল ছিল। এ জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে কোন সস্তা শ্লোগান কার্যকরী হয়নি। তাঁর নিঃস্বার্থ চরিত্রের প্রভাবকে শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

হযরতের রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো উপায় উপকরণের পবিত্রতা। তিনি কোন অন্যায় ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। তাঁর রাজনৈতিক দুষমনদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশও পোষণ করতেন না। কঠিন রাজনৈতিক শত্রুও যদি ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি হতো তা হলে তিনি পূর্বের সব দোষ মাফ করে দিতেন।

তাঁর রাজনীতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো উদ্দেশ্যের পবিত্রতা। ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য ছিল। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা যদি তাঁর উদ্দেশ্য হতো তা হলে আন্দোলনের শুরুতেই তিনি মক্কার নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব মেনে নিয়ে বাদশাহ হতে পারতেন।

চারিত্রিক পবিত্রতা, উপায় ও পন্থার পবিত্রতা এবং উদ্দেশ্যের পবিত্রতা—এ তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রাসূলের রাজনীতিকে স্বার্থপর ও দুনিয়াদারদের রাজনীতি থেকে পৃথক মর্যাদা দান করেছে। যদি কেউ ইসলামী রাজনীতি করতে চায় তাহলে তাকে মহানবীর এ তিনটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। যাদের চরিত্র, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য অপবিত্র বলে বুঝে যায় তারাও যদি ইসলামের নামে রাজনীতি করে তাহলে ইসলামের উপকারের চাইতে অপকারই বেশী হয়। এদের রাজনীতি অন্যান্য স্বার্থবাদী রাজনীতির চেয়েও জঘন্য।

কায়েমী নেতৃত্ব পরিবর্তনে রাসূলের কর্মপন্থা ঃ কোন নবীই প্রচলিত নেতা বা শাসকদের নিকট নেতৃত্বের গদী দাবী করেননি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) নমরুদের নিকট, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের নিকট এবং শেষ নবী মক্কা এ অন্যান্য স্থানের নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াতই পেশ করেছেন, তাদেরকে গদী পরিত্যাগ করার আহবান জানাননি। তবুও প্রত্যেক রাসূলের সংগেই কায়েমী নেতৃত্বের সংঘর্ষ বেধেছে। সমাজের সর্ব

www.icsbook.info

শ্রেণীর শোষকই রাসূলগণকে সকল দিক দিয়েই আদর্শস্থানীয় বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও ইসলামের আহবান জানানোর পর সকল কায়েমী স্বার্থই যুক্ত ফ্রন্ট করে তাঁদের বিরোধিতা করেছে।

প্রচলিত সমাজের নেতৃবৃন্দ কোন কালেই ইসলামের আহবান গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। কেননা, তাদের পার্থিব যাবতীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। তবু নবীগণ ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম নেতাদের নিকটই পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরায়ে আ'রাফের অষ্টম রুকূ'তে আল্লাহ পাক নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), ছালেহ (আঃ), লূত (আঃ), শোয়াইব (আঃ) ও মূসা (আঃ)-এর ইসলামী আন্দোলনগুলোর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাসূলই সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিকট দাওয়াত পেশ করতে আদিষ্ট হয়েছেন। সেখানে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজপতিগণ প্রত্যেক রাসূলেরই বিরোধিতা করেছে।

নেতৃবৃন্দের নিকট প্রথম দাওয়াত পেশ করার কারণ ঃ নেতৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিগত কোন আদর্শকে গ্রহণ না করলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে না। এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, কোন আদর্শের বিপরীত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সমাজে সে আদর্শ কায়েম হবে। তাই নবী করীম (সাঃ) পয়লা নেতাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন। নেতাগণ এ দাওয়াত কবুল না করলেও তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছবার ফলে সমাজের অনেক লোকের নিকটই ইসলামের আওয়াজ পৌঁছবার সুযোগ হলো।

ইসলামী আদর্শের উপযোগী নেতৃত্ব ব্যতীত দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অথচ প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব ইসলাম কবুল করতে রাজী নয়। এ অবস্থায় যেসব লোক দ্বীনের দাওয়াত কবুল করতে রাজী হলেন তাদেরকে নিয়েই আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা ব্যতীত রাসূল-ল্লাহর (সাঃ)-এর নিকট আর কোন পথই রইল না।

প্রকৃতপক্ষে আদর্শবাদী নেতৃত্ব কোন কালেই তৈয়ার (Readymade) পাওয়া যায় না। আদর্শের আন্দোলনই নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করে এবং সমাজে যখনি আদর্শভিত্তিক নেতৃত্ব কায়েম হয় ত [illegible]র্শকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়। নেতৃত্বের এ পরিবর্তন হযরতের আন্দোলনের মাদানী স্তরে গিয়ে সম্ভব হলো। অতপর আট বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর আরবের বুকে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। বিশ্ব নবীর এ কার্যক্রম যে সুষ্ঠ রাজনীতির সন্ধান দেয় তা প্রত্যেক আদর্শবাদী বিপ্লবী প্রাণকেই সংগ্রামমুখর করে তুলে। মহানবীর বিপ্লবী জীবনকে অধ্যয়ন করার পর কারো মনে এ ধারণা হওয়া সম্ভব নয় যে, তিনি রাজনীতি করেননি।

www.icsbook.info

শেষ কথা ঃ বিশ্ব নবীর দায়িত্ব পালন করার জন্য রাজনৈতিক কার্যকলাপ যে অপরিহার্য ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত। রাজনীতির চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত না পৌঁছতে পারলে তিনি ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষমই হতেন না। আজ যদি কেউ দ্বীন ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে রাজনীতির পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া তার আর কোন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নেই।

কিন্তু স্বার্থপর, পদলোভী ও দুনিয়া পূজারীদের রাজনীতি ইসলামের জন্য কোন দিক দিয়েই সাহায্যকারী নয়। ইসলামের নামে যারা এককালে পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে নবীর নীতি ও কার্যক্রম অনুসরণ করেননি বলেই পাকিস্তানে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

স্বার্থপর ও গদীভিত্তিক রাজনীতি যেমন ইসলাম বিরোধী, নবীর অবলম্বিত রাজনীতি থেকে পরান্মুখ হওয়াও তেমনি অনৈসলামি। বরং রাসূলগণ যে ধরনের রাজনীতি করেছেন তা মুসলমানদের জন্য প্রধানতম ফরয। এ ফরযটির নাম হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ মানেই ইসলামী আন্দোলন এবং রাজনীতিই এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। সুতরাং কতক লোক পরহেজগারীর দোহাই দিয়ে রাজনীতি করা অপছন্দ করলেও রাসূলের খাঁটি অনুসারীদের পক্ষে তা পছন্দ না করে কোন উপায়ই নেই।

বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের খেদমতে আরয করতে চাই যে, রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব কি করে পালন করা সম্ভব ? যারা ধার্মিক নয় তারা তো রাজনীতিতে ধর্মকে দখল দিতেই চায় না। তাদের বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু ওলামাগণ যদি রাজনীতি না করেন তাহলে ধর্মনিরপেক্ষদের মতেরই সমর্থন হয়ে যাবে। তারা এটাই চায় যে, নেক লোকেরা যেন রাজনৈতিক ময়দানে না আসে এবং এ ময়দান যেন তাদেরই দখলে থাকে।

দ্বীনদার লোকেরা যদি রাজনৈতিক ময়দানে কাজ না করেন তাহলে তাদের এ আচরণ একথাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা ধার্মিক হওয়ার কারণে রাজনীতি করা পছন্দ করেন না। এ মনোভাব যারা পোষণ করে তাদেরকে রাজনীতি নিরপেক্ষ ধার্মিক বলা যায়। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যেমন ইসলাম নয়, তেমনি রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্মও ইসলাম নয়। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ এ দু'টোরই বিরোধী। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

www.icsbook.info

গণতন্ত্র ও ইসলাম

গণতন্ত্র বিশ্বজনীন একটি রাজনৈতিক পরিভাষা। জনগণের অবাধ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনের পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলা হয়। নীতিগত ভাবে এ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করে। সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন থাকুক এটা প্রত্যেক সরকারেরই ঐকান্তিক কামনা। তাই সামরিক একনায়করাও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত বলে স্বীকৃত হবার উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। এমনকি যে সমাজতন্ত্র মতবাদ হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতির প্রবর্তক তারাও গণতন্ত্রের দোহাই দিতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শের জনপ্রিয়তা এবং সার্বজনীনতাই এর আসল কারণ। অবশ্য সমাজতন্ত্রীরা গণতন্ত্র থেকে নিজেদের মতাদর্শকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে 'জনগণতন্ত্র' নামে অদ্ভুত এক পরিভাষাও ব্যবহার করে। অথচ 'জন' ও 'গণ' একই অর্থের দু'টো শব্দ।

গণতন্ত্রের মূলনীতি ঃ গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো পাঁচটি ঃ

১। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন যারা পায় তাদেরই সরকারী ক্ষমতা হাতে নেবার অধিকার রয়েছে।

২। এ নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে এর বাস্তব ব্যবস্থা হওয়া অপরিহার্য। নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারে। বিরোধী দলও এমন সরকারের বৈধতা ও নৈতিক অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

৩। সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্য জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন ও শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ।

৪। জনগণের মতামত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৫। সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বিবেচিত হবে।

ইসলামের গণতন্ত্র ঃ ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের উপরোক্ত পাঁচটি মূলনীতির কোন বিরোধ নেই। জনগণের উপর শাসক

www.icsbook.info

হিসেবে চেপে বসার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। রাসূল (সাঃ)-এর পর যে চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশিদীন হিসেবে বিখ্যাত তারা নিজেরা চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের বিরুদ্ধে তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই রকম ছিলো না কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন। তাঁরা কেউ এ পদের জন্য চেষ্টা করেননি। আল্লাহর রাসূলের (সা) ঘোষণা অনুযায়ী পদের আকাংখী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে করতে হবে।

এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাহাবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য নন। কারণ তিনি নিজে চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। অথচ হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (রঃ) সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য বলে বিবেচিত। এর কারণ এটাই যে, রাজ বংশের রীতি অনুযায়ী তাঁর পূর্ববর্তী শাসক তাকে মনোনীত করার পর ঐ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া ইসলাম সম্মত নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জনগণ তারই উপর আস্থা স্থাপন করায় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ইসলামে শাসন ক্ষমতার আকাংখা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব থেকে পালানোরও অনুমতি নেই। এ নীতি গণতন্ত্রের আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও কত উন্নত !

ইসলামে সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাযে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির উপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) দেয়া ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হলো রাসূলের প্রতিনিধি। নামাযের ইমাম যেমন রাসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিদেরকে পালন করতে হয়, তেমনি রাসূল (সাঃ) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য।

এসব দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ও ইসলামে শুধু মিলই নয়, ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অনেক উন্নত ও ত্রুটি মুক্ত।

ইসলাম ও গণতন্ত্রে পার্থক্য ঃ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর আর গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌমশক্তিরই ইচ্ছা ও মতামত। গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইন সভাই সকল ক্ষেত্রে আইন দাতা। আইনের ব্যাপারে

www.icsbook.info

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তাদেরই হাতে। ইসলামে আল্লাহর দেয়া আইন ও বিধানের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেবার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। ইসলাম ও গণতন্ত্রের এ মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ। ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যা, হালাল ও হারাম ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সীমা ঠিক করে দেয়া প্রয়োজন। মানুষ যে কোন ক্রমেই নৈতিকতা ও ইনসাফের সামান্য মানও বজায় রাখতে পারে না তা দুনিয়ায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত।

প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু হওয়া সম্ভব। মানব রচিত আইনের এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না যা পালন করার জন্য মানুষ অন্তর থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরী আইনকে ফাঁকি দিয়ে পুলিশ থেকে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টাকে কেউ বড় দোষ মনে করে না। কিন্তু আল্লাহর আইনের বেলায় পুলিশ থেকে বেঁচে গেলেও আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা নেই বলে এর নৈতিক প্রভাব গভীর। এদিক বিবেচনা করলে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সার্থকরূপ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশী সম্ভবনাময়।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

www.icsbook.info

বাংলাদেশের উপযোগী সরকার পদ্ধতি

সরকার পদ্ধতি (পলিটিকেল সিস্টেম)

দেশ শাসন ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার গঠন অপরিহার্য। কোন ছোটখাট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকেও সক্রিয় রাখতে হলে এর জন্য ওয়ার্কিং কমিটি বা কর্ম পরিষদ বা কার্যকরী কমিটি গঠন করতেই হয়। আর রাষ্ট্রের মতো সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কোন সংস্থা না থাকার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাই রাষ্ট্রের উপাদানসমূহের মধ্যে গভর্ণমেন্ট বা সরকার অন্যতম। কোন জনগোষ্ঠীকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনার জন্য সরকার গঠন করা ছাড়া উপায় নেই।

এ সরকারের কাঠামো সব কালে ও সব দেশে এক রকম হয় না। বর্তমান যুগেও বহু দেশে সরকারী ক্ষমতা কোন রাজবংশের হাতে রয়েছে। বাদশাহ বা রাজা ঐ বংশের বাইরে থেকে হতে পারে না। বাদশাহ যে মন্ত্রীসভা গঠন করে তার মধ্যে ঐ বংশের বাইরের এমন কিছু লোকও অবশ্য থাকে যাদের উপর বাদশাহ আস্থা স্থাপন করতে পারেন। এ ধরনের সরকারকে রাজতন্ত্র বা মনার্কী (Monorchy) বলা হয়। এসব দেশে নামে-মাত্র নির্বাচিত পার্লামেন্ট থাকলেও আসল ক্ষমতা বাদশাহ ও তার বংশের হাতেই কুক্ষীগত থাকে।

কোন দেশে সশস্ত্র বাহিনী সরকারী ক্ষমতা দখল করে দেশ শাসন করলে তা স্বৈরতন্ত্র, একনায়কত্ব বা ডিকটেটরশীপ (Dictatorship) নামে পরিচিত হয়।

আর যেসব দেশে জনগণের ভোটে নির্বাচিত লোকেরা দেশ শাসন করে সে সরকার পদ্ধতিকেই গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্রে সরকারী ক্ষমতা কোন বংশ, এলাকা বা শ্রেণীর লোকদের হাতে কুক্ষিগত হতে পারে না। জনগণ যাদেরকেই নির্বাচিত করে তারাই সরকার গঠন করে। পরবর্তী নির্বাচনের ফলে আবার আর এক দলের হাতে ক্ষমতা চলে যেতে পারে। গণতন্ত্রে আসল রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে।

দুনিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। যে দেশে রাজতন্ত্র আছে সেখানেও জনগণ গণতন্ত্র চায়। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসে কোথাও গণতন্ত্র কোন দান-খয়রাতের মাধ্যমে কায়েম হয়নি। যে ইংল্যান্ড বর্তমানে আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রসংশিত সেখানেও জনগণ কয়েক শ বছর সংগ্রাম

www.icsbook.info

করার পর সফল হয়েছে। আধুনিক যুগে গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনের এত দীর্ঘ সময় না লাগলেও বিনা সংগ্রামে কোন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হতে পারে না।

('৯৩ সালে কারাগারে রচিত)

গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি

গণতান্ত্রিক বিশ্বে প্রধানত দু' ধরনের সরকার পদ্ধতি চালু রয়েছে। একটার নাম পার্লামেন্টারী সিষ্টেম বা সংসদীয় পদ্ধতি। অপরটি প্রেসিডেন্টসিয়েল সিষ্টেম বা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি।

পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

১। জনগণের ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট বা সংসদই সরকারী ক্ষমতার অধিকারী। রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্ব সংসদের হাতে ন্যস্ত। সংসদের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই।

২। সংসদ সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন যে দল ভোগ করে সে দলের হাতেই সরকারী ক্ষমতা থাকে। প্রধান মন্ত্রী তার মন্ত্রী পরিষদ এ দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই নিয়োগ করে থাকেন। সংসদে কোন একটি দলের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে একাধিক দলের সমন্বয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে পারে।

৩। মন্ত্রী-পরিষদ সংসদের নিকট জওয়াবদিহি করতে বাধ্য। জন প্রতিনিধিগণ সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রশ্ন বা অভিযোগ করতে পারে।

৪। প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান হিসেবে গণ্য। সরকারের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব তার।

৫। রাষ্ট্রপ্রধান নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি মাত্র। দেশের শাসনক্ষমতা তার হাতে থাকে না। শাসনতন্ত্র যে কয়টি দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে এর অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার তার নেই। শাসনতন্ত্রে উল্লেখ থাকলে তিনি সরকারকে পরামর্শ দিতে পারেন।

প্রেসিডেন্সিয়েল সিষ্টেম বা রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

১। প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। তিনিই দেশের প্রধান শাসনকর্তা।

www.icsbook.info

২। প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।

৩। জনগণের নির্বাচিত সংসদ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার অংশীদার।

৪। শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার এমন ভারসাম্য থাকবে যাতে প্রেসিডেন্ট বা সংসদ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী না হয়।

৫। প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভার সদস্যদের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া জরুরী নয়। *('৯৩ সালে কারাগারে রচিত)*

দু'পদ্ধতির পার্থক্য

পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতি দু'টোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য ঃ

১। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এক ব্যক্তি নয়। অপরটিতে একই ব্যক্তি দু'টো মর্যাদা ভোগ করেন। প্রথমটিতে প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান। দ্বিতীয়টিতে কোন প্রধানমন্ত্রী নেই। প্রেসিডেন্টই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অধিকারী।

২। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে পার্লামেন্ট বা সংসদই দেশ শাসন করে এবং সংসদের পক্ষ থেকে মন্ত্রীসভা প্রশাসনের নেতৃত্ব দেয়। অপরটিতে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রীসভা দেশ শাসন করে এবং পার্লামেন্ট শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় অংশীদার হয় ও প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধানের কোন শাসন ক্ষমতা নেই। রাষ্ট্রপ্রধান সম্পূর্ণ দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। সরকার গঠন, সরকার পরিবর্তন, আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন ইত্যাদির ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব তিনি পালন করেন এবং শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের ভূমিকাও পালন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান অবশ্যই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতীক হিসেবে গণ্য। যখন সরকার ভাংগে ও গড়ে তখনও রাষ্ট্রপ্রধান স্বপদে বহাল থাকেন।

('৯৩ সালে কারাগারে রচিত)

গণতান্ত্রিক বিশ্বের সরকার পদ্ধতি

যতগুলো দেশে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম আছে এর মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (United Stats of America-USA) ছাড়া আর কোথাও প্রেসিডেন্সিয়েল সিষ্টেম চালু হয়নি। প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে পার্লামেন্টারী সিষ্টেম প্রচলিত আছে। অবশ্য ফ্রান্স ও জার্মানী এ দু'টো পদ্ধতির

www.icsbook.info

কোনটাকেই হুবহু নকল করেনি। তবু বলা চলে যে, পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সাথেই এ দু' দেশের বেশী মিল রয়েছে।

পলিটিকেল সিষ্টেম হিসেবে আমেরিকার পদ্ধতি পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও আর কোন দেশেই তা হুবহু গ্রহণ করা হয়নি। সে দেশে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান হওয়া সত্ত্বেও শাসন ক্ষমতায় সিনেটের অংশীদারিত্ব এবং শক্তিশালী কমিটি সিষ্টেমের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদের ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকায় গণতান্ত্রিক নীতিমালা সেখানে বহাল রয়েছে।

আমেরিকার পদ্ধতি গণতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও তা আর কোন দেশে চালু না হওয়ার কারণ দু'টো ঃ

১। যুক্তরাজ্য বর্তমানে একটি রাষ্ট্র বটে, কিন্তু এক সময় তা ছিল না। দু'শ বছর আগে ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র মিলে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে গিয়ে তাদেরকে অনেক নতুন নিয়ম-পদ্ধতির পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাতে হয়। রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সে দেশে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা অন্যত্র অনুপস্থিত। তাই প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতি আমেরিকার জন্য যতই উপযোগী হোক অন্য কোন দেশ তা নিজের জন্য উপযোগী মনে করেনি।

২। বিশেষ করে সেখানে শাসন বিভাগ (Executive) ও আইন বিভাগেরই (Legislature) মধ্যে একদিকে সাংগঠনিক পার্থক্য, আর একদিকে ক্ষমতার অংশিদারিত্ব এমন নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যতা (Check and Balance) কায়েম করেছে যা রীতিমতো জটিল। এ জটিল পদ্ধতির নকল করার ঝামেলা আর কোন দেশ পোয়াতে চায়নি।

বৃটিশ পদ্ধতিকে সহজবোধ্য ও অনুকরণের অধিকতর যোগ্য বিবেচনা করেই হয়তো প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে তা চালু করা হয়েছে। তা ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো স্বাধীন হবার পূর্ব থেকেই এ পদ্ধতির সাথে পরিচিত বলে সেসব দেশে এর গ্রহণযোগ্যতাও বেশী।

('৯৩ সালে কারাগারে রচিত)

সরকার পদ্ধতি নিয়ে বির্তক

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের ক্ষমতা একই ব্যক্তির দখলে রয়েছে। এসব দেশের কোনটাতেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নেই। এর অনেক কয়টিতে নির্বাচিত সংসদও আছে। কিন্তু শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতেই কুক্ষিগত। এসব দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করলে ও সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবী তুললে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে চালাকী

www.icsbook.info

করে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির গণতন্ত্র চালু রয়েছে এবং এটা অগণতান্ত্রিক নয়। অথচ বাস্তবে চরম স্বৈরাচারী ব্যবস্থাই চালু রয়েছে।

জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য এসব দেশের ডিক্টেটররা (স্বৈরশাসক) আমেরিকার দোহাই দিয়ে দাবী করে যে, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এক হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকার গণতন্ত্র স্বীকৃত হলে অন্য দেশে কেন হবে না ? সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের গোলামী থেকে স্বাধীন হবার পর তাদের সরকার পদ্ধতি নকল করার প্রয়োজন কী ? এ জাতীয় কুযুক্তি দেখিয়ে স্বৈরশাসকরা শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখার অপচেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসনামলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এ বিতর্কের সম্মুখীনই হয়েছিল। আমেরিকার জটিল গণতন্ত্র সম্পর্কে খুব কম লোকই অবহিত বলে এ জাতীয় প্রতারণার আশ্রয় নেয়া সম্ভব হচ্ছে। জেনারেল আইয়ুব খানও এ বিষয়ে একই ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আমেরিকার পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রতারণামূলক দাবীই করেছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও যেসব কারণে সেখানে গণতন্ত্র বহাল রয়েছে সেসব অনুসরণ না করে শুধু পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হওয়াকেই আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নাম দিয়েছিলেন।

আইয়ুব খান, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, সরকার দলীয় প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনী প্রধান একই ব্যক্তি থাকায় প্রকৃতপক্ষে এর কোনটাই গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। শেখ মুজিবের এক দলীয় বাকশাল শাসনের বদলে জেনারেল জিয়া বহু দলীয় ব্যবস্থা চালু করে ছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষমতা তখনও এক ব্যক্তির হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল বলে তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা চলে না। *('৯৩ সালে কারাগারে রচিত)*

গণতান্ত্রিক সরকার

সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, আমাদের দেশের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি মোটেই উপযোগী নয় এবং তা অনুকরণ করা এদেশে সম্ভবও নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বৃটেনের পার্লামেন্টারী পদ্ধতি কি হুবহু নকল করা সম্ভব ? ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান বৃটিশ ক্রাউন। জাপান ও মালয়েশিয়ায় কিং বা রাজা থাকায় তারা বৃটিশ সিষ্টেম মোটামুটি হুবহু নকল করতে পেরেছে। কিন্তু তারাও রাজনৈতিক দলের সংখ্যার দিক দিয়ে ইংল্যান্ডকে অনুকরণ করতে

www.icsbook.info

পারেনি। ইংল্যান্ডে প্রধান দু'টো রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা অদল-বদল করে ক্ষমতায় আসে। এতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যতা বহাল থাকে। এমনটা আর কোন পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে এখনও সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে জাতীয় সংসদের সকল দল সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান পদের জন্য কোন কিং তো জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তাহলে বৃটিশ পদ্ধতি হুবহু নকল করার কোন উপায় নেই। আরও বহু দেশে কিং ছাড়াই সংসদীয় সরকার কায়েম আছে।

এ দ্বারা একথাই প্রমাণ হয় যে, যে কোন দেশের সরকার পদ্ধতি শতকরা একশ ভাগই আর একটি দেশে নকল করা সম্ভব নয়। আসলে এর কোন প্রয়োজনও নেই। সব গাছ যেমন সব দেশে হয় না, সব ফলও যেমন সব মাটিতে ভাল ফলে না তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিও সবদেশে হুবহু একই ধরনের হতে পারে না। প্রত্যেক দেশের মানুষের মন-মানসিকতা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, সমাজ কাঠামো মিলিয়ে যে পরিবেশ গড়ে উঠে এর সাথে খাপ খায় এমন সরকার পদ্ধতি গড়ে তোলা সে দেশের নেতৃবৃন্দেরই দায়িত্ব।

একই সংসদীয় পদ্ধতির সরকার কায়েম থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে কাঠামোগত কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। আসল বিষয় হলো গণতন্ত্রের দাবী পূরণ হওয়া। যদি সত্যিকার গণতান্ত্রিক নীতি চালু থাকে তাহলে সরকার পদ্ধতিতে বৃটিশ সিষ্টেম থেকে ভিন্নতর কিছু থাকলেও বিশ্বে গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিশ্বজনীন ও চিরন্তন। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ঐ মূল্যবোধকে ভিত্তি করে পলিটিকেল ইনষ্টিটিউশন গড়ে তুলতে গিয়ে বিভিন্ন দেশে সরকারের বাহ্যিক রূপ এক রকম নাও হতে পারে। বাহ্যিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বহাল থাকতে পারে। বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর সরকার কাঠামো ভিন্ন হলেও এসব দেশেই গণতন্ত্র চালু রয়েছে বলে সবাই স্বীকার করে।

যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং যারা সত্যিকারভাবে জনগণের শাসন চান তারা নিম্নরূপ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে একমত ঃ

১। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত নয়। এক ব্যক্তির হাতে উভয় দায়িত্ব থাকলে স্বৈরাচারের আশংকা থাকে।

www.icsbook.info

২। দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সংসদের হাতে থাকতে হবে। অর্থাৎ শাসকগণ বা মন্ত্রীপরিষদ সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।

৩। শাসনতন্ত্রকে সরকারী দলের স্বেচ্ছাচার থেকে রক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে শাসনতন্ত্র বিপন্ন না হয়।

৪। সত্যিকার নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সরকারী দল নির্বাচনে প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ না পায়।

দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয় সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে এ পদ্ধতি তুলে দিতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে না উঠা পর্যন্ত অন্য কোন দেশের নযীর দেখিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। *('৯৩ সালে কারাগারে রচিত)*

পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের রাষ্ট্রপ্রধান

পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের বৈশিষ্ট্য হল যে, সরকার প্রধান থেকে ভিন্ন একব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন। যুক্তরাজ্যই এ সিষ্টেমের জনক। বৃটিশ ক্রাউন বা রাজ সিংহাসনের অধিকারীই সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত। বৃটিশ ক্রাউন ব্যতীত বৃটিশ পলিটিকেল সিষ্টেম চলতে পারে না। সেখানে রাজা বা রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বংশ থেকেই হয়ে থাকে অথচ গণতন্ত্রের পাদপীঠ বলে যুক্তরাজ্য বিশ্বে স্বীকৃত।

পার্লামেন্টারী সিষ্টেমে প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই সরকার প্রধান। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পৃথক এক ব্যক্তি সত্তার হাতে থাকতে হবে। এ সিষ্টেমে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান এক ব্যক্তি হতে পারবে না। ইংল্যান্ডে রাজবংশের যে ব্যক্তি সিংহাসনে থাকবে সেই রাষ্ট্রপ্রধান হবে, সে পুরুষ বা স্ত্রী যেই হোক।

বৃটিশ ক্রাউন সহ যে পার্লামেন্টারী সিষ্টেম তা কি বাংলাদেশে হুবহু চালু করা সম্ভব ? বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণ করা সম্ভব হলেও রাষ্ট্রপ্রধানের বেলায় ভিন্ন ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নেই বলে সবাইকে স্বীকার করতেই হবে।

ভারত সহ যে কয়েকটি দেশে এ সিষ্টেম চালু আছে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান একই নিয়মে নিযুক্ত বা নির্বাচিত হয় না। ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয়। কানাডা ও

www.icsbook.info

অষ্ট্রেলিয়ায় নিজ নিজ সরকারের সুপারিশের ভিত্তিতে বৃটিশ ক্রাউন কর্তৃক নিযুক্ত হয়।

দেখা গেল যে, বৃটিশ সিষ্টেম ঐ ক'টি দেশে অনুসরণ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপ্রধানের বেলায় নিজ দেশের উপযোগী ভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বেলায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সে বিষয়ে একাধিক মত থাকতে পারে। যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করেই কোন একটি পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। কোন মতের পক্ষে যুক্তি প্রর্দশন করেই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পদ্ধতি কি হওয়া উচিত ? পূর্বে স্পষ্টভাবে একথা বলেছি যে, রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব এক ব্যক্তির হাতে থাকা উচিত নয় এবং মন্ত্রীসভা জাতীয় সংসদের নিকটই দায়ী থাকবে। এটা যে পার্লামেন্টারী সিষ্টেমেরই বৈশিষ্ট্য তা সবারই জানা। বাংলাদেশে এসব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পলিটিকেল সিষ্টেমের পক্ষে প্রায় সকল দলই সম্পূর্ণ একমত। মতপার্থক্য দেখা যায় প্রধানত প্রেসিডেন্টের নির্বাচন ও মর্যাদা সম্পর্কে।

শেখ মুজিবের আমলে প্রথম দিকে যখন পার্লামেন্টারী পদ্ধতি চালু ছিল তখন জাতীয় সংসদের সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীই সাক্ষী যে তিনি কত টুকু মর্যাদা পেয়েছিলেন। সম্ভবত বিচারপতি ছিলেন বলেই কতকটা আত্মসম্মানবোধ তাকে মর্যাদাহীন পদটি ত্যাগ করেত বাধ্য করেছিল। এরপর অবশ্য এমন একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান করা হলো যার হয়তো মর্যাদাবোধের কোন বালাই ছিল না বা সরকারের নির্দেশ পালনই তাঁর দায়িত্ব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

গণতন্ত্রের দাবী অনুযায়ী সংসদের হাতেই পূর্ণ শাসনক্ষমতা থাকতে হবে। কিন্তু ক্ষমতা যদি নিরংকুশ হয় তাহলে সীমালংঘনের আশংকা অবশ্যই প্রবল হয়। ফলে ক্ষমতার দাপটে শাসনতন্ত্র ক্ষমতাসীন দলের খেলনায় পরিণত হয়। আইনের শাসনের পরিবর্তে দলের শাসন গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়। শেখ মুজিবের আমলে তাই হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট যদি সরকারী দলের হাতের পুতুল হয় তাহলে এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রেসিডেন্টকে প্রকৃতপক্ষে শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ কাজটি এমন এক ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব যিনি শাসক দলের করুণার পাত্র নন।

www.icsbook.info

যিনি ক্ষমতাসীন দলের নিযুক্ত বা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত ব্যক্তি তিনি সরকারের মরজির বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে কী করে সক্ষম হবেন ?

যারা পার্লামেন্টারী সিষ্টেম চান তারা একথা ভালভাবেই জানেন যে, ইংল্যান্ডের ক্রাউন (রাজা বা রাণী) রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করে থাকেন। বাংলাদেশে আমরা কোন ক্রাউন তৈরী করতে চাই না। কিন্তু ক্রাউনের ঐ দায়িত্বটা পালনের জন্য এমন প্রেসিডেন্ট অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন যিনি ক্ষমতাসীন দলের হুমকি বা দলীয় রাজনৈতিক কোন্দলের শিকার হতে বাধ্য মনে করবেন না। যদি জাতীয় সংসদের সদস্যদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে ঐ হুমকি ও কোন্দল থেকে তিনি কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর দশা যাতে কোন প্রেসিডেন্টের না হয় সে ব্যবস্থাই করা প্রয়োজন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভারতে তো আইন সভার সদস্যদের ভোটেই রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয়। বাংলাদেশে কেন এ পদ্ধতি চলবে না ? যারা এ প্রশ্ন করেন তাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এক দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু থাকলেই তা অন্য দেশের উপযোগী হয়ে যায় না। তা ছাড়া ভারত ফেডারেল রাষ্ট্র হওয়ায় সেখানের অবস্থা বাংলাদেশের মত নয়।

ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা দু'কক্ষ বিশিষ্ট এবং প্রাদেশিক আইনসভা ২৫টি। এসব আইনসভার বিরাট সংখ্যক সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয় বলে প্রেসিডেন্টকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন দলের খেলনায় পরিণত হওয়া সেখানে সহজ নয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে যোগ্য নেতৃত্বে গণতন্ত্র ক্রমেই ভারতে স্থীতিশীলতা অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একবার ডিক্টেটর হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। গণতন্ত্র সেখানে আবার বহাল হয়েছে। দ্বিতীয়বার যখন গণতান্ত্রিক পথেই ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এলেন তখন পূর্বের জনতা সরকারের আমলের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানকে অপসারণের কোন চেষ্টা তিনি করেননি। দীর্ঘদিনে ভারতে যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার ঠিক বিপরীত অবস্থা বাংলাদেশে বিদ্যমান।

বাংলাদেশে ১৯৪৭ সাল থেকেই রাজনীতির যে ধারা চলছে তাতে গণতন্ত্রের বিকাশ হতেই পারেনি। ক্ষমতাসীনরা যেমন বিরোধী দলকে নিরাপত্তা আইন ও সরকারী ক্ষমতার ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করার চেষ্টা করেছেন ঠিক তেমনি এর প্রতিক্রিয়ায় কোন কোন বিরোধী দল হিংসা-বিদ্বেষ ও

www.icsbook.info

গুন্ডামীর হাতিয়ার ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সমালোচনায় এখনো যে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হয় এবং কোন কোন দল যেভাবে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করে তাতে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তো দূরের কথা, এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত কী তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলার সময় আসেনি। এ পরিস্থিতিতে যদি প্রেসিডেন্ট ও সরকারী দলের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা না হয় তাহলে গণতন্ত্রের সম্ভাবনাটুকুও খতম হয়ে যাবে। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব

গণতন্ত্রের প্রয়োজনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে তিনটি দায়িত্ব পালন করতে হবে ঃ

১। প্রেসিডেন্ট যাতে শেখ মুজিবের আমলের মতো প্রধানমন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের খেলনায় পরিণত না হতে পারে সেজন্য প্রেসিডেন্টকে যোগ্যতার সাথে সরকারের বাড়াবাড়ি ও অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। শাসনতন্ত্রের মজবুত অভিভাবকের দায়িত্ব পালনের ভার প্রেসিডেন্টের হাতে থাকাই স্বাভাবিক।

২। কোন কারণে একবার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে বিকল্প সরকার গঠন পর্যন্ত বা বারবার সরকার ভেংগে যাবার দরুন স্থিতিশীল সরকারের অভাবে প্রেসিডেন্টকে শাসনতন্ত্রের সঠিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শাসনতন্ত্র যাবতীয় সরকারী ক্ষমতার উৎস হিসেবে এর সঠিক মর্যাদা বহাল রাখা এসব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব।

৩। নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে সত্যিকার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হলে ক্ষমতাসীন দলসমূহের দলীয় স্বার্থ থেকে প্রেসিডেন্টকে উর্ধে রাখতে হবে। তাকে নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে জনগণ ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জন করতে হবে।

বলা বাহুল্য এসব দায়িত্ব ইংল্যান্ডের বৃটিশ ক্রাউন পালন করে থাকে। বাংলাদেশে এ দায়িত্ব পালনের উপযোগী মর্যাদায় যাকে অধিষ্ঠিত করা হবে তিনি যদি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুগ্রহ ভাজন হন তা হলে এ মহান দায়িত্ব তিনি কখনও পালন করতে পারবেন না।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

জনগণের প্রেসিডেন্ট

দেশের অতীত অবিজ্ঞতা ও বর্তমান পরিস্থিতির দাবী এটাই যে, শাসনতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ও সরকারী ক্ষমতায় বিভিন্ন অংশের মধ্যে

www.icsbook.info

ভারসাম্য বহাল রাখার প্রধান ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রেসিডেন্টকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটেই নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাসীন দল কখনও দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না। প্রেসিডেন্টের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা থাকবে না বলে নিঃস্বার্থভাবে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সাথেও তিনি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবেন।

এমন মর্যাদাসম্পন্ন প্রেসিডেন্ট তিনিই হতে পারবেন যিনি একমাত্র জনগণের নিকট দায়ী হবেন। শুধু ক্ষমতাসীন দলের একক ভোটে তাকে অপসারণ করা চলবে না। প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। বৃটিশ ক্রাউনের সমমর্যাদার অধিকারী প্রেসিডেন্ট একমাত্র এভাবেই যোগাড় করা সম্ভব।

বাংলাদেশে কয়েকবার জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর গণতন্ত্রের স্বার্থেই এ থেকে পিছিয়ে আশা উচিত নয়। যারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনগণকে ভোট দেবার অধিকার দিতে চান না তারা যতই পার্লামেন্টারী পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দিন নির্বাচনে এটাকে কি তারা নির্বাচনী ইস্যু বানাতে সাহস করবেন ? প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জনগণের ভোট প্রয়োজন নেই বলে কি তারা জনগণকে বুঝাতে পারবেন ? সুতরাং পূর্বে জনগণ যখন সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে তখন এ অধিকার তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজী হবে না। এ বিষয়টা গণভোটে দিলে জনগণ কী রায় দেবে তা সবারই জানা।

এ পর্যন্ত একটি যুক্তিই এর বিপক্ষে পাওয়া গেছে। এ গরীব দেশে এ জাতীয় নির্বাচনে সরকারী দল বিপুল অর্থ খরচ করবে এবং বিরোধী দলের প্রার্থী এত খরচ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে একথা সংসদ সদস্যের নির্বাচনের বেলায়ও সত্য। এটা হলো রাজনৈতিক দুর্নীতি। সরকারী ক্ষমতা ও সুযোগ কোন নির্বাচনেই দল বিশেষের কুক্ষিগত থাকা উচিত নয় । এ সমস্যাটা ভিন্ন একটা আপদ। এর সাথে প্রত্যক্ষ ভোটের কোন সম্পর্ক নেই।

জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্টের মতো 'টিটিউলার হেড' বা শাসন ক্ষমতাহীন পদের নির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই যে বিরাট অংক খরচ হবে তাতে যদি কারো আপত্তি থাকে তাহলে তাদের নিকট শাসনতন্ত্রের নিরাপত্তা ও অভিভাবকত্ব তেমন গুরুত্ব পায়নি বলে মনে হয়। একটা দেশের রাজনৈতিক সিষ্টেমকে গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী টিকিয়ে রাখা যদি সরকারী স্থিতিশীলতা ও অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে কৃপণতা দেখান বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। অবশ্য নির্বাচনী ব্যয় কমাবার

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। *(বাংলাদেশের রাজনীতি)*

বাংলাদেশের পলিটিকেল সিষ্টেম

যে কোন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রধানত সে দেশের উপযোগী পলিটিকেল সিষ্টেমের উপর নির্ভর করে। শাসনতন্ত্রে যত ভাল কথাই লেখা থাকুক তার বাস্তব প্রয়োগ দেশের পলিটিকেল সিষ্টেমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সিষ্টেমকে বাংলায় সরকারী অবকাঠামো বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশে কোন স্থিতিশীল সিষ্টেম এখনও গড়ে উঠেনি। ইংরেজ শাসনের অবসানের পর কয়েক দশকেও কোন সিষ্টেম গড়ে না উঠার প্রধান কারণই গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি। একই সময়ের মধ্যে ভারতে একটা সিষ্টেম স্থিতিশীল হয়ে গেল, অথচ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তা সম্ভব হলো না। এর কারণ বিস্তারিত বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। তবে প্রধান কারণ একটাই। শুরু থেকেই দেখা গেছে যে রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যিনিই অবস্থান নেবার সুযোগ পেয়েছেন, তিনি নিজের গদী মজবুত করারই পরিকল্পনা নিয়েছেন। জনগণকে রাষ্ট্র ক্ষমতার উৎস গণ্য করে তাদের প্রতিনিধিদের মরযী অনুযায়ী দেশ শাসনের নীতি গ্রহণ না করার এটাই পরিণতি।

ব্যক্তিভিত্তিক সিষ্টেম ঃ নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, গোলাম মুহাম্মদ, ইসকান্দার মির্যা, আইয়ুব খান, ইয়াহ্ইয়া খান ও শেখ মুজিবের শাসনকালের বিশ্লেষণ করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে তারা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে আস্থাশীল ছিলেন না। তারা নিজস্ব দৃষ্টিভংগীতে মনগড়া সিষ্টেম চালু করতে চেষ্টা করায় তাদের ক্ষমতাচ্যুত হবার সাথে সাথে তাদের সিষ্টেমও খতম হয়ে গিয়েছে। লিয়াকত আলীর একনায়কত্ব, গোলাম মুহাম্মদের স্বেচ্ছাচার, ইসকান্দার মির্যার কন্ট্রোলড্ ডেমোক্রেসী, আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র, ইয়াহ্ইয়া খানের গদীতন্ত্র এবং শেখ মুজিবের একদলীয় সিষ্টেম তাদের গত হবার সাথে সাথেই বিলীন হয়ে গেছে।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের দেয়া সিষ্টেমে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকলেও রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান, দলীয় প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান একই ব্যক্তি হওয়ায় এবং প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির নামে পার্লামেন্টকে পংগু করে রাখায় সংগত কারণেই কোন সন্তোষজনক গণতান্ত্রিক সিষ্টেম গড়ে উঠেনি।

জেনারেল এরশাদও নিজস্ব সিষ্টেমের পরিকল্পনা নিয়েই ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে শাসন ক্ষমতায় এতটা অংশীদার করার

www.icsbook.info

পক্ষপাতি ছিলেন যাতে সামরিক শাসনের দরকার না হয় এবং সেনাপতিরা রাজনৈতিক সরকারের সক্রিয় অংশীদার হতে পারেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর সংসদীয় সরকার পদ্ধতি কায়েম হয়েছে বটে কিন্তু সত্যিকার গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান মেনে চলার ঐতিহ্য গড়ে না উঠা পর্যন্ত রাজনৈতিক সুস্থিরতা ও স্থিতিশীলতা আশা করা যায় না।

বিশেষ করে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের যে পদ্ধতি চালু হয়েছে তাতে প্রেসিডেন্টের পক্ষে সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। বর্তমান প্রেসিডেন্ট শুধু সরকারী দলের প্রতিনিধি। তিনি শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সরকারের উপর সামান্য চাপ সৃষ্টি করার মতো পজিশনও ভোগ করেন না।

১৯৯৩ সালের ৩রা জানুয়ারী জাতীয় সংসদের ৮ম অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট যে ভাষণ দিয়েছেন তাতে সরকারী দলের একান্ত অনুগত ব্যক্তির দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। দেশের ১২ কোটি মানুষের নেতার দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সরকারী কর্মকান্ডের প্রশংসা ছাড়া কোন বিষয়েই উপদেষ্টার ভূমিকাও রাখতে সক্ষম হননি। এই ব্যক্তিই যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন তাহলে তিনি অবশ্যই আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতি চালু থাকলে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তি ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবার আশংকা রয়েছে।

গণতান্ত্রিক সিষ্টেম ঃ বাংলাদেশের অতীত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, বর্তমান সংকট ও জটিলতা এবং স্থিতিশীল রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে একটা ভারসাম্যপূর্ণ সিষ্টেমের প্রস্তাব এখানে পেশ করা হচ্ছে। এ প্রস্তাবটির পক্ষে ও বিপক্ষে যত যুক্তি থাকতে পারে তা ধীরস্থিরভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব রাজনীতি সচেতন মহলের।

এ প্রস্তাবটিতে ৫টি দফা রয়েছে যা বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়াই পেশ করা হচ্ছে। সংসদীয় পদ্ধতি ও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট বলেই আমার ধারণা।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

www.icsbook.info

৫ দফা প্রস্তাব

১। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ঃ

(ক) বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

(খ) প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় একই সাথে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

(গ) প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টর কার্যকাল হবে ৫ বছর।

(ঘ) কোন কারণে প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য হলে নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় সংসদ অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। কোন অন্তরবর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না।

(ঙ) যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংবিধান গুরুতরভাবে লংঘিত হয় অথবা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে সংসদ সদস্যদের তিন চতুর্থাংশের ভোটে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যাবে।

(চ) এভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব পালন করলে কোন দলের আপত্তি থাকবে না।

(ছ) ভাইস প্রেসিডেন্টকে স্পীকারের দায়িত্ব অর্পণ করলে সংসদে দল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে বেশী সক্ষম হবেন এবং তিনি সহজেই সকল দলের আস্থা অর্জন করতে পারবেন।

২। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ঃ

(ক) শাসনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ হাতে ন্যস্ত থাকবে। কিন্তু দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকবে না।

(খ) প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের নিরপেক্ষ মর্যাদা বজায় রাখার প্রয়োজনে তারা দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না।

(গ) নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট তাদের পদে বহাল থাকা অবস্থায় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। অবশ্য নির্বাচনের ৬ মাস পূর্বে পদত্যাগ করলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

(ঘ) সরকার যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারান এবং অন্য কেউ যদি সরকার গঠনে সক্ষম না হন তাহলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেংগে দিয়ে ৪ মাসের মধ্যে পরবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

www.icsbook.info

(ঙ) প্রেসিডেন্টের সরকারকে উপদেশ (Advice) দেবার অধিকার থাকবে।

৩। শাসন ক্ষমতা ঃ

(ক) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই সরকার গঠনের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে এবং জন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করবেন।

(খ) প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধানের মর্যাদা ভোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্র বহির্ভূত পন্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(গ) প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন এবং সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন না হারানো পর্যন্ত সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী থাকবেন।

(ঘ) জাতীয় সংসদ ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রীমকোর্ট সে বিষয়ে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী চূড়ান্ত ফায়সালা দেবে।

(ঙ) সরকারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সংসদ সদস্যগণ দল পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে দলের টিকেট নিয়ে কোন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সে দল ত্যাগ করলে তিনি সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা হবে।

৪। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ

(ক) জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ৩ মাস পূর্বে মন্ত্রীসভা ও জাতীয় সংসদ ভেংগে দিতে হবে।

(খ) পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করবেন।

(গ) এ অন্তরবর্তীকালীন সরকার জাতীয় সংসদের কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবেন না।

(ঘ) অন্তরবর্তীকালীন সরকার নির্বাচন কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং এর উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

(ঙ) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

www.icsbook.info

৫। নির্বাচন কমিশন ঃ

(ক) সুপ্রীম কোর্টের সর্বোচ্চ বেঞ্চ একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

(খ) নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

(গ) প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যাবতীয় ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(ঘ) নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে গোটা প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

(ঙ) প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদের নির্বাচন একই সাথে অনুষ্ঠান করতে হবে।

দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন, স্থিতিশীল সরকার, আইনের শাসন, জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিদের সরকার কায়েম এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাস রোধ করতে হলে উপরোক্ত পলিটিকেল সিষ্টেমের চাইতে উন্নত কোন প্রস্তাব কারো কাছে থাকলে সকলের বিবেচনার জন্যে তা পেশ করা হোক।

(বাংলাদেশের রাজনীতি)

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.icsbook.info

প্রধান কার্যালয়

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিক্রয় কেন্দ্রঃ

☐ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

☐ ৫৫, খানজাহান আলী রোড,
তারের পুকুর, খুলনা

☐ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন
দেওয়ান বাজার চট্টগ্রাম